নেকড়ে

ভৌতিক গল্প সংকলন

সম্পাদনা। হাসান খুরশীদ রুমী

BanglaBook.org

২৬টি শিরশিরে বিদেশী ভূতের গল্প পাঠক আপনার হাতে। অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টিকারী গল্পগুলোর লেখকরা হলেন :

সিডনি জে. বাউন্স
আর. মরিস
হেরিওয়ার্ড ক্যারিংটন
উইলিয়াম অস্টিন
ডব্লিউ এলিজাবেথ টার্নার
প্যাট্রিসিয়া ফেয়ার
লরেন্স উইলসন
চার্লস বিউমন্ট
হেলেন পিডডক
এডগার জেপসন এবং জন গসওয়াই
ব্যাসিল কুপার
মাইকেল এবং মলি হার্ডউইক
ডবল্যু. ডবল্যু. জেকবস
মেরি ক্লার্ক
জেমস ওয়েন্টওয়ার্থ
রিচার্ড মিডলটন
এলিজাবেথ বোয়েন
ফ্রেডরিক ম্যারিয়েট
অ্যানা কাভান
আয়ান ফোলেজ গর্ডন
রোয়াল ডাল
ক্রিস্টিনা ব্রান্ড
হেনরি স্লেজার
এফ. ম্যারিয়ন ক্রফোর্ড
চার্লস বারকিন
রবার্ট ব্লক

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নেকড়ে

ভৌতিক গল্প সংকলন

সম্পাদনা। হাসান খুরশীদ রুমী

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪১৮, বইমেলা ২০১২

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২ ৪৪০৩, মোবাইল : ০১৭১৮-০৮২৫৪৫

বর্ণবিন্যাস
শাওন কম্পিউটারস্
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭২০-২৮৪৯০১

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয় : সুনীল দাস
ফোন : ০১৭৩১১৬৯২৯৬

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭ ২৯ ৬৬, ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২২০.০০ টাকা

Nekray Edited by Hasan Khurshid Rumi
Published by Afzal Hossan, Anindya Prokash
30/1Ka, Hemendra Das Road, Dhaka-1100
Phone : 717 29 66, 01711 664970
e-mial : _anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2012

Price : Taka 220.00
US $ 5
ISBN 978-984-414- 297-8

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এনির গলা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। তার শরীরটাও যেন স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হয়ে কোথাও মিলিয়ে গেল। — প্রতিশোধ : ডগলাস কলিয়ার।

এক মুহূর্ত পর চোখ খুলল অরলফ। যা দেখল হিম হয়ে গেল বুক। অন্ধকারে রেখা মনে হয়েছিল যেগুলোকে সেগুলো আসলে লোহার মোটা মোটা শিক— ওটা একটা লোহার প্রকাণ্ড ভারি খাঁচা, সামনে কিম্ভূত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে — একটা কঙ্কাল। — পলায়ন : হেরিওয়ার্ড ক্যারিংটন।

রক্ত! রক্ত! রক্ত! রক্ত দেখলে তার খুব ভালো লাগে। রক্তের উষ্ণতা, লাল জীবন। নাহ এ পাগলামি ছাড়া কিছু না। হোন্ডারসন মাতাল হয়ে গেলে।

— রাতি ভয়াল : রবার্ট ব্লক।

আকর্ষণীয় এই বইটি পড়ে পাঠক যেন উল্লসিত হবেন তেমন আতঙ্কিতও হবেন। বইটিতে আছে বাংলায় অনূদিত ২৬টি শিরেশিরে ভূতের মেরুদণ্ড হিম করার মতো গল্প। প্রতিটি গল্পই অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করে যা থেকে ফিরে আসা কঠিন।

হাসান খুরশীদ রুমী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচি

সরাইখানায় এক রাত— সিডনি জে. বাউন্স ৯
অশরীরী— আর মরিস ১৪
পলায়ন— হেরিওয়ার্ড ক্যারিংটন ২৩
হারিয়ে যাওয়া লোকটি— উইলিয়াম অস্টিন ২৬
খাঁচা— ডব্লিউ এলিজাবেথ টার্নার ৩৭
নদীর মাঝে বাড়ি— প্যাট্রিসিয়া ফেরার ৩৯
বহিরাগত— লরেন্স উইলসন ৪৩
বিনি পয়সার মাটি— চার্লস বিউমন্ট ৫১
কুৎসিত লোকটা— হেলেন পিডডক ৬০
অপারেশন— এডগার জেপসন এবং জন গমওয়ার্ট ৬২
ফাঁদ— ব্যাসিল কুপার ৬৬
সমুদ্রের প্রেতাত্মারা— মাইকেল এবং মলি হার্ডউইক ৭১
বানরের থাবা— ডবল্যু. ডবল্যু. জেকবস ৭৭
পূর্বপুরুষ— মেরি ক্লার্ক ৮৫
নরফকের ভূতের আড্ডা— জেমস ওয়েন্টওয়ার্থ ৯০
ভবঘুরে— রিচার্ড মিডলটন ৯৩
প্রত্যাবর্তন— এলিজাবেথ বোয়েন ৯৭
নেকড়ে— ফ্রেডরিক ম্যারিয়েট ১০১
ঘুম প্রাসাদ— অ্যানা কাভান ১১৩
রাজকীয় কুকুর— আয়ান ফোলেজ গর্ডন ১১৬
উইলিয়াম এবং মেরি— রোল্ড ডাহল ১১৯
পাপ— ক্রিস্টিনা ব্রান্ড ১২৯
অসুখ— হেনরি স্লেজার ১৩৬
আতংকের রাত— এফ. ম্যারিয়ন ক্রফোর্ড ১৪০
শেষ রাত— চার্লস বারকিন ১৫৪
রাতি ভয়াল— বরার্ট ব্লক ১৬২

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

সরাইখানায় এক রাত

সিডনি জে. বাউন্ডস

নির্জন জলার জল রক্তাক্ত হয়ে উঠল অস্তগামী সূর্যের লাল আবিরে। হঠাৎই প্রবল বাতাস উঠল, জনশূন্য রাস্তায় দুই সাইকেল আরোহিনীকে ধাক্কা মেরে প্রায় ফেলে দেবার জোগাড় করল। সেই সাথে বয়ে নিয়ে এলো বৃষ্টির বরফ ঠাণ্ডা ছাঁট।

জেন ব্লাক আর তার ছোট বোন পেনি সাইকেলে চড়ে কর্নওয়াল শহরে চলেছে। অনুমান করল ওরা বডমিন জলার কাছাকাছি কোথাও চলে এসেছে।

'ব্যাপার।' মুখ আঁধার করে বলল জেন। 'আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। কোথাও থেমে বর্ষাতি পরে নেয়া উচিত।'

দু'বোনেরই পরনে জিন্স আর উইন্ড চিটার। নেমে পড়ল সাইকেল থেকে। হলুদ অয়েল স্কিন খুলে মুড়ে নিলো শরীর। আবার যাত্রা শুরু করেছে। বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। রীতিমতো গর্জাচ্ছে। রাস্তা থেকে যেন ফেলে দেবে। সূর্য ডুব দিয়েছে পশ্চিমে, গ্রানাইট রঙা আকাশে থর বেধে জমে আছে কুচকুচে কালো মেঘের সারি।

'মেইন রোড ছেড়ে এসে মোটেই ঠিক করিনি।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পেনি। মাথা নিচু করে রেখেছে। রীতিমতো কুস্তি লড়তে হচ্ছে বাহনটাকে খাড়া রাখার জন্য। 'বোঝা যাচ্ছে আমরা কোথায় এসে পড়েছি।' বাতাসের গর্জনে ওর গলা পরিষ্কার শোনা গেল না।

'কি ওটা?' চেঁচিয়ে উঠল জেন।

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম... ওহ, গড...।'

আকাশ যেন দু'ভাগ হয়ে গেল। ধূসর, বিশাল একটা পর্দা নিয়ে প্লাবন হয়ে নেমে এলো বৃষ্টি। হিংস্র আক্রোশে ঝাপিয়ে পড়ল ওদের ওপর।

'এমন বৃষ্টিতে তাঁবু করতে পারব না।' বলল জেন।

'যতক্ষণ না কোনো আশ্রয়স্থল চোখে পড়ে, টানতে থাক।'

আশপাশে কোনো জনপদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। একটা বাড়িও চোখে পড়ল না। গাড়ি দূরে থাক। নির্জন এই প্রান্তরে ওরা সম্পূর্ণ একা, ভাবতেই গা শিরশির করে ওঠে জেনের।

মাথা নিচু করে বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে দুই বোন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে চলল।

BanglaBook.org

'দ্যাখ, আলো!' হাত তুলে দেখাল পেনি। নেমে পড়ল বাইক থেকে।

ব্রেক কষল জেন। 'ঠিক দেখেছ?'

'অবশ্যই। তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

বামদিকে, রাস্তার পেছনে, একটা টিলার ওপর একটা বাড়ির হাল্কা ছায়া ফুটে আছে। হলদে আলো জ্বলছে।

'চলো যাই।' খুশি খুশি গলায় বলল জেন। 'ওখানে নিশ্চয়ই আশ্রয় মিলবে।'

সাইকেল ঠেলে নিয়ে এগোল ওরা বাড়িটির দিকে। ঢুকলো উঠোনে। এখানে বাতাসের অত্যাচার কম। দুই বোন কাছারি ঘরের বারান্দায় তুলে রাখল সাইকেল দুটো। স্যাডল ব্যাগ খুলে দৌড়ে চলে এলো সদর দরজার সামনে। মাথার ওপর একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখল।

'আরে, এটা দেখছি সরাইখানা।' বলল জেন। 'চিৎকার করে ডাকলেও হয়তো কেউ শুনতে পাবে না বাতাসের গর্জনে। তারচেয়ে চলো ঢুকে পড়ি।'

সাহস করে দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কপাট। পাথুরে প্যাসেজে পা রাখল। 'বাড়িতে কেউ আছ?' হাঁক ছাড়ল ও।

প্যাসেজের পরেই ছোট একটি বার, তাতে বেশকিছু বোতল আর বাক্স রাখা। একটা পিদিম জ্বলছে। এছাড়া গোটা বাড়ি ডুবে আছে অন্ধকারে, নীরব। শূন্য ঘরে ওর কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলল।

একটি মেয়ে, জেনেরই সমান হবে বয়স। বেরিয়ে এলো আঁধার থেকে। মেঝের ওপর ঝুলে আছে স্কার্ট, গায়ে জড়ানো শাল, মাথার চুল চূড়ো করে বাঁধা।

'আমার চাচা এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।'

'আজ রাতটা থাকা যাবে এখানে?' চট করে জিজ্ঞেস করল জেন। 'দেখতেই পাচ্ছ কাকভেজা হয়ে গেছি।'

'ঠাণ্ডায় কাঁপছি হি হি করে। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব।' যোগ করল পেনি।

মেয়েটির চেহারায় ছোটানা ভাব। 'আমার চাচা হয়তো রাগ করবেন।' ইতস্তত করল সে। 'তবে এমন আবহাওয়ায় তোমাদের আমি তাড়িয়েও দিতে পারি না। ঠিক আছে, থাকতে পার তোমরা আজ রাতটা।'

'ধন্যবাদ। আমরা কর্ণওয়াল থেকে সাইকেলে চড়ে আসছিলাম। হঠাৎ এমন বৃষ্টি শুরু হলো...।'

'সাইকেলে চড়ে এসেছ?' মেয়েটিকে কেমন হতবুদ্ধি দেখাল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমার নাম জেসিকা। রান্নাঘরে এসো। ভেজা জামা-কাপড়গুলো খুলতে পারবে।'

জেন আর পেনি অন্ধকার প্যাসেজ ধরে মেয়েটির পিছু পিছু রান্নাঘরে ঢুকল। এখানেও পিদিম জ্বলছে। সেই সাথে একটা স্টোভ দেখা গেল। জামা-কাপড় ছাড়ল ওরা। জেসিকা একটা করে কম্বল দিলো ওদের গায়ে পেঁচাতে।

BanglaBook.org

একটা সাধারণ কাঠের টেবিল ঘিরে বসল ওরা শক্ত পিঠঅলা চেয়ারে। জেসিকা বোলে গরম কফি ঢালছে। 'বাড়িতে আর কিছু নেই।' বলল সে। 'এদিকে তেমন লোকজনতা আসে না।'

'সুপেই চলবে।' কাপে চুমুক দিল পেনি। 'আমার ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে গেছে। ঘুমও পাচ্ছে।'

একটা মোম জ্বালালো জেসিকা। 'বেডরুম এদিকে।'

কফি শেষ করে দোতলায় উঠে এলো ওরা কাঠের সিঁড়ি মাড়িয়ে এদিকেও একটা প্যাসেজ বা করিডর রয়েছে। প্যাসেজের পাশে দরজা। একটা দরজা খুলে জেসিকা বলল, 'এটা তোমাদের ঘর।'

প্যাসেজের শেষ মাথায়, ওদের ঘরের পরেই একটা দরজা, বন্ধ। তালা মারা। 'ওটার ভেতরে কি আছে?' কৌতূহল প্রকাশ করল পেনি।

'তা দিয়ে তোমার কি দরকার?' বলল জেন। বোনকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিলো বেড রুমে।

ঘরের দেয়ালের পলেস্তারা জায়গায় জায়গায় ছুটে গেছে। ঘরে প্রাচীন আমলের ডাবল বেডের বিছানা। একটা মাত্র জানালা। দেখে মনে হলো বহুদিন ওটা খোলা হয় না।

জেসিকা লম্বা, লোহার একটা চাবি, গোড়াটা ক্রস আকারের ধরিয়ে দিলো জেনের হাতে। 'দরজা বন্ধ করে ঘুমাবে।' বলল সে গম্ভীর গলায়। 'রাতে যাই করো না কেন কিছুতেই দরজা খুলবে না।'

'কি শুনব?' চট করে প্রশ্ন করল পেনি।

কিন্তু জবাব দিল না জেসিকা। ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সে।

ভেতর থেকে দরজায় তালা মারল জেন। বিছানার কাছে এলো। 'স্যাঁতস্যাঁতে।' বিছানায় হাত ছুঁইয়ে বলল ও। 'ভাগ্যিস স্লিপিং ব্যাগ ছিল সাথে।'

'গোটা বাড়িটাই আমার কাছে আদ্যিকালের মনে হচ্ছে।' নাক সিটকালো পেনি। 'আর জেসিকা– ওকেও অদ্ভুত লেগেছে আমার। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল জেনি। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ শুনতে শুনতে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। হঠাৎ ওর মনে হলো কে যেন কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। মহা বিরক্তি নিয়ে জেগে গেল জেন। শুনল পেনি উত্তেজিত গলায় ডাকছে। ওঠো... একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।'

'এখন মজার ব্যাপার বাদ দাও... ঘুমাও।'

'ওঠো না জেন! প্লিজ।'

ওর পীড়াপীড়িতে ঘুম ছুটে গেল জেনের। স্লিপিং ব্যাগ থেকে মুখ বের করে দেখে থেমে গেছে বৃষ্টি। বৃষ্টির হিংস্র গোঙানিও নেই। তবে নিচ থেকে গানের সুর শোনা যাচ্ছে। মাতাল হয়ে গান গাইছে যেন কারা। পেনি হাতঘড়িতে চোখ বুলাল।

'জিনটা– দ্যাখো, ওখানে কি হচ্ছে!'

জানালার ধারে গিয়ে হাত তুলে দেখাল সে।

BanglaBook.org

জেন বেরিয়ে এলো স্লিপিং ব্যাগ থেকে। পা বাড়াল জানালার দিকে। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সবকিছু। উঁকি দিলো যেন ভাঙ্গা জানালার ফুটো দিয়ে। নিচে ঘোড়ায় টানা একটা ওয়াগন দেখতে পেল সে। ওয়াগন থেকে নামল জার্সি আর কালো ট্রাউজার পরা কয়েকটা লোক। ওদের দু'একজনের হাতে ছুরি। এক চোখে পট্টি বাঁধা একটা লোক প্রকাণ্ডদেহী, দাড়িঅলা, দেখে মনে হলো নেতা। লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে খ্যাক খ্যাক করে কি যেন বলল।

'লোকগুলো মনে হয় শয়তান।' মন্তব্য করল পেনি।

'করছে কি ওরা?'

ওয়াগন থেকে বড় বড় বাক্স নামাচ্ছে ভয়াল দর্শন লোকগুলো। হেড়ে গলায় গান গাইছে।

বাক্সগুলো টেনে তুলল তারা সরাইখানার বারান্দায়।

একটু পরে সিঁড়িতে বুট জুতার শব্দ আর দুম দুম আওয়াজ শুনতে পেল দুই বোন। বুঝতে পারল ভারি বাক্স নিয়ে উঠছে সেই লোকগুলো। খানিক পরে ওদের ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেল ওরা।

'পাশের বন্ধ ঘরটায় ঢুকছে ওরা।' ফিসফিসিয়ে বলল উত্তেজিত পেনি। 'ওরা নির্ঘাত ডাকাত।'

'বোকার মতো আবার কিছু করে বসো না।' বোনকে সাবধান করে দিলো জেন। 'আরে চুপ করে থাকো।' জেসিকার কথা মনে পড়ে গেছে। 'ওদের ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো।

হঠাৎ ভারি পায়ের শব্দ ওদের ঘরের দরজার সামনে এসে থামল। কে যেন কড়া ধরে নাড়া দিলো সজোরে। কর্কশ গলায় বলল, 'ভেতরে কেউ আছে নাকি?'

পেনির মুখ চেপে ধরল জেন। জেসিকার গলা শুনতে পেল, 'দুজন অতিথি। বৃষ্টিতে আটকা পড়ে গিয়েছিল এবং ওদের তালা মেরে রেখেছি। কফির সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি। ঘুমাচ্ছে ওরা।' বিশ্রী গলায় হেসে উঠল লোকটা। 'ঘুমিয়ে থাকলেই ভালো। নাক বাড়ালে ওদের কাল্লা কেটে ফেলতাম। শিউরে উঠল পেনি। 'এসব কি হচ্ছে?' ফিসফিস করল সে। আমার খুব ভয় করল।

নগ্ন কাঠের মেঝেতে আবার বুট জুতোর প্রতিধ্বনি উঠল। নেমে যাচ্ছে ওরা সিঁড়ি বেয়ে। হঠাৎ কে যেন দাঁড়িয়ে পড়ল জেনদের ঘরের সামনে...।

'দম বন্ধ করে রাখো।' বোনকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলল জেন।

অবশেষে শেষ লোকটাও চলে গেল। নীরব হয়ে এলো প্যাসেজ। খানিক পরে খুরের শব্দ শোনা গেল। চলে যাচ্ছে ওয়াগন।

সাবধানে জানালার ফুটো দিয়ে উঁকি দিলো জেন। সত্যি চলে যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ি জলা লক্ষ্য করে। 'ঠিক আছে পেনি। চলে গেছে ওরা।'

ভয়ে ভয়ে দুটি মেয়ে আবার স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে সেঁধুল। সরাইখানায় নেমে এসেছে আশ্চর্য নিস্তব্ধতা। অস্বস্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

BanglaBook.org

সূর্যের আলো চোখে পড়তে ঘুম ভেঙে গেল জেনের। ওর কোমর আর কাঁধ ব্যথা করছে শক্ত, এবড়ো-থেবড়ো জমিনে শুয়ে। জমিন? হঠাৎ সব কথা মনে পড়ে গেল জেনের। তড়াক করে উঠে বসল। মাথার ওপর ছাদ নেই। দেয়াল নেই– বসে আছে ও পাথুরে মেঝের ওপর। দূরে জলাটা দেখা যাচ্ছে।

স্লিপিং ব্যাগে কুঁকড়ে-মুকড়ে এখনও ঘুমাচ্ছে পেনি। ওদের সাইকেল জোড়া কয়েক হাত দূরে। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা।

শিরদাঁড়ায় বরফের একটা স্রোত নামল জেনের। বুঝতে পেরেছে একটা সরাইখানার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বসে আছে সে। স্বপ্ন দেখছে না তো? চিমটি কাটল নিজেকে। ব্যথা পেয়ে বুঝতে পারল জেগে আছে ও...।

ধাক্কা দিয়ে জাগাল বোনকে। ঘুম ভেঙেই পেনি বলল, 'ওরা কি ফিরে এসেছে?'

মুখের কথা আর শেষ হলো না ওর। চারদিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠল চোখ। 'আমরা স্বপ্ন দেখছি না, এটা সত্যি বাস্তব!'

'আমাদের জামা-কাপড়...।'

জেন নিশ্চিত রান্নাঘর বলে যে জায়গাটা ছিল, ওখানেই ওদের জামা-কাপড় আছে। ও বলল, 'চলো, এখান থেকে চলে যাই।'

রান্নাঘর বলেও কিছুর অস্তিত্ব নেই। তবে একটা পাথরের ওপর জামা-কাপড়গুলো পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে, স্লিপিং গোছাচ্ছে এমন সময় ঠক করে কি যেন একটা পড়ল পায়ের কাছে। একটা লোহার চাবি। গোড়ার দিকটা ক্রস আকারের।

রুম এট দ্য ইন **অনুবাদ : অর্ক দাস গুপ্ত**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অশরীরী

আর মরিস

রাতের আকাশে হাজার তারার মেলা। এক টুকরো মেঘ ক্ষণিকের জন্য উড়ে গেল চাঁদের ওপর দিয়ে। অন্ধকারে ঢেকে গেল পৃথিবী। আবার হেসে উঠল চাঁদ। নিদ্রিত মাঠের ওপর গলে পড়তে লাগল নরম জোছনা। কি অপূর্ব দৃশ্য! এরকম দৃশ্য আর দেখার সৌভাগ্য হবে না ম্যানসনের। এই রাত হবে তার জন্য শেষ রাত!

মেয়েটাকে বিদায় জানাল ম্যানসন। বুকভরা উচ্ছলতা নিয়ে অন্ধকার ঝোপঝাড় পেরিয়ে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল মেয়েটি। জানল না আরেকজনের মনের মধ্যে কি ঘৃণাই না জাগিয়ে গেল। হ্যাঁ, প্রচণ্ড ঘৃণা এখন তার মনে। একটাই কামনা তার– তা হলো ম্যানসনের মৃত্যু। এখনই উৎকৃষ্ট সময়।

অন্ধকারে অপেক্ষা করছে সে। রাটল্যান্ড। লম্বা একহারা যুবক। লুকিয়ে আছে ভাঙা পাঁচিলটার ওপাশে, ঝোপের আড়ালে। জানে, এ পথেই ম্যানসন আসবে। শেষ বারের মতো। পশুর মতো ওৎ পেতে আছে সে শিকারের জন্য। তার লম্বা পেশীবহুল হাত দুটো সামান্য কাঁপছে। কাঁপছে তার মুখের পেশীগুলো। উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না কিছুতেই। তবে তার স্নায়ু পুরোপুরি সজাগ। পাথরের বুকে পায়ের শব্দ শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে তার কান দুটো। চোখ দুটো জ্বলছে অনুসন্ধানী আলো ফেলে। আর মাত্র কয়েকটা মিনিট। তারপর ঘটবে সমস্ত অপেক্ষার অবসান।

অন্ধকার পথের ওপর শিস দেবার শব্দ কানে এলো রাটল্যান্ডের। মুহূর্তে শরীরটা তার শক্ত হয়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল সে। কিছুক্ষণ অখণ্ড নীরবতা। তারপর কিছুটা দূরে মাটিতে লাঠি ঠোকার শব্দ। রাটল্যান্ডের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। হাতের মুঠোয় চেপে ধরল লম্বা ধারালো বাঁকা একটা ছোরা।

একটু পরে দেখা দিল মানুষের একটা ছায়া। ছায়াটা রাটল্যান্ডের প্রায় পায়ের কাছে এসে পড়ল। থেমে, পকেট হাতড়ে বের করল পাইপ ও তামাকের ব্যাগ। পাইপে তামাক ভরল। তারপর জ্বলে উঠল একটা ছোট্ট আলো। সেই আলোতে মুখটা দেখা গেল অতিথির। রাটল্যান্ডের চিনতে ভুল হল না। এই লোকটার জন্যই সে এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা করছে। লোকটা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তামাকের মৃদু গন্ধে ভরে গেল রাতের বাতাস। অন্ধকারে রাটল্যান্ড মুখ

BanglaBook.org

টিপে অবজ্ঞার হাসি দিল। 'খুব মজা করে টানো। বন্ধু, এটাই তোমার শেষ খাওয়া।' মনে মনে বলল সে। যেভাবে ছোট-খাট শরীর নিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানসন। তাতে মনে হচ্ছে সহজেই কাজটা মিটে যাবে।

সামনে পা বাড়াতে যাবে ম্যানসন। এমন সময় থমকে দাঁড়াল। তার সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে বের হলো এক লোক। আশ্চর্য হলো সে, লোকটির দাঁড়ানো ভাবভঙ্গি দেখে। বলিষ্ঠ হাত দুটো শরীরের দু'পাশে ঝুলছে। অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না, তবে সাদা দাঁতের সারি আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে। শরীরের সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলো ম্যানসনের। কিন্তু সে যে ভয় পেয়েছে তা জানতে দিতে চায় না মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটাকে। খুবই শান্ত। স্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করল, 'কে আপনি? এভাবে আমার সামনে দাঁড়ানো মানেটা কি?'

'প্রশ্ন আপনি করতেই পারেন বন্ধু। আজ রাতে আমি আপনার আত্মাটাকে উপড়ে নিয়ে শয়তানকে দান করব।' খলখল করে ভৌতিক হাসি বেজে উঠল রাটল্যান্ডের কণ্ঠে।

'জানতে পারি আমার ওপর কেন আপনার এতো রাগ!'

'আমার ভালোবাসার মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে এখন আমাকেই প্রশ্ন করছেন?'

ম্যানসনের মনে হলো লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। এত রাতে এখানে অন্য কারো সাহায্য পাবারও আশা নেই। তাই সে ঠিক করলো, লোকটাকে বোঝাতে হবে যে সে ভুল করছে।

'আমি আপনাকে চিনি না।' বলল ম্যানসন। 'আপনার প্রেমিকাকে তো ছিনিয়ে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া এ পর্যন্ত কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়িনি আমি। আপনি হয়তো অন্য লোক ভেবে আমাকে ভুল করছেন!'

'মিথ্যে বলে আপনি বাঁচতে পারবেন না। আজো আপনি মেয়েটার সঙ্গে দেখা করেছেন।'

'কে সে?'

'লোরেন পিটার্স।'

'ওহ তাই বলুন!' হাসতে চেষ্টা করল ম্যানসন। 'ওকে বলতে গেলে আমি চিনিই না। আজই প্রথম পরিচয় হলো ওর সাথে। আমি জানিও না মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে কিনা।'

'করে। আপনাকেই সে পছন্দ করে। কিন্তু ওকে আপনি কিছুতেই পাবেন না। আমি সেই ব্যবস্থায়ই করছি।'

ম্যানসনের মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড় বইতে লাগল। 'পুরোটাই ভুল বুঝছেন আপনি।' দ্রুত স্বরে বলল সে। 'মেয়েটা মোটেও আমাকে চায় না।'

লম্বা লোকটা আরো এক পা এগিয়ে এলো কাছে।

'বোকামি করবেন না।' বলল ম্যানসন। 'আমি যা বললাম তা সত্যি। ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। আমি– ম্যানসনের গলার স্বর দ্রুত খাদে নেমে গেল। সে

BanglaBook.org

দেখতে পেল লম্বা লোকটা বিশাল হাতে ছোরাটাকে যেন আদর করছে। হঠাৎ ছোরাটা ম্যানসনের মাথার উপরে তুলল সে। সহজাত প্রবৃত্তিতে ম্যানসন হাতের লাঠিটা দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুরিয়ে মারল। ছিটকে মাটিতে পড়ল ছোরাটা। আকস্মিক আঘাতে কিছুক্ষণের জন্য হকচকিত হলো রাটল্যান্ড। সেই সুযোগে ম্যানসন তার হাতটা ধরে মোচড় দিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো তারপর চেষ্টা করল দৌড়ে গিয়ে ছোরাটা তুলে নিতে। কয়েক পা এগিয়েছে। পেছন থেকে একটা বিশাল হাত তার কাঁধটা খামচে ধরে টেনে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর চেপে ধরল ম্যানসনের গলা। ম্যানসনও তাকে ধাক্কা দিলো। দু'জনে গড়াগড়ি খেতে লাগল এক সঙ্গে। হাঁপাচ্ছে দুজনেই। কিছুক্ষণ পর ম্যানসন বুঝল হেরে যাচ্ছে সে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে তার। শক্ত আঙুলগুলো তার গলায় সাঁড়াশির মতো চেপে বসছে। সে বুঝতে পারছে আর বাধা দেবার শক্তি নেই তার। লোকটার দেহে অসুরের মতো শক্তি।

নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটার তলপেটে হাঁটু তুলে গুঁতো মারল ম্যানসন। গলায় হাতের চাপ কিছুটা ঢিলা হয়ে গেল। সেই সুযোগে ম্যানসন এক পাক ঘুরে ছাড়িয়ে নিলো নিজেকে। উঠে দাঁড়াতে গেল, ঠিক তখনই পায়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। পলকের জন্য দেখতে পেল লাঠিটাকে। কিন্তু ওটা তুলবার আগেই চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল সে। মাথায় আঘাত পেল প্রচণ্ড। মনে হলো মুখটা কেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে। জ্বালা করে উঠল মারাত্মকভাবে। আবার একটা আঘাত এসে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল ম্যানসনের স্নায়ুগুলো। একের পর এক মুখের উপর পড়ছে শক্ত ভারি পায়ের লাথি। চোখের দৃষ্টি ক্রমেই নিভে যেতে লাগল ম্যানসনের। মুহূর্তের জন্য সে বিশাল দেহী লোকটার ভয়ঙ্কর মুখটা তার দেহের ওপর ঝুঁকে পড়তে দেখল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটা। সমস্ত স্নায়ু যেন তার নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অনেক কষ্টে চেষ্টা করল চোখ মেলার। আকাশের গায়ে তারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে। মনে হলো দূর থেকে তার কানে ফিসফিস শব্দ ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল তার। সেই সঙ্গে কণ্ঠটা যেন গমগম করে উঠল।

'এই পৃথিবীতে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে ম্যানসন।'

ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরে এলো ম্যানসনের। সমস্ত যন্ত্রণাবোধ যেন চলে গেছে। সমস্ত শরীর অবশ লাগছে তার। নিস্পৃহের মতো চোখ মেলল। দেখল বিশাল লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার ওপর। হাতে ধরে রয়েছে বিশাল এক খণ্ড পাথর। প্রবলভাবে কেঁপে উঠল ম্যানসন। মৃদু হেসে পাথরটাকে ছেড়ে দিলো লোকটা। ভারি পাথরটা ম্যানসনের মাথার ওপর গিয়ে পড়ল। থপ করে ভোঁতা আওয়াজ হলো একটা। নিথর হয়ে গেল ম্যানসনের শরীর। সেদিকে শান্ত উত্তেজনাহীন দৃষ্টিতে তাকাল রাটল্যান্ড। তার বুকের ভেতরে যতো ক্রোধ জমে ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। সীমাহীন ক্লান্তি আর দুর্বলতায় ভেঙে পড়তে চাইল শরীর।

BanglaBook.org

হঠাৎ রাত যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শিউরে উঠল রাটল্যান্ড। সত্যিই ঠাণ্ডা। নাকি ভয় পেয়েছে সে? চট করে চারপাশটা দেখে নিলো। দেহটা লুকিয়ে ফেলতে হবে। এমন জায়গায় লুকোতে হবে যাতে কারো নজরে না পড়ে। অন্তত যতো দিন না দেহটা মাটির সঙ্গে পচে গলে মিশে না যায়।

ভাঙা পাঁচিলটার কাছে খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝোপ ঝাড়ের মতো রয়েছে। ভালো জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত ওখানে লুকিয়ে রাখা যাবে। প্রায় মাঝরাত এখন। এ সময় এ জায়গা দিয়ে যাতায়াত করবে না কেউ। নিচু হলো রাটল্যান্ড। ম্যানসনের মাথার অর্ধেকটা জুড়ে পড়ে থাকা ভারি পাথরটা সরাতে বেশ কষ্ট হলো তার। পাথরটা সরানোর পর মাথার অবস্থা দেখে পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল। মাথার খুলি কপাল থেকে ফাঁক হয়ে হাঁ হয়ে আছে। উপচে বেরিয়ে আসছে আঠাল পদার্থ। মুখটা লেপ্টে আছে রক্ত ধারায়। চোখ দুটো স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে যেন তার দিকে। ভয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো রাটল্যান্ড। একটা শিরশিরে অনুভূতিতে কেঁপে উঠল সে। তার মনে হলো মৃতের মুখটা তারি দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছিল। তাড়াতাড়ি সরে গেল সে ওখান থেকে। ভাঙা পাঁচিলের গায়ে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকার রাস্তাটার দিকে তাকালো একবার। কারো কোনো সাড়া নেই। আবার ফিরে এলো সে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা লাশটার কাছে। মুখটা এখনো তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। হঠাৎ একটা ভয়ানক আতঙ্ক চেপে ধরল তাকে। অনেক কষ্টে দৌড়ে পালানোর ইচ্ছেটাকে দমন করল রাটল্যান্ড।

ভয়ানক দৃশ্যটার মুখোমুখি আবার যাতে না হতে হয় সেজন্য লাশটার দু'পাশে দু'পা রেখে পেছন ফিরে দাঁড়াল রাটল্যান্ড। তারপর নিচু হয়ে দু'হাতে মৃতদেহটার দু'পা ধরে টানতে টানতে ঝোপটার দিকে নিয়ে চলল। কি ভারি দেহটা! মনে হচ্ছে মৃতের হাত দুটো ঘাস-মাটি আঁকড়ে ধরে বাধা দিতে চাইছে। ঝোপটার কাছে গিয়ে হাত দুটো আলগা দিতেই লাশের পা দুটো ধপ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। নিরাপদ জায়গার খোঁজে চারদিকে তাকাল রাটল্যান্ড। ঝোপটার বাঁ দিকে ভাঙা পাঁচিলটার আড়ালে একটা বড় গর্ত চোখে পড়ল তার। এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে মনে হলো লাশ লুকিয়ে রাখার জন্য এটাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা। গর্তটা ঘিরে রয়েছে লম্বা বুনো ঘাস। গর্তের মুখটা সহজে দেখা যায় না। জায়গাটা দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করল সে। ভয় কিছুটা কমে গেল।

ফিরে এসে আবার মৃতদেহটার পা দুটো দু'হাতে তুলে নিলো রাটল্যান্ড। টানতে টানতে নিচে গর্তটার মুখের কাছে এনে ফেলল দেহটাকে। তারপর ঠেলে গর্তের ভেতর ফেলে দিলো। গর্তে পড়ার সময় ক্ষণিকের জন্য চিৎ হলো দেহটা। আর তখনই রাটল্যান্ড দেখতে পেল সেই হাসি। থেঁতলে যাওয়া মুখে স্পষ্ট ফুটে আছে। আর চোখ দুটোকে মনে হলো জীবন্ত। মূর্তিমান শয়তানের চোখের মতো।

ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতা দিয়ে রাটল্যান্ড কিছুটা ঢেকে দিলো গর্তের মুখ। ঘেমে উঠেছে সে ভয়ানকভাবে। কাঁপা কাঁপা হাতে কপালটা মুছল। তারপর দ্রুত পায়ে ঢালটার

BanglaBook.org

উপর উঠে এলো। একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল গর্তটাকে। না বোঝা যাচ্ছে না কিছুই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সতর্ক পায়ে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল সে।

দু'পাশে গাছপালায় ছাওয়া সরু পথ। রাটল্যান্ডের মনে হলো কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সে থেমে দাঁড়ালে অনুসরণকারী থামছে। এগোতে শুরু করল রাটল্যান্ড। হঠাৎ তার পাশের একটা ডাল দুলে উঠল। আতঙ্কে কেঁপে উঠল সে। ফিরে তাকাল। তার মনে হলো ম্যানসনকে দেখতে পারে সে। কিন্তু কোনো চেহারাই তার চোখে পড়ল না। এগোতে লাগল রাটল্যান্ড। পেছনে শোনা যাচ্ছে মাটিতে লাঠিসোটার শব্দ। প্রতি পদক্ষেপের তালে তাল মিলিয়ে আসছে। হঠাৎ শিউরে উঠল সে। মনে পড়লো ম্যানসনের লাঠিটার কথা। ওটা কোথায়? দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ওটা কারো নজরে পড়লে সর্বনাশ হবে। ফিরে গিয়ে খুঁজতে হবে ওটাকে। কিন্তু অন্ধকার পথ ধরে আবার ফিরে যাবার কথা ভাবতেই সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল তার। না, সে পারবে না এই ভুতুড়ে অন্ধকার পথে ফিরে যেতে। বরং দিনের বেলা এসে খুঁজলে হবে। এই ভেবে আরো দ্রুত এগোতে লাগল সে। অবশেষে পথটার শেষ মাথায় পৌঁছে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

চাঁদের আলো এসে পড়ছে পথটায়। তাজা, ঠাণ্ডা, ফুরফুরে বাতাস। মনটা শান্ত হয়ে এলো রাটল্যান্ডের। হঠাৎ তার মনে পড়ল মেয়েটার কথা। ওর জন্যই তো আজ এমন ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেয়া। হ্যাঁ, এবার মেয়েটার মন ভরিয়ে দেবে সে। এমন ভালোবাসা দেবে যে মেয়েটাও বাধ্য হবে তাকে ভালোবাসতে। এবার কেউ থামাতে পারবে না। সে ওর বুকে গভীর ভালোবাসার জন্ম দেবে।

ঘুমিয়েছিল লোরেন। ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল সে। বিছানার ওপর হাত বাড়িয়ে বিছানা খালি বুঝতে পেরে ডাকল ঘুম জড়ানো স্বরে, 'মেল।'

'আমি এখানে ডার্লিং।' জবাব দিলো রাটল্যান্ড।

'ওহ, আমি ভাবলাম আবার ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি। ঘুম হয়েছে তো?'

'চমৎকার ঘুমিয়েছি।'

বিছানা থেকে নামল লোরেন। তারপর এগিয়ে গেল জানালার কাছে দাঁড়ানো স্বামীর দিকে। হাত রাখল তার হাতের ওপর। 'আমি দুঃখিত মেল, কিছুদিন হলো তুমি ঠিক সুস্থ নও। এজন্য চিন্তা করি একজন ডাক্তার দেখাব। ঘুমের ওষুধ খেলে ভালো ঘুম হবে।'

'আমি ঠিক আছি।' বলল রাটল্যান্ড। মুখে শান্তভাব ফিরে এলো। স্ত্রীর হাতে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, 'আমি খুব ভালো আছি।'

বিয়ের পর থেকেই লোরেনের মনে হচ্ছে স্বামী তার কাছে কি যেন লুকোচ্ছে। মাত্র তিন মাস হলো বিয়ে হয়েছে তাদের। অথচ স্বামীর মনে কি এমন কষ্ট যে তাকে বলা যাবে না? রাত গভীর হলেই লোরেন টের পায় স্বামী তার অস্থিরভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঘুমোয় না ঠিকমতো। যেটুকু ঘুমোয় বিছানায় কেবল ছটফট করে। সমস্ত শরীর তখন তার ঘামে ভিজে যায়। কেমন যেন ভূতে পাওয়া মানুষ মনে হয় স্বামীকে। লোরেন বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি। তার কেন জানি মনে হয়, স্বামী পাগল হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

আগের সেই হাসি-খুশি ভাব আর নেই। চেহারাটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। যদি ডাক্তার দেখানো যেত। কিন্তু তার স্বামী তা করবে না। ডাক্তার দেখানোর কথা বললে স্বামীর চোখ-মুখ এমন শক্ত হয়ে যায় যে, লোরেন ভয় পেয়ে যায়।

ঘুমোতে গেলেই দুঃস্বপ্ন দেখে রাটল্যান্ড। উন্মত্তের মতো বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরে। সারাক্ষণ যেন তার পেছনে লেগে থাকে বিভীষিকা মেশানো ভয়। একটা বস্তু তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। বস্তুটা এমনকি যে সে এতো ভীত হয়ে পড়েছে? রাত হলেই তার এই অনুভূতি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। হঠাৎ একদিন তার মনে হলো এভাবে আর চলতে পারে না। এভাবে চললে শিঘ্রই তাকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে হবে। একটা উপায় অবশ্য আছে তাকে নিজে গিয়ে সব দেখতে হবে। দেখতে হবে সব কিছু স্বাভাবিক আছে কিনা। ম্যানসনের নিশ্চল শরীরটা পড়ে আছে গর্তের ভেতর। কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি। বা দেহটা ওখান থেকে চলে যায়নি কোথাও। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে ম্যানসন নিখোঁজ। কিন্তু কেউ জানে না কোথায় নিখোঁজ হয়েছে। খোলা মাঠের দিকে পা বাড়াল রাটল্যান্ড। অন্যমনস্কভাবে দ্রুত হাঁটতে লাগল। মনে হচ্ছে অশরীরী কোনো শক্তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওদিকে।

'গুড মর্নিং রাটল্যান্ড।'

চমকে উঠে সাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল সে। ক্লাবের পরিচিত একজন। 'দূরে কোথাও যাচ্ছ নাকি? আমি সঙ্গে গেলে অসুবিধা নেই তো?' বলল লোকটা।

মনে মনে গাল দিলো রাটল্যান্ড। এখন বিরক্তি দেখালে খুব বোকামির কাজ হবে। লোকটার মনে তাতে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

'না, খুব দূরে যাব না। ঐ ডেয়ারি ফার্ম পর্যন্ত। তারপর ফিরব।'

'বেশ।' হাসল নতুন ঙী। 'বিয়ের পর থেকে তো তুমি ক্লাবেই আস না। অনেকেই জিজ্ঞেস করে তোমার কথা। তা একদিন রাতে তোমার বউটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।'

'রাতে আমরা খুব একটা বেরোই না।' শান্ত স্বরে বলল রাটল্যান্ড।

'আহা তাতো জানা কথাই।' লোকটার মুখে দুষ্টুমির হাসি। নতুন বউকে রেখে...।'

কনুইয়ের খোঁচা দিলো সে রাটল্যান্ডের শরীরে।

লোকটার কনুইয়ের খোঁচা আর অসভ্য ইঙ্গিতে কেমন যেন অসুস্থ বোধ করল রাটল্যান্ড। লোকটার সঙ্গ খুব বিরক্তিকর মনে হচ্ছে তার কাছে। দশ মিনিট হাঁটার পর লোকটা হঠাৎ থেমে গেল। 'হেই' ডেকে উঠল সে উচ্চ কণ্ঠে।

ঝোপ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে রাটল্যান্ড দেখল একটা মেয়ে এদিকে আসছে। লোকটার মুখে মৃদু হাসি। বলল, 'কিছু মনে করো না ভাই, আমি এর সঙ্গে দেখা করতেই আসছিলাম।'

মনে মনে খুশি হলো রাটল্যান্ড। যাক, নিস্তার পাওয়া গেল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'কিছুই মনে করছি না। এগিয়ে যাও। তোমার সঙ্গ ভালোই লাগল।'

BanglaBook.org

দু'জনকে একসঙ্গে ছেড়ে দিয়ে ফিরল রাটল্যান্ড। তারপর এক সময় সেই পরিচিত সরু পথের দিকে যেতে লাগল।

মাথার উপর ঘন গাছপালার ডালের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল সূর্যের আলো। হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল রাটল্যান্ডের। পথটা মনে হচ্ছে ভীষণ লম্বা। রাস্তার দু'ধারে উঁচু ঝোপের বেড়া। কিছুদূর হাঁটার পর ভাঙা পাঁচিলটা চোখে পড়ল তার। বুকটা ধড়াস করে উঠল তার। প্রায় চার মাস পর সে এসেছে এই জায়গায়। কেমন যেন দেখাচ্ছে জায়গাটা। এখানে পচা গলা একটা শরীর দেখতে হবে ভাবতেই ঠাণ্ডা স্রোত নামল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। তবু সে এগোতে লাগল। যেন তাকে কেউ জোর করে টোনে নিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচিলটা পেরিয়ে দাঁড়াল সে। চারপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো। দেখতে পেল না কাউকে। মনে সাহস আনতে কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল সে। টানতে লাগল জোরে জোরে। তারপর ঝোপ ঝাড় পেরিয়ে কয়েক পা সামনে এগোল।

দিনের আলোয় সবকিছু কেমন অপরিচিত মনে হলো তার কাছে। আশপাশে কিছু নতুন ঝোপ গজিয়েছে। বড় হতে হতে সেগুলো মিশে গেছে পুরানো ঝোপ ঝাড়ের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল সে। হঠাৎ তার সমস্ত স্মৃতি জ্যান্ত হয়ে উঠল। সামনেই সেই জায়গাটা। ম্যানসনকে খুব বেশি দূরে টেনে নেয়নি ও। ধীরে ধীরে উঁচু পাড়টায় উঠে নিচের গর্তটার সরু রেখার দিকে তাকাল রাটল্যান্ড। নিজের হাতেই সে বন্ধ করেছিল ওটা। হঠাৎ শীতে কেঁপে উঠল সে। টের পেল তার চারপাশে ম্যানসনের উপস্থিতি। বাতাসেও যেন তার শরীরের গন্ধ। মনে সাহস সঞ্চয় করল রাটল্যান্ড। গর্তটার মধ্যে একটা মৃত মানুষ পড়ে আছে যাকে সে নিজের হাতে খুন করেছে। এতে ভয় পাবার কি আছে? মৃত মানুষ তো আর কারো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

তবু কপাল বেয়ে ঘাম গড়াতে লাগল রাটল্যান্ডের। হাত দুটোও ভিজে উঠল। তার মনে হল এখনই গর্তের ভেতর থেকে এক মুখ পৈশাচিক হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়াবে ম্যানসন। অসুস্থ বোধ করল সে। ফিরে যেতে চাইল একবার, কিন্তু চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিল। তাকে শেষ দেখতেই হবে। নইলে রাতের পর রাত এরকম আতঙ্ক নিয়ে সে কাটাতে পারবে না। আর সহ্য করতে পারছে না তার স্নায়ু।

ধীরে ধীরে মরা ডালপালাগুলো একপাশে সরাতে লাগল সে। এক মুহূর্ত চোখ বুজে অপেক্ষা করল, তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ মেলে তাকাল গর্তটার নিচের দিকে। যা দেখল তাতে তার হৃৎপিণ্ডের গতি যেন থেমে গেল। তার দিকে তাকিয়ে বিক্ষুব্ধ দুই চোখ খুলে শুয়ে আছে ম্যানসন, আর হাসছে! হাঁ করে আছে কপালটা। ভেতরটা কালো, জ্বলজ্বল করছে। অসংখ্য পিঁপড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে বাসা বেধেছে। সমস্ত খুলি দখল করার জন্য যেন যুদ্ধ করছে পিঁপড়েগুলো। ম্যানসনের মুখটা যেন চরম ব্যঙ্গ করে হাসছে। মুখের ফাঁক-ফোঁকর গলে বেরিয়ে আসছে হাজার হাজার পিঁপড়ে। দাঁতগুলোও সব ঢাকা পড়ে গেছে পিঁপড়েদের উদ্যাম নৃত্যে। এমন দৃশ্য দেখতে হবে কোনো দিন চিন্তাও করেনি রাটল্যান্ড। পিঁপড়ের দল ম্যানসনের পুরো মাথার খুলিটার দখল নিয়ে নিয়েছে।

BanglaBook.org

প্রচণ্ড ভয় পেল রাটল্যান্ড। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সারাজীবন এ দৃশ্য তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে সন্দেহ নেই। কেন সে আসতে গেল এখানে? কি দরকার ছিল এমন বীভৎস দৃশ্য দেখবার? কেন জানি হাসি পেল তার।

হঠাৎ হাতের কাছেই ঘাসের ওপর চলাফেরার শব্দ অনুভব করল সে। চোখ নামিয়ে দেখেই বিদ্যুৎ গতিতে পিছিয়ে এলো। লম্বা লাইন ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে পিঁপড়ের দল ঘাসের ওপর নেমে পড়ছে। বিস্ফারিত চোখে রাটল্যান্ড দেখল ম্যানসনের দেহের ওপর পড়ে থাকা একটা শুকনো ডাল বেয়ে গর্তের ভেতর থেকে উঠে আসছে পিঁপড়েগুলো। সূর্যের আলো পড়ে তাদের থলথলে কালো দেহগুলো চকচক করছে। প্রায় গর্তটার কিনারে উঠে এসেছে ওগুলো। রাটল্যান্ডের পা দুটো যেন গেঁথে গেছে মাটিতে। নড়াচড়ার শক্তি নেই। তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে পিঁপড়েগুলো। চারদিন থেকেই ঘিরে ধরছে রাটল্যান্ডকে। নিজের চারপাশে তাকাল রাটল্যান্ড। তাকে ঘিরে এগুচ্ছে শয়তানগুলো। কোনো ফাঁক নেই। ক্রমেই চওড়া হচ্ছে তাদের লাইন। রাটল্যান্ডের বুকের ভেতর আতঙ্কের ঝড় উঠল। সে বুঝতে পারল পিঁপড়েগুলো সব উঠে আসছে ম্যানসনের মাথার খুলির ভেতর থেকে। তাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়ছে ম্যানসনের উপস্থিতি। সে হতবুদ্ধির মতো নিশ্চল হয়ে দেখল অসংখ্য পিঁপড়ে তার শরীরে উঠে আসছে। লাফিয়ে পেছনে সরে এলো রাটল্যান্ড। তারপর পাগলের মতো তার জুতার ওপর থেকে পিঁপড়েগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিতে দিতে ঘুরে দৌড় দিল। হোঁচট খেতে খেতে উঠতে লাগল উঁচু পাড়ের দিকে। কিছুক্ষণ থেমে পেছনে তাকাল সে। দেখল ঘাস ছেয়ে ফেলে যেন পিঁপড়ের ঢল নেমেছে ঘাসের ওপর। একটু একটু করে তারা এগিয়ে আসছে। কয়েকটা সারিতে ভাগ হয়ে এগুচ্ছে তারা। তারপর রাটল্যান্ড যে দৃশ্য দেখল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা তার মনের পর্দায় আঁকা হয়ে থাকবে। সে দেখল– পিঁপড়ের বিশাল ঢল। আর সেই ঢলের মাঝে শুয়ে আছে ম্যানসন। পিঁপড়েগুলো ম্যানসনের দেহটাকে টেনে নিয়ে আসছে!

লোরেন দেখল তার স্বামী শিশুর মতো কাঁদছে, বলছে না কিছু। ভয় পেল সে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে খুলে বলল সব। বিকেলেই এলেন মানসিক হাসপাতালের মি. লোপার্ড। রাটল্যান্ডকে তখনই ভর্তি করা হলো মানসিক হাসপাতালে। একটা রুমের মধ্যে যখন তাকে আটকে রাখা হলো উন্মত্তের এমো চিৎকার শুরু করল ও। 'আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে। নইলে আমি মরে যাব।'

বাইরের দারোয়ানটা নিজের মনেই হেসে উঠল। 'একেবারে পাগল হয়ে গেছে, বেচারা!'

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল। ম্লান জোছনায় আলো ছোট্ট জানালা দিয়ে গলে পড়ল ভেতরে। চুপচাপ ঘুমুচ্ছে রাটল্যান্ড। মাথাটা কাত হয়ে আছে এক পাশে। স্বপ্ন দেখছে আবার গর্তটার কাছে ফিরে গেছে সে। দেখছে সেই পিঁপড়েগুলোকে। ম্যানসনের ভেতর থেকে পিঁপড়েগুলো এগিয়ে আসছে তার দিকে। যেন এগিয়ে আসছে কতকাল ধরে। ক্রমেই তার কাছে আসছে। খুব কাছে। ঘুম ভেঙে গেল রাটল্যান্ডের। দরজার কাছে ছুটে গিয়ে যন্ত্রণাদগ্ধ পশুর মতো চিৎকার করে উঠল। 'আমাকে যেতে দাও। দোহাই লাগে,

BanglaBook.org

আমাকে যেতে দাও।'

বাইরে থেকে দারোয়ানটা এগিয়ে এসে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'সব ঠিক আছে, কোনো ভয় নেই। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়।'

ভেতর থেকে রাটল্যান্ড গোঙাতে লাগল। 'দরজা খুলে দাও। তুমি বুঝতে পারছ না– ঐ লোকটা, ঐ ম্যানসন আমাকে মেরে ফেলবে।'

দারোয়ানটা আর দাঁড়াল না ওখানে। এতো রাতে কে শুনতে চায় পাগলের প্রলাপ? নিচের বারান্দায় চলে এলো অন্য এক দারোয়ানের পাশে।

রাটল্যান্ডের মনে হলো রুমের মধ্যে সে আর একা নয়। অশরীরী কিছুর অস্তিত্ব টের পেল সে। নাক-মুখ কুঁচকে তাকাল রুমের চারদিকটায়। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না সে। একটু পরে আবার জোছনা এসে পড়ল জানালায়। সে ম্লান আলোয় রাটল্যান্ড দেখতে পেল ওটা। কালো ছায়ার মতো শরীর। ওটা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

'না-না!' ফুসফুসে যত জোর ছিল সবটুকু উজাড় করে দিয়ে চিৎকার করে উঠল রাটল্যান্ড। তারপর আকুল হয়ে পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। ছায়াটা আরো কাছে এগিয়ে এলো তার। রাটল্যান্ড বিছানার ওপর থেকে কম্বলটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল ওর দিকে। বাতাসে ভেসে গেল কম্বলটা। কালো ছায়াটা তার খুব কাছে এসে পড়ল। দৌড়ে বেড়াতে লাগল রাটল্যান্ড। মনে হলো তার শরীরে শত শত পিন ফুটিয়ে দিচ্ছে কেউ। পায়ের নিচ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে নির্মমভাবে উপরের দিকে উঠছে। এবার তার মুখের ওপর শুরু হলো যন্ত্রণা। মুখ হাঁ করে চেঁচাতে গেল। কিন্তু পারল না। মুখের ভেতরটাও ভরে গেল অসহ্য যন্ত্রণাতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহটা আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। রাটল্যান্ডের পা থেকে মাথা পর্যন্ত গিজ গিজ করছে তখন কুৎসিত পিঁপড়ের দল। ক্ষুধার্তের মতো খুবলে খেতে লাগল ওরা রাটল্যান্ডকে। রাটল্যান্ডের গোঙানির স্বর ক্রমেই নিস্তেজ হতে হতে এক সময় থেমে গেল।

সকালে সূর্য উদয় হলো তার উষ্ণতা নিয়ে। হাসপাতালের কর্মচারীরা তাদের দৈনন্দিন কাজ শুরু করল। এক কর্মচারী রাটল্যান্ডের রুমের দরজা খুলল। খাবারের থালাটা তার হাত থেকে ঝনঝন করে মেঝেতে পড়ে গেল।

'জলদি এসো। কে আছ জলদি এসো।' অসংলগ্ন কণ্ঠে চেঁচাতে লাগল সে।

করিডোরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার কাছে সাদা এপ্রন পরা কর্মচারীদের ভিড় জমে গেল। আতঙ্কের চোখে তাকিয়ে আছে সবাই। এর মধ্যে একজন সম্বিত ফিরে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে ডেকে আনল মেট্রোনকে। 'চেয়ে দেখুন, একটা কংকাল, মরা পিঁপড়ের স্তূপে চাপা পড়ে গেছে!'

কোথাও কোনো এক জায়গায় ম্যানসন তখনো হাসছিল।

BanglaBook.org

দ্য লিভিং শ্যাডো

অনুবাদ : মিজানুর রহমান কল্লোল

পলায়ন

হেরিওয়ার্ড ক্যারিংটন

ছোট্ট সেলটিতে আজ সারাদিন পাঁয়চারি করে কাটিয়ে দিয়েছে অরলফ। নিজের মনের শূন্যতার মতোই বাইরের আকাশটা নিকষ অন্ধকার। মোটা পাথরের দেয়াল ভেদ করে মাঝে মাঝে মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন ওর কয়েদখানায় প্রতিধ্বনি তুলছে। ভাঙা, ছোট জানালা দিয়ে থেকে থেকে ছিটকে আসা বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেছে অরলফের মুখ। স্থির তাকিয়ে আছে সে রাতের আকাশের দিকে। বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল সে, হাতের চেটো দিয়ে মুছল মুখ, তারপর আবার শুরু করল অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বন্দি কারাগারে কদম ফেলা।

যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে অরলফের– মাত্র সাত বছর কেটেছে, সামনে পড়ে রয়েছে দীর্ঘ, যন্ত্রণাময় জীবন। একটা ভয়ংকর অপরাধের দণ্ড খাটছে সে। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে অরলফ যথেষ্ট শাস্তি কি এতদিনে ভোগ করিনি আমি?' চোখ বুজলে এখনো ভেসে ওঠে ভিক্টিমের প্রাণহীন লাশের ছবি, সেই সাথে নিজের হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়া তাজা রক্তের উষ্ণ স্পর্শ যেন এখনো টের পায় অরলফ। তারপর স্মৃতিতে ফুটে ওঠে বিচারের সেই দিনটি, হোমড়া-চোমড়া, ধোপদুরস্ত পোশাক পরা কর্তাব্যক্তিরা, ফার আর স্যাটিনের পোশাকে সজ্জিত সুন্দরী নারী ভীত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চোখ ফেরাতে পারছে না... মাঝে মাঝে ওই দিনটির কথা মনে পড়লে মনে মনে হাসে অরলফ।

কিন্তু আজ অরলফের মুখে হাসি নেই। হতাশা আর প্রতিশোধ নেয়ার বাসনা আজ তাকে বেপরোয়া করে তুলেছে তার মাথায় এখন শুধু চিন্তা একটাই পলায়ন। যেমন করে হোক পালাবে সে এখান থেকে, তারপর যারা ওর জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে তাদেরকেও ধ্বংস করে দেবে অরলফ। প্রতিজ্ঞার ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল অরলফের, পায়চারির গতি হল দ্রুততর, কপালে ফুটে উঠেছে ঘামের রেখা। মুষ্টিবদ্ধ হাতের নখ মাংসের ভেতর ঢুকে গেল, ফোঁটায় ফোঁটায় বেরিয়ে এলো রক্ত।

হঠাৎ ঘর আলো করে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎ। দিনের মতো সেই আলোয় অরলফের নজর আটকে গেল তার ছোট সেলের দূর প্রান্তে একটা বড় পাথরের ওপর। পাথুরে দেয়ালের থরে থরে সাজানো পাথরের সবচেয়ে নিচে ওটা। চোখ রগড়াল অরলফ হাত

BanglaBook.org

দিয়ে। ও কি ভুল দেখছে নাকি সত্যি পাথরটার চারপাশে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে/ মনে হচ্ছে ওখানকার সিমেন্ট ঘষে বা খুঁচিয়ে তুলে ফেলেছে কেউ। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এলো অরলফের। পা টিপে টিপে এগোল পাথরটার দিকে। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল, রক্তাক্ত আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ধার বা পাশগুলো।

হ্যাঁ, পাথরটার চারপাশে বেশ গভীর একটা ফাটল বা গর্তের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। আর কি অবাক কাণ্ড, পাথরটা আলগা। পাথর ধরে টানাটানি শুরু করে দিল অরলফ, আঙুলের নখ উঠে গেল মাংসসহ, দরদর করে ঘাম পড়ছে মুখ বেয়ে... নড়ছে ওটা... অবশেষে বিরাট পাথরটা দেয়ালে গা থেকে খসিয়ে আনতে পারল সে। উঁকি দিল হাঁ করা অন্ধকার গর্তে। আবার ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। সেই আলোতে অরলফ দেখতে পেল ও ধারে একটা প্যাসেজ, সেলের নিচ থেকে চলে গেছে।

মেঝের ওপর এক টুকরো কাগজ নজর কাড়ল অরলফের। ভাঁজ করা, সময়ের সাক্ষী হিসেবে বিবর্ণ এবং হলুদ হয়ে গেছে। কাঁপা হাতে ওটা তুলে নিল অরলফ, জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। নিচের উঠোন থেকে ভেসে আসা মৃদু আলোয় কাগজের ভাঁজ খুলল সে। সংক্ষেপ লেখা, গাঢ় লাল রঙের কোনো তরল দিয়ে। অল্প হলেও পড়ালেখা শিখেছে বলে এই প্রথম নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠল অরলফ। চিরকুটে লেখা :

'আমি এই প্যাসেজ ধরে পালিয়ে গেছি। যে এই রাস্তার সন্ধান পাবে সে এ পথে আসতে পারে। নিচে দস্তখত করা এস কে।'

হঠাৎ সেন্ট্রির বুটের আওয়াজ শুনতে পেল অরলফ তার সেলের দোর গোড়ায়। এক লাফে সে পৌঁছে গেল পাথরের সামনে, সেন্ট্রির পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল ওখানে। তারপর মাথা এবং কাঁধ ঢুকিয়ে দিল গর্তে, আস্তে ধীরে সেঁধুতে শুরু করল সরু প্যাসেজে।

প্যাসেজের দু'পাশের দেয়ালই ভেজা, চিটচিটে, আর দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা পাথরের টুকরোগুলোর ভীষণ ধার, অরলফের জামা-কাপড় ছিঁড়ে একসা হয়ে গেল, মাংস কেটে ঝরঝর রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু অরলফ এসবের কিছুই যেন টের পেল না। অন্ধকারে তার চোখ জ্বলছে ঝকঝক করে– তার মাথায় এখন একটাই চিন্তা– পলাতে হবে। রক্তে ভেজা আঙুল মাটিতে গেঁথে শরীরটাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অরলফ, পেট ঠেকে আছে মেঝেতে, ঠিক একটা সরীসৃপ যেন।

যত সামনে এগুচ্ছে অরলফ, প্যাসেজের ফ্লোর সামনের দিকে ততই ঢালু হতে শুরু করেছে, সেই সাথে দেয়াল মনে হচ্ছে আরো ভেজা, পিচ্ছিল এবং পাথরের টুকরোগুলো যেন আরো চেপে বসছে শরীরে। সরু, ঢালু এই রাস্তায় হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে অরলফ, হাঁপিয়ে উঠেছে, আঁধার দ্রুত ঘন হয়ে আসছে চারপাশে।

হঠাৎ থেমে পড়ল অরলফ, ভয়ের একটা হিমশীতল স্রোত নাড়া দিয়ে গেল ওকে। বুঝতে পারল এখন আর চাইলেও সে তার সেলে ফির যেতে পারবে না। ভাবনাটা কয়েক মুহূর্তের জন্য অবশ করে দিল ওকে। তারপর আবার দাঁতে দাঁত চেপে শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল অরলফ অমানুষিক শক্তিতে।

BanglaBook.org

প্যাসেজের তীক্ষ্ণ একটা বাঁক দেখে ফুঁপিয়ে উঠল অরলফ। ওখানে সরু, মৃদু একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। চাঁদের কিরণ ঢুকছে ফাটল বা গর্ত দিয়ে। তার মানে ওই বাঁকের পরেই রয়েছে তার মুক্তি। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস মৃদু পরশ বুলিয়ে গেল মুখে; মরিয়া হয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবার শেষ চেষ্টাটা চালাল অরলফ।

সামনে যত এগুচ্ছে প্যাসেজটা আরো বেশি ঢালু লাগছে অরলফের। শরীরটা বাঁকা হয়ে আছে অদ্ভুত ভঙ্গিতে। হঠাৎ চোখের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল অন্ধকারের কয়েকটা রেখা, পিচ্ছিল ঢালে আছাড় খেল অরলফ, মাথাটা শক্ত কিসে যেন দড়াম করে বাড়ি খেল, প্রায় অজ্ঞান করে ফেলল ওকে। এক মুহূর্ত পর চোখ খুলল অরলফ। যা দেখল হিম হয়ে গেল বুক। অন্ধকারের রেখা মনে হয়েছিল যেগুলোকে সেগুলো আসলে লোহার মোটা মোটা শিক– ওটা একটা লোহার প্রকাণ্ড ভারি খাঁচা, সামনে কিম্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে– একটা কঙ্কাল।

দ্য এ্যস্কেপ **অনুবাদ : অনীশ দাশ অপু**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হারিয়ে যাওয়া লোকটি

উইলিয়াম অস্টিন

১৮২০ সালের এক গ্রীষ্মে আমাকে বোস্টনে যেতে হয়েছিল বৈষয়িক কাজে। তখন জানতে পারলাম লোকটার কথা, নিজের ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে অনেক আগে নিখোঁজ হয়েছিল সে। সেই কাহিনীই শোনাচ্ছি আপনাদের।

ঘোড়ার গাড়ির সব কটা আসনই ছিল যাত্রীতে ভরা। তাই কোচোয়ানের পাশে গিয়ে বসলাম আমি। একসময় ছুটতে শুরু করল ঘোড়াগুলো। প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করেছি, এমন সময় ঘোড়াগুলো তাদের কান খাড়া করল। 'আপনার সঙ্গে রেইনকোট আছে?' জিজ্ঞেস করল কোচোয়ান।

'না, কেন?' বললাম আমি।

'শিগগিরই আপনার রেইন কোটের দরকার হবে', বলল সে। 'ঘোড়াগুলোর কান লক্ষ্য করেছেন?'

'হ্যাঁ, আমিতো সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম ওরা ওরকম করছে কেন।'

'কারণ ওরা ওই লোকটাকে দেখতে পায়, যে ঝড় তৈরি করে। একটু পরে আমরাও দেখতে পাব।'

আকাশের কোথাও বিন্দুমাত্র মেঘের ছায়া নেই। একটু পরে দূরে কালো মতো কি যেন চোখে পড়ল। 'ওই যে আসছে!' কোচোয়ান বলল। 'ওর পেছনে সবসময় কুয়াশা থাকে। ওকে দেখলেই চেনা যায়, মনে হয় জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে।'

হঠাৎ আমাদের পাশ কাটিয়ে তীব্র গতিতে মিশমিশে কালো একটা ঘোড়া চলে গেল। ঘোড়াটার ওপর বসে আছে একটা লোক, আর ছোট্ট এক মেয়ে। লোকটা শক্ত হাতে লাগাম ধরে ছিল, খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল তাকে। আমাদের ঘোড়াগুলো আবার কান খাড়া করল।

'লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'মনে হয় খুব বিপদে পড়েছে?'

'কেউ জানে না সে কে!' কোচোয়ান উত্তর দিল। 'কিন্তু তাকে আর তার মেয়েটাকে কমপক্ষে একশ' বার আমি দেখেছি। লোকটা কতবার যে আমাকে বোস্টনের পথের কথা জিজ্ঞেস করেছে তার ঠিক নেই। বিরক্ত হয়ে তাই আজকাল আমি তাকে এড়িয়ে চলি। খেয়াল করেছেন যাবার সময় কেমন কড়া চোখে আমার দিকে সে তাকিয়ে ছিল!'

BanglaBook.org

'সে যাচ্ছে কোথায়?'

'কেউ জানে না। ঘোড়া থামায় না কোথাও। শুধু বোস্টনের পথ জানার জন্য মাঝে মাঝে ঘোড়া থামায় তাও মুহূর্তের জন্য। তারপর বাড়ি পৌঁছানোর কথা বলে তাড়াহুড়ো করে চলে যায়।'

ওয়ালপোলে উঁচু একটা পাহাড়ে উঠে এলো আমাদের ঘোড়া। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি নির্মল, পরিষ্কার আকাশ, মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। রেইনকোর্টের কথা মনে পড়ায় হাসি পেল। কিন্তু থমথমে গলায় কোচোয়ান বলল, 'যেদিক থেকে লোকটা এসেছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখুন। ঝড় তাকে ছুঁতে পারে না, তাকে অনুসরণ করে।'

আমরা আরেকটা পাহাড়ে গেলাম, পূর্ব আকাশে টুপির মতো এক টুকরো মেঘ জমেছে। সেদিকে তাকিয়ে কোচোয়ান বলল, 'ঝড়ের মেঘ, বুঝেছেন? তবে ঝড় ওঠার আগেই আমরা পলিতে পৌঁছে যাব। দেখা যাক কি হয়। ওই লোকটা, এমনকি তার বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত ঝড়-বাদলকে ভয় পায় না।'

একটু পরে সত্যি সত্যি আকাশটা মেঘে ঢেকে গেল। আমাদের ঘোড়াগুলো ছুটতে লাগল আরো জোরে। যাত্রীরা শিউরে উঠল। বিদ্যুৎ চমকে উঠল থেকে থেকে। যখন আমরা পলির সরাইখানায় একজন পৌঁছলাম, অমনি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল।

সরাইখানায় একজন লোক বসেছিল। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কালো ঘোড়ায় চেপে একটা লোক ও তার মেয়েকে যেতে দেখেছে কিনা। লোকটা উত্তরে জানাল সে তাদের দেখেছে, তারা ওকে বোস্টনের পথ জিজ্ঞেস করেছিল।

একটু পরে এক ফেরিওয়ালা সরাইখানায় এলো। সেও বলল, ওই ঘোড়সওয়ার মানুষটিকে সে দেখেছে। সে এও বলল যে, ওই মানুষটিকে সে গত পনের দিনের মধ্যে চারটে আলাদা আলাদা রাজ্যে দেখেছে।

এরপর তিন বছর কেটে গেল। আমিও ধীরে ধীরে ভুলে গেলাম লোকটার কথা। কিন্তু একদিন হার্টফোর্ডের বেনেট হোটেলে ওঠার পর এক লোককে বলতে শুনলাম, 'ঐ যে পিটার রুগ আর তার বাচ্চাটি। ভিজে সপসপে হয়ে গেছে!' হঠাৎ মনে পড়ল আমার তিন বছর আগে দেখা লোকটার কথা, বুঝলাম ওর কথাই বলা হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে এগোলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'পিটার রুগ! সে কে?'

'মনে হয় সে একজন ক্লান্তিহীন পর্যটক', বেনেট হোটেলের লোকটি উত্তর দিল। 'কেউ কখনো তাকে বিশ্রাম নিতে দেখেনি। সরকার যে কেন তাকে ডাকহরকরা করল না!'

চুপচাপ বসে থাকা এক আগন্তুক এবার টিপ্পনী কাটল। 'তাহলেই সেরেছে! চিঠি কোনো দিনই বোস্টনে পৌঁছত না। লোকটা কুড়ি বছর ধরে বোস্টন খুঁজে বেড়াচ্ছে!'

'লোকটা কি কখনোই তার ঘোড়া থামায় না বা কারো সঙ্গে গল্পগুজবও করে না?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'তিন বছর আগে তাকে একবার দেখেছিলাম। তার সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত গল্পও শুনেছি। আসলে বিষয়টা কি বলুন তো?'

BanglaBook.org

'বিষয়টা অদ্ভুত', আগন্তুক উত্তর দিল। 'ওকে আর ওর মেয়েটিকে ঘোড়ার উপর আমি বহুবার দেখেছি। মনে হয় হন্যে হয়ে ওরা আশ্রয় খুঁজছে। পিটার রুগ আমার কাছে বোস্টনের পথ জানত চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম বোস্টন একশ' মাইল দূরে। ও বলেছিল, কেন মিথ্যে বলছেন আমাকে? আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, দয়া করে আমাকে বোস্টনের পথটা বলে দিন। ওকে বলেছিলাম যে, আমি সত্যি কথাই বলছি, বোস্টন একশ' মাইল দূরে। ও তখন বলল, গত সন্ধ্যায় নাকি একজন বলেছিল বোস্টন পঞ্চাশ মাইল দূরে। তখন আমি বললাম, সেটা হতে পারে কারণ আপনি বোস্টন ঘুরেই এসেছেন। লোকটার কি ক্ষ্যাপা চাউনি! মেয়েটাকেও বিষণ্ন লাগছিল। লোকটা বলল, আমি বোস্টন খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ বলে পূর্ব দিকে, কেউ বলে পশ্চিম দিকে। সবাই ভুল পথের কথা বলে। তখন ওকে বললাম, আপনি বরং ঘোড়াটা থামিয়ে একটু বিশ্রাম নিন, একেবারে ভিজে গেছেন, আপনার মেয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। লোকটা তখন বলল, বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলাম তাই ভিজেছি, তাছাড়া বিশ্রাম আর কি নেব! আজই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। এর কয়েক দিন পর লোকটার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় ক্লেয়ারমন্টে।'

'পিটার রুগই কি তার আসল নাম?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সে তো তাই বলেছিল', উত্তর দিল আগন্তুক।

আমরা কথা বলছি এমন সময় সেই কালো ঘোড়াটাকে দেখা গেল। পিটার রুগ ও তার মেয়ে বসে আছে ওটাতে। তাড়াতাড়ি আমি রাস্তার উপর নেমে অনেক চেষ্টা করে ঘোড়াটা থামালাম। 'আপনি তো মিস্টার রুগ। আপনাকে এর আগেও আমি দেখেছি।'

'হ্যাঁ, আমি পিটার রুগ,' বলল লোকটা। 'দুর্ভাগ্যক্রমে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আর দেখুন কী ভেজাটাই না ভিজেছি।'

'আপনি তো বোস্টনে থাকেন। বোস্টনের কোন্ জায়গায়?'

'মিডল স্ট্রিটে।'

'আপনি বোস্টন ছেড়ে বেরিয়েছিলেন কবে?'

'ঠিক মনে নেই, তবে মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিন হবে।'

'আপনারা ভিজলেন কিভাবে? এখানে তো বৃষ্টি হয়নি।'

'নদীর ধারে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। আর দেরি করাবেন না আমাকে, তাহলে আজ বোস্টনে পৌঁছতে পারব না। আচ্ছা, বোস্টনে কোন পথ দিয়ে গেলে সোজা হয় বলনুতো? পুরনো পথ দিয়ে? নাকি টোল আদায়ের পথটা দিয়ে?'

'পুরনো পথ ধরে গেলে বোস্টন এখান থেকে একশ' সত্তর মাইল, আর টোল আদায়ের পথ ধরে গেলে সাতানব্বই মাইল।'

'আপনিও ঠাট্টা করছেন? নিউবারি পোর্ট থেকে বোস্টন তো মাত্র চল্লিশ মাইল।'

'কিন্তু এটা নিউবারি পোর্ট নয়। এটা হার্ট ফোর্ড।'

'ডক বলছেন? এটিই তো নিউবারি পোর্ট শহর আর এখানকার নদীর নাম মেরিম্যাক।'

BanglaBook.org

'না। এটি হার্টফোর্ড, আর নদীর নাম কানেকটিকটি।'

অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল পিটার রুগ। 'তাহলে নদীও কি তার গতিপথ পাল্টায়, যেমন শহর তার স্থান পরিবর্তন করেছে। আবার মেঘ জমেছে দক্ষিণে। বৃষ্টি আসছে! ওহ কি ভয়ঙ্কর সেই শপথ!'

আর দেরি করল না সে। ঘোড়া ছুটিয়ে সানের দিকে এগুলো।

পরের বছর বোস্টনে গিয়ে আবার জানতে পারলাম পিটার রুগের কথা। মিসেস ক্রফট-ই বলেছিলেন আমাকে আমার কৌতূহল দেখে। কুড়ি বছর ধরে উনি বাস করছেন মিডল স্ট্রিটে। সেবার বোস্টনে হঠাৎ করেই মহিলার সাথে আমার পরিচয় হলো। আর তারপর চলে এলো পিটার রুগের কাহিনী।

বাড়িটাতে একাই থাকেন মিসেস ক্রফট। গতবছর গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় তার দরজার সামনে ভিজে জবজবে কালো একটা ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘোড়ার ওপর বসেছিল একটা লোক ও ছোট্ট এক মেয়ে। লোকটা মিসেস রুগের খোঁজ করছিল।

'তিনিতো কুড়ি বছর আগে মারা গেছেন।' উত্তরে জানিয়েছিলেন মিসেস ক্রফট।

'বাজে কথা বলবেন না।' লোকটা বলেছিল, 'তাকে ডেকে দিন।'

'বললাম তো তিনি বেঁচে নেই। কুড়ি বছর ধরে এ বাড়িতে আমি একাই থাকি। আমার নাম বেসটি ক্রফট।'

লোকটা কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করেছিল, তারপর বলেছিল, 'রঙটা চটে গেছে বটে, কিন্তু বাড়িটা তো আমার বলেই মনে হচ্ছে।'

লোকটার সঙ্গের ছোট্ট মেয়েটি তখন বলেছিল, 'বাবা, দেখো দরজার সামনে সেই পাথরটা আছে। ওখানে বসে আমি রুটি আর দুধ খেতাম।'

'কিন্তু', একটু ইতস্তত করে বলেছিল লোকটা। 'ক্যাথেরিন তাহলে আমাকে আর ছোট্ট মেয়েটাকে ফেলে অন্য কোথাও চলে গেছে! আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন আমার আত্মীয় জনকয় সমুদ্র যাত্রা শেষ করে বাড়ি ফিরে এসেছে কিনা? তার সঙ্গে দেখা হলে ক্যাথেরিনের খবর পেতাম।'

'জনকয়কে আমি চিনি না। কোথায় থাকত সে?'

'কেন, এখানে! এই অরেঞ্জ-টি লেনে।'

'কিন্তু এটা তো অরেঞ্জ-টি লেন নয়।'

'হায় ঈশ্বর! রাস্তাগুলো কি সব উবে গেল। পেম্বারটন হিলের কাছে হ্যানোভার স্ট্রেটের শেষ মাথায় অরেঞ্জ-টি লেন।'

'কিন্তু ওইখানে তো এখন আর কোনো রাস্তা নেই।'

'কেন আমাকে মিথ্যে তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করছেন? আপনি তো এখানে অনেক দিন ধরেই আছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার ভাই উইলিয়াম রুগকে চেনেন? কিং স্ট্রিটের কাছে রয়্যাল এক্সচেঞ্জ লেনে থাকে সে।'

'এখানে তো কিং স্ট্রিট নেই।'

BanglaBook.org

'অসহ্য। আপনারা সবাই কেন আমাকে নিয়ে এমন লুকোচুরি খেলছেন বলুন তো? আমি খুব ক্লান্ত। আশ্রয়ের জন্য এখন আমাকে বাজারের কাছে হার্টস ট্যাভারেনে যেতে হবে।'

'এখানে তো অনেকগুলো বাজার। কোন্ বাজারটায় যাবেন?'

'শহরের কাছে তো একটিই মাত্র বাজার আছে।'

'আপনি বোধহয় পুরনো বাজারটার কথা বলছেন। কিন্তু সেখানে তো হার্টসট্যাভারেন বলে কিছু নেই।'

'অবাক কাণ্ড! বোস্টনের সঙ্গে এই জায়গাটার সুন্দর একটা মিল থাকায় আমি ভেবেছিলাম এটাই বুঝি বোস্টন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমর ভুল হয়েছে। তাহলে এখানে অন্য কোনো মিসেস রুগ, অন্যকোনো মিডল স্ট্রিট হবে হয়তো। এখনই আমাকে যেতে হবে। বলুন তো বোস্টনে কোন্ পথে যেতে হবে?'

'এটাই তো বোস্টন।'

'হতে পারে। তবে আমি যে বোস্টনের কথা বলছি সেটি নয়। এখানে আসার সময় আমি ফেরির বদলে ব্রিজ পার হয়ে এসেছি।'

'হ্যাঁ, চার্লস নদীর ব্রিজ।'

'কিন্তু বোস্টন আর চার্লস টাউনের মধ্যে তো কোনো ব্রিজ ছিল না, ফেরি সার্ভিস চালু ছিল। আমি যে বোস্টনের কথা বলছি, এটা যদি সেই বোস্টন হতো তাহলে আমার ঘোড়া আমাকে ঠিকই আমার বাড়িতে পৌছে দিত। মনে হয় আরেকটু এগুলে বোস্টনে যাবার পথ পাব।'

এই বলে লোকটা ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিয়েছিল। উত্তেজিত হয়ে ঘোড়া ছুটে চলল।

'এরপর তাকে আর আমি কখনও দেখিনি', বললেন মিসেস ক্রফট। 'সত্যি কথা বলতে কি পিটার রুগ যে সময়ের লোক সেই সময়টি গত হয়েছে।'

মিসেস ক্রফট বললেন যে পিটার রুগ সম্পর্কে তিনি কেবল এতটুকুই জানেন, তবে বুড়ো ফেল্ট হয়তো কিছু জানতে পারেন। তিনি রাস্তার ওপাশেই থাকেন।

মিসেস ক্রফটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেল্টের কাছে গেলাম আমি। বুড়ো আমাকে বললেন যে, যৌবনে তিনি রুগকে চিনতেন। 'রুগের নিখোঁজ হবার সংবাদ শুনে সবাই খুব অবাক হয়েছিল।' বলতে শুরু করলেন মিস্টার ফেল্ট 'অনেকের স্বভাবই হলো পালিয়ে বেড়ানো, রুগও হয়তো সেই পথ গ্রহণ করেছিল। প্রথমে সবাই তাকে নিয়ে আলোচনা করতো, কিন্তু ধীরে ধীরে এক সময় সবাই ভুলে গেল তার কথা। খবরের কাগজেও তার হারিয়ে যাবার কাহিনী বেরিয়েছিল। কিন্তু কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারেনি পিটার রুগের।'

'সে এখনও জীবিত আছে', বললাম আমি। 'তাকে আর তার ছোট্ট মেয়েটাকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছি।'

BanglaBook.org

'পিটার রুগ হয়তো বেঁচে আছে', বললেন তিনি। 'আমার চেয়ে দশ বছরের বড় সে। গত মার্চে আমি আশিতে পড়েছি। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটাকে দেখবেন কিভাবে। এখন মেয়েটার বয়স হবে কমপক্ষে ষাট বছর। কারণ ১৭৭০ সালের বোস্টনের সেই হত্যাকাণ্ডের সময় জেনি রুগের বয়স ছিল দশ।'

বুঝলাম মিস্টার ফেল্টকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বার্ধক্যবশত তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবারই কথা। তাই আর কিছু জিজ্ঞেস না করে মার্লবরো হোটেলে ফিরে গেলাম আমি। কয়েকজনকে বললাম পিটার রুগের কথা।

'সত্যিই ওকে আপনি দেখেছিলেন?' অবিশ্বাসের সুরে বলল একজন। 'আমার দাদাকে তার কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, স্ত্রী ও একমাত্র মেয়ে জেনির সঙ্গে সিডল স্ট্রিটে বাস করত পিটার রুগ। খুব বিনয়ী ছিল সে, কিন্তু মাঝে মাঝেই তার মেজাজটা বিগড়ে যেত। মেজাজ বিগড়ে গেলে দরজায় লাথি মারত, ডিগবাজী খেয়ে পায়ের ওপর দাঁড়াত, আর ভয়ঙ্কর সব প্রতিজ্ঞা করত। একবার তো একটা পেরেক কামড়ে দু'টুকরো করে ফেলেছিল।

তখন ছিল শরৎকাল। এক সকালে মেয়েকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কনকর্ডের পথে যাচ্ছিল। কিন্তু রাতে ফেরার পথে ঝড় উঠল প্রচণ্ড ও দেখা করতে গিয়েছিল ওর বন্ধু কার্টারের সঙ্গে। কার্টার ওকে বলেছিল থেকে যেতে। ওই রাতে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে বের হতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু রুগ শোনেনি বন্ধুর কথা। ওই ঝড়ের মধ্যে বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ল। বলল যত বাধাই আসুক না কেন রাতের মধ্যেই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু আর কোনো দিনই সে বাড়ি ফিরে আসেনি।

এরপর ঝড়ের রাতগুলোতে রুগের স্ত্রী নাকি দরজার কাছে পরিচিত ঘোড়ার শব্দটা শুনতে পেত। প্রতিবেশীরাও একই কথা বলত। অনেকেই নাকি লুণ্ঠনের আলোয় পিটার রুগ, তার মেয়ে ও কালো ঘোড়াটাকে দেখেছে। বাড়ির কাছে এসে নাকি রুগ অনেক চেষ্টা করেছে ঘোড়াটাকে থামাতে, কিন্তু পারেনি। ক্যাথেরিন রুগ যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাকেই বলেছে স্বামী ও মেয়ের খোঁজ করতে, কিন্তু এখানে-সেখানে অনেক অনুসন্ধান করেও তারা ব্যর্থ হয়েছিল।

একবার গুজব রটেছিল পিটার রুগকে নাকি কালেকটিকাটে দেখা গেছে, ওর বন্ধুরা আবার ওর খোঁজ করতে লাগল। পরদিন তারা শুনল, কেউ কেউ নাকি পিটার রুগকে মেয়েকে সঙ্গে করে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছে। নিউ হ্যামশায়ারের পথে রুগ নাকি বোস্টনের পথের কথা জিজ্ঞেস করছে। অনেকেই তার ঘোড়াটাকে থামানোর চেষ্টা করেছে, পারেনি। লোকটা সেই যে হারিয়ে গেল– এখনো রহস্যই থেকে গেছে।'

এ পর্যন্ত বলে থামল লোকটা।

এরপর আরো দু'বছর কাটল।

১৮২৫ সালে ঘোড়দৌড় দেখতে আমি গেলাম ভার্জিনিয়ার রিচমন্ডে। এ খেলার সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল ডার্ট ও লাইটিং নামের দুটো ঘোড়া। দুটোরই উচ্চতা সমান, দেখতেও চমৎকার। ঠিক বারোটায় শুরু হল খেলা। ঘোড়া দুটো ছুটতে শুরু করল।

BanglaBook.org

কিন্তু কোত্থেকে যেন উদয় হলো বিশাল এক কালো ঘোড়া। ওটাকে দেখে ওরা ভয় পেয়ে গেল! ঝড়ের বেগে কালো ঘোড়াটা ছুটে গেল ওদের মাঝ দিয়ে। কেউ কেউ বলল, 'ওটা ঘোড়া নয়, ওটা একটা বুনো ষাঁড়।' আবার কেউ কেউ বলল, 'লাইটিংকে যখন হারিয়েছে তখন ওটা ঘোড়া হতে পারে না, অন্য কিছু হবে।'

পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করতে করতে হোটেলে ফিরছিলাম আমি। ঠিক তখনই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। 'কেমন আছেন?' সহাস্যে বলল সে। 'বছর দুই আগে মার্লবরো হোটেলে আপনার সাথে পরিচয় হয়েছিল, মনে আছে? পিটার রুগকে নিয়ে কথা হচ্ছিল আমাদের মধ্যে।'

'ভালো আছি', উত্তরে বললাম আমি। 'সব ঘটনাই আমার মনে আছে।'

'তো রুগকে দেখেছেন এর মধ্যে? ওর খবর পেলেন কিছু?'

'দেখেছি', বললাম আমি। 'গত বছর গরমের সময়।'

বায়ু পরিবর্তনের জন্য বেরিয়েছিলাম আমি। আর সে সময় দেখতে পেয়েছিলাম তাকে, আর তার তেজী ঘোড়াটাকে। আমাকে বলেছিল, 'আপনি কি বোস্টনে যাচ্ছেন? আমাকে একটু পথ দেখিয়ে দিন। আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আজ রাতেই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। তাকিয়ে দেখুন আমার ছোট্ট মেয়েটার কেমন ঘুম পেয়েছে।'

'আজ রাতে কোনোভাবেই আপনার বাড়ি পৌঁছানো সম্ভব নয়', ওকে বলেছিলাম আমি। 'কারণ আপনি এখন কনকর্ডে রয়েছেন।'

এ কথা শুনে রেগে যায় সে। 'কেন মিথ্যে কথা বলছেন? সেই কখন কনকর্ড ছেড়েছি! আমার ঘোড়াটার পেটে এখনও দানাপানি কিছু পড়েনি।'

'আমি মিথ্যে বলছি না। সত্যিই এটা কর্নকর্ড, বোস্টন থেকে পাঁচশ' মাইল দূরে।'

এরপর লোকটা ঘোড়া চালিয়ে চলে যায়।

আবার ওকে দেখেছিলাম আলেকজান্দ্রিয়া ও মিডলবার্গের মাঝে টোল আদায়ের ফটকের সামনে। তখন খরা দেখা দিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। ওখানে টোল আদায়কারী এক লোকের সঙ্গে খরার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

'বৃষ্টির অভাবে চারদিক শুকিয়ে কেমন খাঁ খাঁ করছে', টোল আদায়কারী লোকটা বলছিল, 'তবে বৃষ্টি নামতে আর দেরি নেই। কারণ আমার এক বন্ধু দু'দিন আগে কেনটাকিতে কালো ঘোড়া আর সেই রহস্যময় লোকটাকে দেখেছে।'

'বৃষ্টির সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?'

'তা জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি সে এলেই বৃষ্টি আসে।'

সত্যি সত্যি পূর্ব আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। একটু পরে দেখা গেল কালো ঘোড়াটিকে। ঘোড়ার ওপর যে পিটার রুগ বসে আছে তাতে সন্দেহ নেই। টোল আদায়কারী লোকটা তার পথ আটকিয়ে দু'ডলার দাবি করল। আমি নিষেধ করলাম লোকটিকে। লোকটা বলল, 'এই লোকটা দশবার টোল ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। একবার তো তার ঘোড়াটা আমাকে মারতে বসেছিল, কোনো রকমে প্রাণে বেঁচেছি।'

BanglaBook.org

বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল পিটার রুগ। 'কেন আমাকে আটকাচ্ছেন। দেখছেন না আমি বৃষ্টিতে ভিজে গেছি, হন্যে হয়ে খুঁজছি বোস্টনের পথ, আর রাজপথে কোনো মাশুল লাগে না।'

'কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন না এটা টোল আদায়ের ফটক।' বলল টোল আদায়কারী লোকটা।

'কিন্তু ম্যাসাচুসেটে টোল দেয়া লাগে না।'

'হতে পারে, কিন্তু এটা ম্যাসাচুসেট নয়। এটা ভার্জিনিয়া।'

'বাজে কথা বলবেন না। আপনি কি বলতে চাইছেন আমি এখন ভার্জিনিয়ায়?'

'লোকটা ঠিকই বলেছে', বললাম আমি। 'আপনি এখন ভার্জিনিয়াতে।'

আমার কথা শুনে রাগে লাল হয়ে উঠল পিটার রুগ। বলল, 'একেবারে প্রতারকদের পাল্লায় পড়েছি। ভার্জিনিয়া তো দূরের কথা, বোস্টন ছেড়ে চল্লিশ মাইল দূরেও আমি কোনো দিন যাইনি।'

আবার টোল চাইল আদায়কারী। একটা পেনিও আমি দেব না।' রাগে চিৎকার করল পিটার রুগ। রাজপথে দাঁড়িয়ে যারা টোল আদায় করে তারা তস্কর। কেউ আমাকে বোস্টনের পথ দেখাল না।'

চঞ্চল হয়ে উঠল রুগের ঘোড়া। সেদিকে তাকিয়ে আমি টোল আদায়কারীকে বললাম, 'ওদের যেতে দাও, নইলে এই ঘোড়া তোমার ফটক উড়িয়ে দেবে।'

ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে টোল আদায়কারী আমাকে বলল, 'ঐ ভুতুড়ে ঘোড়সওয়ারকে আমি প্রথম দেখি ১৮০৬ সালে। প্রথমে ভেবেছিলাম অন্ধকারে পশুটা ভয় পেয়েছে, তাই টোল না নিয়েই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এরপর একবারও সে টোল দেয়নি। ঘোড়ার গাড়িটা সবসময় ঝড়ের গতিতে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যেমন করে হোক আটকাতে হবে একদিন পিটার রুগকে। জানতে হবে তার রহস্য। আর এজন্য তার সঙ্গে আমাকে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

এলিজাবেথ টাউনের পথে পিটার রুগ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারলাম না আমি। কিন্তু পাওলেসহুকে যখন পৌঁছলাম মানুষের মধ্যে একটা গুঞ্জন লক্ষ্য করলাম। দেখলাম, একটা খেয়া নৌকা ঘিরে বেশ ভিড় জমে উঠেছে অবাক বিস্ময়ে কি যেন একটা দেখছে। কাছে গিয়ে দেখলাম পিটার রুগ আর তার কালো ঘোড়ার গাড়ি। মেয়েটিও সঙ্গে রয়েছে। রোদে পুড়ে পিটারের গায়ের রঙ কালো হয়েছে, ছিঁড়ে গেছে পোশাক পরিচ্ছদ, কিন্তু তাকে দেখলে মনে হয় তার বয়স বড়জোর ত্রিশ।

'আমার ঘোড়ার ধৈর্য খুবই কম', বলল পিটার রুগ। 'তাড়াতাড়ি নৌকা ছাড় ন, নইলে ওকে সামলানো যাবে না।'

এ কথায় ঘোড়াটা আরো চঞ্চল হয়ে উঠল। দুলে উঠল নৌকাটা। 'ওকে বিরক্ত করবেন না', রুগ বলল। 'কারো ক্ষতি করবে না ও। আমার মতো ঘোড়াটাও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। মনে হয় আস্তবলের গন্ধ পেয়েছে।'

BanglaBook.org

একটু চালাকি করে আমি পিটার রুগকে বললাম, 'আমি একজন আগন্তুক। আচ্ছা এই নদীটার নাম কি? ও পারে কোন জায়গা?'

'এটা মিস্টিক নদী', উত্তর দিল রুগ। 'এটি উইনি সিমেন্ট ফেরিঘাট, আর ওপারে বোস্টন।'

'কত দিন আগে আপনি বোস্টন ছেড়েছেন?"

'ঠিক মনে করতে পারছি না। একদিন আমার এই মেয়েটাকে নিয়ে কনকর্ডে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছিলাম। বলতে লজ্জা করছে যে আমি পথ হারাই। সেই থেকে শুধু ঘুরছি আর সবার কাছেই আমি বোস্টনের পথ জানতে চেয়েছি, সেই আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছে। একজন পথিককে বিভ্রান্ত করা মহাপাপ।'

পথে টোল দিতে চায়নি পিটার রুগ, কিন্তু মিস্টার হার্ডিকে ভাড়া দিল। তার হাতে একটা রৌপ্য মুদ্রা ধরিয়ে দিল সে।

'কি এটা?' জিজ্ঞেস করল হার্ডি।

'এটি ত্রিশ শিলিংয়ের মুদ্রা', জবাব দিল পিটার রুগ।

'একদিন হয়তো এটা তাই ছিল। কিন্তু এখন অচল।'

'সে কি? সেদিনই তো এই মুদ্রা ইংল্যান্ড থেকে আনা হল।' দেখলাম মুদ্রাটি আধা ক্রাউন মূল্যের এবং ১৬৪৯ সালের। আমি হার্ডিকে বললাম, 'বদ দাও। আমি ঐ মুদ্রার বদলে প্রচলিত মুদ্রা দিচ্ছি।'

আমার দিকে তাকাল পিটার রুগ। বলল, 'আপনিই একমাত্র ভদ্রলোক। আমি কি আপনার নামটা জানতে পারি?

'আমার নাম ডানওয়েল।'

'আপনি এখানে নতুন। একজন আগন্তুক। আপনি আমার বাড়িতে আশ্রয় নিলে খুব খুশি হব। আমার স্ত্রীও খুশি হবেন। আমার গাড়িতে আসুন, মিডল স্ট্রিটে পৌঁছতে বেশি দেরি হবে না।'

তার ঘোড়ার গাড়িটায় উঠলাম আমি।

'আপনি কি কখনো বোস্টনে গেছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না।'

'ফিলাডেলফিয়ার পরেই বোস্টন দ্বিতীয় সুন্দর শহর। যদিও নিউইয়র্কে আমি যাইনি, কিন্তু বোস্টনের সৌন্দর্যের কাছে নিউইয়র্ক কিছুই না।' কেমন যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল পিটার রুগকে। এর মধ্যে অনেকটা পথ এগুলাম আমরা।

'আমরা এখন যে শহরটাতে আছি এটাই কি বোস্টন? নাকি নিউইয়র্ক?

'না, এটি বোস্টনও নয়, নিউইয়র্কও নয়। নিউইয়র্ক থেকে বোস্টন ঠিক দুশো মাইল। আর কোনো দিন আমি বোস্টান খুঁজে পাবো না। মনে হচ্ছে রাতারাতি মরুভূমি থেকে উঠে এসেছে বিশাল এই শহর, এই অট্টালিকা, বাহারি দোকান– সব যেন ছবির মতো।'

হঠাৎ সামনে চিৎকার শোনা গেল। 'ওকে থামাও, নইলে সব তছনছ হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

তীব্র বেগে ছুটে চলেছে পিটার রুগের ঘোড়া। কেউ থামাতে পারল না ওটাকে। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পথ।

'মিস্টার রুগ', বললাম আমি, 'লক্ষ্য করেছেন পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে। মনে হচ্ছে ঝড় তেড়ে আসছে আমাদের দিকে।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি। সত্যিই ঝড় আসছে। আমার খোলাগাড়ি, বৃষ্টিতে আপনি ভিজে যাবেন। তারচেয়ে এখানেই নেমে পড় ন। বিদায় মিস্টার ডানওয়েল, বোস্টনে আপনাকে দেখতে পেলে খুব খুশি হব। মিডল স্ট্রিটে থাকি আমি।'

ঘোড়া থামাল পিটার রুগ। আমি নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল সে।

একদিন পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম আমি। উত্তরাধিকারীর অভাবে পিটার রুগের সম্পত্তি ম্যাসাচুসেটের কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং আইনানুসারে তা নিলামে বিক্রি হবে। পকেটে বিজ্ঞাপন নিয়ে জায়গাটায় এলাম আমি। দেখলাম বিশাল ভূ-সম্পত্তি। কেউ থাকে না এখানে। মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। এতো বিষয়-সম্পত্তি শুধুমাত্র উত্তরাধিকারীর অভাবে নিলাম হতে চলেছে। যদি কোনো দিন দৈবক্রমে পিটার রুগ এখানে এসে উপস্থিত হয়– এই ভগ্নস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই হয়তো নিজেকে প্রশ্ন করবে, 'একদিন কে থাকত এখানে?' সত্যিই বিশাল বাড়িটা যেন কালের স্রোতের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

আইনজীবীটি বেশ বাকপটু। 'বন্ধুগণ!' ঘোষণা করল সে, 'এই অঞ্চলে একটা অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়, তাহলো এই সব সম্পত্তির মালিক পিটার রুগ নাকি এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু এটা সত্য নয়। যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তাঁর বয়স হবে একশ'। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তিনি তাঁর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তারপর তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। তিনি আবার ফিরে এসে সম্পত্তি দাবি করবেন এটা হাস্যকর। তাই এই সম্পত্তি এখন নিলামে তোলা হবে। সম্পত্তির প্রতি ফুটের জন্য আপনারা কত দিতে পারবেন?'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রতি ফুটের জন্য পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর সেন্ট দাম উঠল। তারপর তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল এক ডলারে। নিলামদারকে দেখে মনে হল সে খুব খুশি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করল, 'আর যদি দাম না ওঠে তাহলে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি আমার কাজ সারব।'

এই সামান্য সময়টাকে মনে হল যেন একটা যুগ। হঠাৎ করেই নীরবতা ভঙ্গ হল। শুরু হল চেঁচামেচি হৈচৈ। মনে হলো ভূমিকম্প শুরু হয়েছে, কেঁপে উঠছে সবকিছু। হ্যানোভার স্ট্রিট থেকে একটা শব্দ এদিকেই আসছে। তারপর একটু পরেই আবির্ভূত হল সেই কালো ঘোড়া, ঘোড়ার সঙ্গে জোড়া গাড়িতে বসে আছে পিটার রুগ ও তার মেয়ে।

'আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।' মেয়ে জেনিকে বলল পিটার রুগ। 'আমাদের বাড়িটাও পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ঈশ্বর দয়া করুন তোমার মা যেন বেঁচে থাকে।'

BanglaBook.org

'বাবা', উত্তর দিল জেনি, 'এদেরকে তো প্রতিবেশী বলে মনে হচ্ছে না। তবে তোমার সঙ্গে আমি একমত যে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে আমাদের বাড়িটা। লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার মা কোথায়।'

সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে পিটার রুগের গাড়িকে মাঝে রেখে। ভয়ে কেঁপে উঠল নিলামদার।

'আমার বাড়ি পুড়িয়েছে কে?' গম্ভীর কণ্ঠে চিৎকার দিল পিটার রুগ। 'কেন আমার জমিতে ভিড় করেছ তোমরা? বোস্টনের সবাইকে আমি চিনতাম, কিন্তু তোমাদের চিনতে পারছি না। কে তোমরা? কোত্থেকে এসেছ? কি চাও?'

এক সময় ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'এখানের সবকিছুই স্বাভাবিক শুধু অবাক হচ্ছি আমরা আপনাকে দেখে। সময়ের সঙ্গে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়, আবার নতুন করে সৃষ্টিও হয়। সময় আপনার সবকিছুকে গ্রাস করেছে। বহুকাল আগে আপনি ঝড়ের মুখে পড়েছিলেন। সেই ঝড় থেমে গেছে, কিন্তু আপনি আর বাড়ি ফিরতে পারেননি। আপনার স্ত্রী, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আপনার জমিজমা-সম্পত্তি রয়েছে কিন্তু পুড়ে গেছে বাড়িটা। আপনিও এখন আর এই পৃথিবীর নন। অনেক আগেই আপনার নাম কাটা গেছে। মানুষের এই পৃথিবীতে আপনি আর ঘর বাঁধতে পারবেন না। আপনি চলে যান। আপনি এই সময়ের নন।'

পিটার রাগ, দ্য মিসিং ম্যান **অনুবাদ : মাকসুদা ইয়াসমিন রিপা**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

খাঁচা

ডব্লিউ এলিজাবেথ টার্নার

কোনো গ্রামে গেলে সাধারণত আমি একা কোথাও যাই না। কিন্তু আমার স্বামী জিম গেছে রাগবি ম্যাচ খেলতে। একাকি বাড়িতে বসে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ঠিক করলাম বাইরে থেকে একটু খোলা হাওয়া খেয়ে আসব।

এ গ্রামে আগে কখনো আসিনি। আমি পথঘাটও ভালোমতো চিনি না। তাই অর্ডন্যান্স সার্ভে ম্যাপটা খুলে বসলাম। ম্যাপ দেখে ঠিক করলাম বৃত্তাকারের রাস্তাটা ধরে এগুবো, ওটা একটা খামারবাড়ির রাস্তা, চলে গেছে মাঠের মাঝ দিয়ে। জিম হয়তো এসব জায়গায় যেতে আগ্রহ বোধ করবে না, কিন্তু খোলা হাওয়ার জন্য জায়গাটার দূরত্ব আমার অপছন্দ হলো না। ওখান থেকে তাড়াতাড়িই ফিরে আসতে পারব।

ট্র্যাকের মাথায় এসে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়তে হলো। সামনে রাস্তা চলে গেছে ঘাসের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। মাটিতে ট্রাক্টরের চাকার ছাপ, ডিসেম্বরের বাতাস ঠাণ্ডা, কটু একটা গন্ধ নিয়ে স্থির হয়ে আছে।

চড়াইয়ের দিকে পা বাড়ালাম, ওদিকে দিগন্ত রেখায় গাছ ছুঁয়েছে আকাশকে। পাটে বসার যোগাড় করছে সূর্য, তাই তার আলো ম্লান, রূপোলি উত্তরের আকাশে ধাতব রঙা মেঘ জানান দিচ্ছে সন্ধ্যা নামছে আগেভাগেই।

দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছি আমি। একটা সাইন পোস্ট পেরিয়ে এলাম, ওতে ফিরতি পথের নির্দেশ লেখা। চারপাশ ভালোভাবে লক্ষ্য করে ছবিটা মনের ফ্রেমে বন্দি করে রাখার চেষ্টা করছি যাতে আঁধার নেমে এলেও পথ চিনে ফিরতে অসুবিধা না হয়। মাঠের একধারে দেখলাম বেশ ক'টা কাকতাড় য়া ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোকে চিনে রাখলে ফিরতে আর সমস্যা নেই আমার। পেশীতে ঢিল পড়ল আমার, চনমনে মন নিয়ে প্রকৃতির নির্জন সৌন্দর্য উপভোগ করছি আমি এখন।

কতগুলো দাঁড়কাক দেখলাম একটা গোলা ঘরের ওপর চক্কর দিচ্ছে, নীল রঙের প্লাস্টিকের একটা ফার্টিলাইজার ব্যাগ ওদের লক্ষ্য। ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে। তারপর আবার সেই আশ্চর্য নীরবতা নেমে এলো। ভেড়ার একটা পালকে দেখলাম কেমন চুপ মেরে গেছে, ঘাস বিচানোর আওয়াজ যেন ফিসফিসানিতে পরিণত হয়েছে, অন্ধকার তৃণভূমিতে কালচে শরীরগুলো ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

BanglaBook.org

গম ক্ষেতের গমের গাছগুলো সটান মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ পানে, মনে হলো ফুলপ্যান্ট পরা মানুষ। একা থাকলে এরকম কত অদ্ভুত চিন্তাই না মানুষের মাথায় আসে। আমি গোলাঘরের দিকে পা বাড়ালাম, ওখানে কেউ থাকে কিনা দেখতে। স্রেফ কৌতূহল।

মাঠ ধরে হাঁটছি, হঠাৎ স্যাঁতস্যাঁতে বিশ্রি একটা গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে, শিউরে উঠলাম। মাঠের পাশে একটা খাদ। তবে গন্ধটা ওখান থেকে আসছে না। আসছে কয়েক গজ দূরে দাঁড়ানো কাকতাড় য়ার গা থেকে। পচা লাশের গন্ধ। বমি এসে যায়।

কাকতাড় য়াটা অবিকল মানুষের মতো দেখতে। কোটের হাতা থেকে দুটো কাঠি ফুঁড়ে বেরিয়েছে, প্রতিটির মাথায় নোংরা গ্লাভস, পেরেক ঠুকে আটকে দেয়া হয়েছে। মুখটা বীভৎস, মাথা বলতে কিছু নেই, একদিকে হেলে আছে মুখ, চোখের জায়গায় হাঁ করে আছে শূন্য সকেট। জীর্ণ একটা হ্যাটের আড়াল থেকে ঝুলে আছে ভেজা, পাতলা মাংসের পরত। কাকতাড় য়াটাকে রাখা হয়েছে লোহার একটা খাঁচার মধ্যে, খাঁচার নিচের মাটি নোংরা। কাকতাড় য়ার গা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলে পড়া তরলে বোঝাই হয়ে গেছে। লোহার শিকের বাইরে কাকতাড় য়ার একটা হাত দেখতে পেলাম। বাড়ানো, নখগুলো থাবার ভঙ্গিতে উঁচিয়ে আছে শূন্যে।

আতঙ্কে অবশ হয়ে গেলাম আমি। কাকতাতুয়া নয়, ওটা একটা মানুষ। ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে লোকটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তারপর কাকতাড় য়ার মতো ঝুলিয়ে রেখেছে লোহার খাঁচায়।

কাঁপতে কাঁপতে ঘুরে দাঁড়ালাম। টলতে টলতে ছুটলাম খানাখন্দে বোঝাই মাঠ দিয়ে। স্যান্ডেলে আঠালো কাদা আটকে দিতে চাইল আমাকে। হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। হেডলাইট দেখা যাচ্ছে, ট্রাক অনুসরণ করে গাড়িটা আসছে এদিকেই। কিন্তু যেখানে ফুটপাতের শুরু, ওখানে এসে থেমে গেল গাড়ি, নিভিয়ে ফেলা হল আলো।

ড্রাইভার নেমে এলো গাড়ি থেকে। আমাকে কোনো সম্বোধনও করল না, স্রেফ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। বুঝতে পারলাম লোকটা টের পেয়ে গেছে তার শয়তানি কাজকর্মের সাক্ষী আমি। আমাকে ধরতে পারলে নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে।

একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা চিরে, ঘুরেই দিলাম ছুট। কিন্তু কাদামাটিতে পা পিছলে গেল আমার। দড়াম করে আছড়ে পড়লাম। মুখ তুলে দেখি আরেকটা লোহার খাঁচার নিচে পড়ে আছি আমি। তবে খাঁচাটা শূন্য, যেন অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

BanglaBook.org

কোন্ড এজ আয়রন **অনুবাদ : অনীশ দাস অপু**

নদীর মাঝে বাড়ি

প্যাট্রিসিয়া ফেরারা

ওহানা ছিল ছোট্ট এক নদী। বেগ ছিল, তবে আকারে ছিল একদম সরু। তারপর বন্যা হতে হতে একসময় দু'কূল প্লাবিত হয়ে চিরস্থায়ী একটা রূপ নিল। ছোট্ট নদী ওহানা সমতল ফিতের মতো ছড়িয়ে একটা সুবিশাল হ্রদের মতো হয়ে গেল। নদীর দু'কূলে বসবাসকারীরা যার যার বাড়ি ফেলে চলে গেল নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু রোরির দাদা-দাদি যখন তাঁদের নদীর তীরবর্তী বাস গুটিয়ে মনোরম এবং নিরাপদ পাহাড়ি এলাকায় চলে আসেন, তখনও জন্ম হয়নি ওর। নদীর ভয়াল রূপ কখনো দেখেনি ও। কাজেই নদীকে ভয় পায় না রোরি। বরং নদী যেন ওর কাছে স্কুল বাসের মতোই নিরাপদ কিছু। গরমের সময় নদীর ধারেই থাকে ও, নদীর ধারে ঘুমায়। নদীকে ঘিরে সাধারণ কৌতূহলগুলো দোলা দেয় ওর মনে।

অবশ্য রোরি বেশিরভাগ সময় উদগ্রীব থাকে, কখন শহরে ভিডিও গেম খেলতে পারবে সুপার মার্কেটে গিয়ে। স্পেস ইনভেডারস হচ্ছে ওর সবচেয়ে প্রিয় খেলা। সেই সঙ্গে আর কিছু মজার খেলা রয়েছে ভিডিও গেমে। কিন্তু মনের সুখ মিটিয়ে কখনো খেলা হয় না ওর। সপ্তাহে মাত্র একবার দাদির সাথে শহরে যাওয়ার সুযোগ ঘটে রোরি'র, যখন তিনি সাপ্তাহিক কেনাকাটা সারতে যান। আর কেবল তখনই ভিডিও গেম খেলতে পারে রোরি। তবে একবার সপ্তাহে দু'বার যাওয়া হয়েছিল রোরির। দুধটা টকে গিয়েছিল বলে ফিরিয়ে দিতে যান দাদি। কিন্তু দোকানে গিয়ে ওর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন দাদি। শেষে অনেক বলে-কয়ে একটা মাত্র গেম খেলার সুযোগ পায় ও।

আগস্টে বরাবরের মতো গরম পড়ল চারদিকে। একেবারে সেদ্ধ করা গরম। তীর থেকে কয়েক ফুট নেমে গেল নদীর পানি। ফাঁকা জায়গাটায় জমে রইল থকথকে কাদা আর ধারাল পাথর। রোরি একটা লাঞ্চ বক্সে কিছু খাবার নিয়ে চলে যায় নদীর তীরে। সারাদিন কাটিয়ে আসে ওখানে। নদীর পানিতে একদিকে যেমন ঠাণ্ডা হয়, রোদে পুড়ে তেমনি হয় গরম। সারাদিনে প্রচুর ক্লান্তি জমে ওর। তবু কি যেন সুখ পায় এই নদীর তীরে থেকে।

আগস্টের এমন দিনে একদিনে নদীর তীরে শুয়ে আছে রোরি, সন্ধ্যের মৃদুমন্দ বাতাস ওকে মনে করিয়ে দিল বাড়ি ফেরার কথা। মাথায় ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে

BanglaBook.org

এলোমেলো ভাবনা। সহসা এর আগে নদী থেকে কখনো এরকম শব্দ আসেনি ওর কানে। দু'হাতে রোদ আড়াল করে পশ্চিম দিকে তাকাল ও। দূরে ভালোমতো বোঝা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়িয়ে জিনিসটাকে রক্তিম সূর্যের লালচে আলোর জন্য বোঝা গেল না কিছু। সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত উঁকি ঝুঁকি মেরে জিনিসটাকে দেখার বা বোঝার চেষ্টা করল রোরি। কিন্তু ক্রমেই ঝাপসা হয়ে এল ওটা। এক সময় মিশে গেল আঁধারে। আর রোরিও বাড়ি ফেরার তাড়া অনুভব করল।

আজ একটু দেরি করেই বাড়ি ফিরল রোরি। এ নিয়ে রাগারাগিও করলেন দাদি। এদিকে ওর ডিনার প্রায় ঠাণ্ডা। একাকি এই খাবারও খেল ও।

পরদিন নদী তীরে এসে রোরি দেখে, কালকের ওই তেকোণা জিনিসটা আর নেই। তবে জিনিসটার আদল এখনও মনে আছে ওর। কেমন একটা খাপছাড়া গড়ন ছিল ওটার। গাছের গুঁড়ি বা ওরকম কিছু নয়। জ্যামিতিক গড়ন। যেন কারও হাতে গড়া জিনিসটা। কিছুদিন কাটল ওভাবেই। তারপর একদিন নদী এক চক্কর সাঁতার কেটে এসে তীরে বিছানো তোয়ালের ওপর শুয়ে বড় বড় করে শ্বাস টানছে ও। মিনিট কয়েক পর স্বাভাবিক হয়ে যেই পশ্চিম দিকে তাকিয়েছে, অমনি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল ও নিজের অজান্তেই। সেই তেকোনা কালো জিনিসটা আবার ভেসে উঠেছে। সূর্যের তেজী আলোকে আড়াল করে বহু কষ্টে জিনিসটার দিকে তাকাল ও। সূর্যটা সবে মধ্য আকাশ পেরিয়েছে। কাজেই চারদিকে ঝলমলে রোদ। ফলে জিনিসটাকে আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছে। রোরি দেখে, জিনিসটা আসলে মোটেও তেকোনা নয়। চারকোনা। তবে গড়নটা জ্যামিতিক। কিছুক্ষণ পর জিনিসটার আকার আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। চৌকোনা জিনিসটার নিচে দুটো পিলার দেখা যাচ্ছে। ঢেউয়ের দোলার সাথে তাল মিলিয়ে উঁকি দিচ্ছে বার বার। আরও কিছুটা সময় গেলে রোরি ধরে ফেলে জিনিসটা আসলে কি। চৌকোনা জিনিসটা আসলে একটা বাড়ির ছাদ। আর ওই পিলার দুটো ছাদ থেকে নেমে গেছে বারান্দায়। তার মানে ওটা একটা বাড়ি। কিন্তু বাড়িটা হঠাৎ এই নদীর মাঝখানে এলো কোথেকে? বন্যার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও বন্যার ছবি দেখেছে ও। কিন্তু এখানে কোনো বন্যা নেই। বরং নদীর পানি তীর থেকে নেমে গেছে আরও ফুট তিনেক নিচে। তাছাড়া কোনো বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে আসার মতো প্রবল তোড়ও নেই পানির ঢেউয়ে। তাহলে?

বাড়িটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে দাদির গল্পগুলোর কথা মনে পড়ে গেল রোরির। দাদি প্রায়ই পুরানো এক বাড়ির গল্প শোনান ওকে। গত বন্যায় সে বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে এসেছেন তারা। বাড়িটা এখনও স্মৃতি তাড়িত করে দাদিকে। তিনি বাড়ির সেই মিষ্টি পরিবেশের ছন্দময় সুর যেন শুনতে পান এখনও। নদীর গর্ভ থেকে উঁকি দেয়া বাড়িটা দেখে দাদির মুখে শোনা সেই বাড়িটার কথা মনে পড়ে যায় রোরি'র। কৌতূহলী হয়ে ওঠে ও। ওখানে গিয়ে একবার ঢুঁ মেরে আসা যাক না, কেমন বাড়ি ওটা।

BanglaBook.org

কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। এখান থেকে নদীগর্ভে ডুবে থাকা বাড়িটার দূরত্ব আধা মাইল তো হবেই। তবে ওখানে পৌঁছতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে বাড়িটার ছাদে বিশ্রাম নেয়া যাবে। তারপর ধীরে-সুস্থে ফিরতে পথ ধরলেই হল। যেই ভাবা সেই কাজ। দ্বিধা দ্বন্দ্ব সব শিকেয় তুলে নদীতে নেমে গেল ও।

দুপুরের পর এই সময়টাতে নদীর পানি যতটা শীতল থাকার কথা, এ মুহূর্তে তারচেয়ে বেশি শীতল মনে হলো রোরি'র কাছে। সকালে যখন রোরি নদীতে নেমেছিল, তখন স্রেফ গোসলটাই ছিল উদ্দেশ্য। আর এখন ও নেমেছে এ্যাডভেঞ্চারে। কাজেই এখনকার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। প্রথমে নিজের এগোবার পথটা ঠিক করে নিল রোরি। তারপর রওনা হয়ে গেল বাড়িটার দিকে। মনে হচ্ছে, খুব বেশিক্ষণ লাগবে না সেখানে পৌঁছতে।

রোরি যখন বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছল, তখন হাত-পা চলতে চাইছে না ওর। দম নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এখন পিছিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই ওর। বাড়িটার চেহারা এখন আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর কাছে। ছাদের নিচে কার্নিশের ফাঁক-ফোকরে জমে আছে রাজ্যের শ্যাওলা। এখানে ওখানে কালচে ছোপ। ঠিক যেখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে, সেখানে একটা ঘূর্ণি অনুভব করল রোরি। এখানকার পানি আরেকটু গাঢ়, কাদার পরিমাণটাও বেশি। ওপরের দিকে তাকিয়ে রোরি আঁচ করল, নদীর তলা থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রায় ফুট বিশেক উঁচু হবে বাড়িটা।

ঘোলা পানিতে সাঁতার কেটে বাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল রোরি। কাঠের খুঁটি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু পুরু হয়ে জমে থাকা শ্যাওলায় পিছলে গেল হাত-পা। শেষমেশ অনেক কষ্টে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বাড়িটার ছাদে উঠতে পারল রোরি। খুব সাবধানে ছাদের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে পিছল খাওয়া থেকে রক্ষ করল নিজেকে। তারপর এক জায়গায় বসে পড়ল বিশ্রাম নেয়ার জন্য। ইতিমধ্যে বুকের ভেতর হাতুড়ির মতো পেটাতে শুরু করেছে ওর হৃৎপিণ্ড।

রোরির সারা গা জুড়ে শ্যাওলা-পচা গন্ধ। ছাদে উঠতে গিয়ে কাঠের গায়ে লেগে থাকা জলজ আগাছা আর ছাতা মিলে সারা শরীরটা কেমন বিচ্ছিরি বানিয়ে দিয়েছে ওর। রোরি শ্বাস টানতে গিয়ে টের পেল, এখানকার বাতাসেও কেমন সোঁদা একটা গন্ধ। নদীর ঠাণ্ডা পানিতে ইতিমধ্যে কাঁপ ধরে গেছে ওর। ছাদের ওপর শুয়ে দু হাতে সূর্য আড়াল করে বিশ্রাম নিতে লাগল ও।

যখন চোখের ওপর থেকে রোরি হাত সরাল, সূর্য ততক্ষণে অনেকখানি হেলে পড়েছে পশ্চিমে। বাড়ি ফেরার তাড়া অনুভব করল রোরি। কিন্তু শ্যাওলা পড়া বাড়িটার ভেতর অনুসন্ধান চালানোর কৌতূহলটা কিছুতেই দমাতে পারল না। তার ওপর এই বাড়িটার ভেতর কি যেন বারবার ঠক ঠক করে আঘাত হানছে কাঠের গায়ে। ছাদের ওপর জাফরি কাটা জানালার মতো দুটো গর্ত। যেন একসময় জাফরি ছিল, এখন নেই। সেই গর্তগুলোর একটা দিয়ে ভেতরে নেমে এলো রোরি। চিলেকোঠার মতো একটা ঘর। ঘরে সবুজ সাদা কিসের একটা ক্যান। মটর দানা একটা নতুন ক্যান। লেবেল শুকিয়ে

BanglaBook.org

আছে, অথচ ক্যানটা চকচক করছে এখনো। কাঠের মেঝেটা পানিতে ভিজতে ভিজতে নরম হয়ে গেছে। এখানে সোঁদা গন্ধটা আরও তীব্র।

রোরি লক্ষ্য করল, এই বাড়িটা একদম স্থির নেই। আলগা বলে অল্প একটু নড়া-চড়া করছে। সেই ঠক ঠক শব্দটা আরও জোরালো হয়ে উঠেছে এখন। যেন কেউ এ বাড়ির কোথাও বসে শব্দটা করছে।

'কেউ কি আছেন নাকি ভেতরে?' কৌতূহল দমাতে না পেরে চিৎকার দিয়ে উঠল রোরি। কিন্তু কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বাইরে থেকে ফোকর গলে আসা সূর্যের আলোতে যেটুকু দেখা যায়, তাই সম্বল করে ভেতরে দেখতে লাগল রোরি, হঠাৎ কি যেন আঁকড়ে ধরল তার পা। ছাড়াতে যাবে, অমনি আরো টান বেড়ে গেল পায়ে। টের পেল এই জিনিসটাই শব্দ করছিল এতক্ষণ। জিনিসটা কি?

জীবনে আর কখনো বুঝি এতটা ভয় পায়নি রোরি। একটা লাশ। লাশটা এক মহিলার। বিকৃত বীভৎস মুখটায় ভর্তি কালো কালো দাগ। মাথাটা থেঁতলে দেয়া হয়েছে নৃশংসভাবে।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে চাইল রোরি, কিন্তু আতঙ্কে চিঁচিঁ স্বর ফুটল। কণ্ঠে। তাছাড়া চিৎকার দিয়ে লাভ নেই। এখান থেকে তীর অনেক দূরে। ওর চিৎকার শুনবে না কেউ। ইতিমধ্যে আলো আরো কমে এসেছে। একটু পরেই আঁধার নেমে আসবে। তখন সাঁতরে তীরে যাওয়া রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ওর জন্য। কিন্তু সাঁতার দেয়ার শারীরিক শক্তি বা মনোবল দুটোই হারিয়ে বসেছেন। গাছ গাছালির ছায়া ঘেরা দাদা দাদির বাড়ির দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল ওর। আঁধার নামলেই ওর জন্য চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠবেন তারা।

ছাদের গর্তটা দিয়ে আবার উপরে উঠে এলো রোরি। আবার সাঁতার দেয়ার কথা ভাবল ও। কিন্তু মনে জোর পেল না। দূরে, পাহাড়ের ওপারে ডুব দিচ্ছে সূর্য। তীর দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। হঠাৎ দূরে হাল্কা মতো কিছু একটা চোখে পড়ল রোরির। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল ও। ফাঁকা নদীতে বিদঘুটে প্রতিধ্বনি তুলল ওর কণ্ঠ। রোরি হাত নাড়ল ওই জিনিসটাকে লক্ষ্য করে। হ্যাঁ, আসছে জিনিসটা এদিকে। মনে হচ্ছে একটা নৌকা। হ্যাঁ, নৌকাই। একটা নয়, আরো পাঁচ-ছটা নৌকা আসছে ওর আহ্বানে সাড়া দিয়ে। কিন্তু নৌকা থেকে কোনো মানুষের কণ্ঠ শোনা গেল না। এমনকি ইঞ্জিন বা দাঁড় টানার ছপাৎ ছপাৎ শব্দও নেই। তাছাড়া নৌকাগুলোর কোনো ফ্ল্যাড লাইটও নেই।

নৌকাগুলো যখন ডুবে থাকা বাড়িটার একদম কাছে চলে এলো, তখন সূর্য ডুবে গেছে পাহাড়ের ওপারে। ছাতলা পড়া ভেজা এই বাড়িটার ভেতর যেমন শ্যাওলা পচা একটা সোঁদা গন্ধ, তেমনি একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসছে নৌকাগুলো থেকে। নৌকাগুলো বাড়িটার গায়ে একটার পর একটা এমনভাবে এসে ঠেকল, পাকা প্রশিক্ষণ দেয়া ঘোড়াগুলো যেভাবে মাথা নত মনিবের কাছে এসে দাঁড়ায়।

BanglaBook.org

বহিরাগত

লরেন্স উইলসন

বাস্টার বা লয়েড জোনস লিউলিন যুদ্ধকালীন সময়ে ফেলদামে একজন পশু চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। প্রায় দু'বছর অক্লান্ত শ্রম আর নিষ্ঠা এবং অবশ্যই ধৈর্য সহকারে সে তার পেশাগত কাজ করে যাচ্ছিল কিন্তু তারপর সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বাস্টার এমনিতে ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার তেমন বিশ্বাস করত না বা এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামানোর চিন্তাও সে করেনি। কিন্তু দিন দিন তার বাসায় পশু বিশেষ করে কুকুরের সংখ্যা যে হারে বাড়ছিল সেভাবে ঝামেলা তেও সে জড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু ভৌতিক ঘটনার সংখ্যাও সে হারে বাড়তে থাকায় সত্যিই সে শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

বাস্টারের নিজের আত্মজীবনীমূলক দুটি বই 'দ্য এনিমেলস কেম ইন ওয়ান বাই ওয়ান' আর 'কাম ইন টু মাই ওয়ার্ল্ড' থেকে জানা যায় ফেলদামের এক বিশাল বাড়িতে ছোট্ট লিউলিন তার বাবা মা আর বোনদের সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে বসবাস করত। কিন্তু যুদ্ধের আগে তার বাবার অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। ওয়েলস থেকে যে লোক কপর্দকহীন অবস্থায় এসেছিলেন, পরবর্তীতে কাপড়ের ব্যবসা করে তিনিই ফুলে-ফেঁপে বড়লোক হয়ে উঠলেন। বাস্টারের বাবা চেয়েছিলেন ছেলে তার মতোই হবে। কিন্তু লিউলিন ওরফে বাস্টারের ঝোঁক কেবল জীব-জানোয়ারের দিকে।

চার বছর বয়সেই বাস্টারের হৃদয় জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধে ভরে উঠেছিল। রাতে যখন সবাই গভীর ঘুমে তলিয়ে যেত তখন বাস্টারের চোখে-মুখে দেখা দিত রাজ্যের আশঙ্কা। তার মনে হতো বাদুরগুলোর কথা। জালে ঘেরা টেনিস কোর্টের ফাঁদে পড়ে ওগুলো কি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে আছে? আর রাস্তায় রাতের অন্ধকারে অবহেলার স্বীকার গরুগুলো, ওদের অবস্থা কি? শোবার ঘরের জানালায় বৃষ্টির ছাট আঘাত হানলেই বাস্টারের উদ্বিগ্নতা আরো বেড়ে যেত। খোদাই জানে অবোধ জন্তুগুলোর কি দশা হবে? মাঝে মাঝে সে এতোই দুশ্চিন্তায় পড়ে যেত যে রাতের পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে আসত। তারপর বাবা বড় ছাতা মাথায় করে সারা এলাকা চষে বেড়াত। নিরীহ জীবগুলোকে দেখা মাত্রই ওদের বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করত। প্রয়োজনে জন্তুগুলোকে ধরে মালিকের শূন্য ঘরগুলোতে আটকে রাখত। সূর্যের আলো ফোটার সাথে সাথে জন্তুগুলোকে আবার মুক্ত করে দিত।

BanglaBook.org

আশ্চর্য হলেও সত্য বাস্টারের কাছে জীবজন্তু মানুষের চেয়েও বড় কিছু ছিল। এ জন্য বাসার কাজের লোক ফ্লোরেন্স যখন ইঁদুরের মাংস রান্না করে খেতে দিল তখন ফ্লোরেন্সের প্রতি তার ঘৃণা আর বিদ্বেষ ফুটে উঠল। শুধু যে ইঁদুরের তা কিন্তু নয়, কোনো জীব-জন্তুর মাংসই ও খেতে চাইত না। এর জন্য ওর বাবা ওকে বকাবকি করতেন। ওর ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। একগুঁয়ে বাবার লিউলিন ছিল গোঁয়ার ছেলে। ও কখনো মাংস স্পর্শ করে দেখেনি।

সেই সময় ছোট শহরটি জুড়ে ছিল প্রচুর বন্য জীবজন্তু যেমন— খরগোশ, কাঁঠবিড়াল, বেজি, শৃগাল ইত্যাদির সমাবেশ। বাস্টার সমস্ত জীবজন্তু সম্পর্কেই জ্ঞান সংগ্রহ করার চেষ্টা করত। এমনকি যাজকের স্ত্রীর পোষা দুর্গন্ধময় ছাগলগুলো সম্পর্কেও খোঁজখবর নিত। গোয়ালারা ওকে কেমনভাবে গরুর দুধ দোয়াতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিল। তারপর একদিন তার আইরিশ কুকুরটি একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল। লিউলিন বাধ্য হলো তৎক্ষণাৎ কুকুরটাকে পশু চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে। সেখানে কুকুরটির একটি ছোটখাটো অপারেশন হলো। কিন্তু অপারেশনটি বাস্টারকে দেখতে দেয়া হল না। এরপরই পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলেটি তার পরিবারকে জানিয়ে দিল তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। 'সে যখন বড় হবে, তখন একজন পশু চিকিৎসক হবে।' শিশুর এরকম ভাবনাকে খুবই হালকাভাবে দেখা হয়। ওর বাবাও সেরকমভাবে নিয়েছিল। কিন্তু ওর বাবার ধারণাটা ভুল ছিল।

বছর দুয়েক পরে পলিওতে আক্রান্ত বাস্টার প্রায় মরতে বসল। ওর বিছানাটিকে বসার ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ওর মায়ের পক্ষে শুশ্রূষা করা সহজ ছিল। বাস্টার ঘরের বড় জানালাটা খুলে রাখতে বলেছিল, যাতে ও সবসময় ওর বন্য সঙ্গীদের সংস্পর্শে থাকতে পারে। বাবা মাও রাজি হয়েছিল।

সারাটা ঘর জীবজন্তুতে ভরা ছিল। ওর কুকুর বিছানায় ঘুমাত। ইঁদুরগুলো ছুটোছুটি করতে গিয়ে ওকে গুঁতো মারত। কার্পেটের ওপর দিয়ে কচ্ছপগুলো ট্যাঙ্কের মতো চলাফেরা করত। এছাড়া অন্যান্য জীবজন্তুতে ঘরটি ছিল জমজমাট। এই বন্য প্রাণীর ঘেরাটোপে ওর মা ছেলের সেবাযত্ন করা চালিয়ে গেলেন। বাস্টার ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠল।

এরপর স্কুলে যাবার সময় ওর এগিয়ে এলো। সেখানে সে সাঁতার এবং টেনিস খেলা ছাড়া অন্য কোনো খেলা খেলতো না। সেই কিশোর বয়সেই বাবার আদেশেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিবারের পোশাক ব্যবসায় ঢুকতে হয়েছিল। সেখানে সে কিছুক্ষণ কাজ করত। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর হলেও সে ভালোমতোই জানত যে তার প্রকৃত জীবন এখনও আরম্ভ হয়নি। আজ কিংবা কাল ওকে ওর স্বাধীনতার দাবির জন্য বাবা-মায়ের মুখোমুখি হতেই হবে। ঠিক এমন সময় একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়ল। একটি সুপরিচিতি 'এ্যানিমেল সোসাইটি' তাদের 'এ্যানিমেল হাজব্যান্ড্রি'র জন্য কিছু ছাত্র চেয়েছে। বাস্টার তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করেছিল। যথারীতি দরখাস্ত গৃহীত হলো এবং এক মাসের মধ্যে ট্রেনিং-এ যোগ দিতে বলা হলো। এক সময় সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তটি এসে উপস্থিত হয়। বাবা খবরটি

BanglaBook.org

শুনলেন। তিনি ছেলের ইচ্ছেটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। জানিয়ে দিলেন ছেলের এই কাজে কোনো মতেই অনুমতি দেবেন না। কিন্তু বাস্টার তারপরও যখন ট্রেনিং-এ যাবার জন্য জেদ দেখাল তখন তার বাবা তাকে তার ইচ্ছের কথা জানিয়ে দিলেন। 'তুমি যদি পারিবারিক এই কাজ ছেড়ে বাড়ি থেকে চলে যাও তাহলে আর কোনোদিন এই বাড়িতে ফিরে এসো না।' ট্রেনিং-এ যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এক সপ্তাহ বাবা-ছেলের সঙ্গে কোনো কথা হলো না।

সুতরাং বাস্টার তার নিজের মালপত্র গুছিয়ে নিল। যথারীতি ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্যে রওনা দিল। উডফোর্ডে ট্রেনিং নিল এবং লন্ডন জুড়ে বিভিন্ন পশু ডিসপেনসারিতে সে পাঁচ বছর কাজ করল। মাঝে-মধ্যে বাবা যখন বাড়িতে থাকত না ও বাড়ি ফিরত মা আর বোনদের সাথে দেখা করতে। সামাজিকভাবে ও একটা হাসি-খুশি জীবন কাটাত। কিন্তু অন্তরের গভীর সত্ত্বাটি সবসময় জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

এতদিন পর্যন্ত ওর নিজের কোনো প্রাকটিস ছিল না। কিন্তু যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল এবং রয়াল ভেটারনারি কর্পসে জায়গা হলো না, তখন ও ফেলদামে নিজেই একটা ডাক্তারখানা খুলে বসল। প্রথম দিনেই না জানিয়ে ওর বাবা সেখানে উপস্থিত হলেন। তাকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো সহজেই দু'জনের মাঝে মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু গোঁয়ার ও জাদরেল লোকটি ছেলের অনিবার্য সফলতা দেখার পরও কিছুতেই নমনীয় হলেন না। একেবারে নিঃসঙ্গভাবে অবসর জীবন যাপন করতে লাগলেন। দু'জনে যদিও একই বাড়িতে থাকত বছরের পর বছর, কিন্তু কেউই কারোর সাথে কথা বলত না। অবশেষে বুড়ো একদিন মারা গেল, ছেলেকে ক্ষমা না করেই। কিন্তু বাস্টারের এসব ভাববার সময় ছিল না। বৃটেনের পোষা জন্তুদের সমস্ত ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে ১৯৪০ সালটিই সম্ভবত তাদের জন্য দুঃসময়। খাদ্য সংকট, বোম্বিং এবং পরিবারগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণেই আচমকা ওরা (জীবজন্তু) অবাঞ্ছিত হয়ে গেল। জীবজন্তুগুলোকে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল এবং বাস্টারের কাছে রেখে দেবার জন্য আনা হলো। কিন্তু কি করবে সেই মুহূর্তে? যতক্ষণ না বাগানটি আর বাড়ির বাইরের চত্বরটি ভিড় উপচে পড়ে ততক্ষণ সে জীবজন্তুগুলোকে গ্রহণ করল। পরে সে এবং তার মাকে অন্য একটা জায়গা খুঁজে নিতে হলো।

তারা ক্লাম্পিং ডেনি নামে ফেলদামের কাছে একটি বাড়িতে উঠে এল। এই বাড়ির সাথে দশ একর জমির একটি বাগান ছিল। বাস্টার সেখানে আরও বেশি অবাঞ্ছিত জীবজন্তুর থাকার ব্যবস্থা করল। ১৬০টির মতো কুকুর ছিল তার সঙ্গে। ছিল ইঁদুর থেকে শুরু করে বাঁদর পর্যন্ত অসংখ্য জীবজন্তু। জীবজন্তুদের খাওয়ানো একটা সমস্যা ছিল। কিন্তু কেউ অনাহারে ছিল না। সে ক্ষেত্রে মাংসের পরিমাণটা ছিল অনিবার্যভাবেই কম। ছাগলগুলো একটি বেসরকারি ডেয়ারিতে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। একটি ভালো তরিতরকারির বাগান ছিল। হাঁস-মুরগির ছানাগুলো সেখানে ঘোরে। একটা বড় খালে মাছ ছিল। সাধারণ মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে পার্সেলে মোড়া তরিতরকারির বীজ নিয়ে

BanglaBook.org

আসত। সেই সঙ্গে বাস্টার অন্যান্য পশু চিকিৎসকের মতোই শল্য চিকিৎসা চালাতো। বোমের আঘাতে বিধ্বস্ত বাড়িগুলো থেকে আহত জীবজন্তুদের উদ্ধারের কাজ সারারাত ধরে চলত। এটি ছিল তীব্র ব্যস্ততার এবং সমস্যা সংকুল সন্তোষজনক জীবন। লিউলিন এসব কিছুকে মেনে নিয়েছিল অন্তত ওসব ভৌতিক ব্যাপার না আসা পর্যন্ত।

ক্লাম্পিং ডেনিতে আসার পর একদিন ও বাগানটা পেরোবে এমন সময় মাথার উপর দিয়ে একটা পাথর উড়ে গেল। পাথরটি একটু দূরে ঘাসের ওপর পড়ল। এরপর বেশ কয়েকটা পাথর পড়ল। বাস্টার ওখানে একাই ছিল। ও ভাবল কোনো দুষ্টু ছেলে হয়তো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পাথর ছুড়ছে। ব্যাপারটা নিয়ে ও আর ভাবল না। কিন্তু একই ঘটনা প্রতিদিন ঘটতে থাকল। তখন ঝোঁপ-ঝাড়গুলো সম্ভব হলে এড়িয়ে চলত। বাস্টার প্রকৃতই হতভম্ব হয়ে পড়ল। এবং আরো অবাক হলো এ জন্য যে কোনো পাথরই ওকে আঘাত করে না। রসিক আগন্তুকটি সে যেই হোক পাথর ছোঁড়ার ক্ষেত্রে খুবই অপটু। লিউলিন ওর কর্মচারীদের ভালোভাবেই চিনত। এ ঘটনার জন্য তার কর্মচারীদের সন্দেহ করা অসম্ভব। তাহলে কে পাথর ছোঁড়ে? অনেক সময় ও যখন বাড়ি ফিরত তখন পাথরগুলা ওকে ধাওয়া করত। নিচের তলার জানালার কাঁচের ওপর প্রায়ই আছড়ে পড়ে চুরমার করে দিত। এসব কিছু আবার যোগাড় করা যুদ্ধকালীন সময়ে তার জন্য দুষ্কর ব্যাপার ছিল।

এক বছর ধরে চলল এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি এর সাথে আরো কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল।

বাড়িটি ছিল খুবই বড়। সুবিধার জন্য বাস্টার এবং তার কর্মচারীরা আগেকার চাকরের ঘরগুলোতে থাকত। ঘরগুলোতে নোংরা আর প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে যেতে হত। অনেক আগে থেকেই সেখানে সে অশরীরী আত্মার বিচরণ অনুভব করতে পেরেছিল। একদিন বাস্টার যখন সিঁড়িগুলো ধরে নামছে, ও অনুভব করল একজোড়া হাত ওর কাঁধ চেপে ধরল। চোট দেবার মতো নয়, কিন্তু সেটি ছিল নিশ্চিত হুমকি দেয়ার মতো চাপ। বাস্টার আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তবে বাস্টার বন্ধুদের সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে আসার আমন্ত্রণ জানাত। বন্ধুদের হতচকিত হবার দৃশ্য দেখে সে দারুণ মজা পেত। সবাইকেই সেই অদৃশ্য স্পর্শ করত। রাতে নিজের ঘরে যেতে হলে সে সিঁড়িটি পারতপক্ষে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত।

অবশ্য এই অবস্থায় পড়লে যে কোনো মানুষই আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। কিন্তু পাথর ছোড়া বা অদৃশ্য হাতের স্পর্শ কোনোটিই বাস্টারকে তার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এরই মধ্যে সৈন্য দলের পাঁচ অফিসার ঐ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। ওদের মাঝে একজন পাদ্রি আছে শুনে খুব খুশি হলো সে। এদিকে অলৌকিক ঘটনা ঘটেই চলল। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে শোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর ঘুম ভেঙে যেত। বাদ্য যন্ত্রের শব্দ কানে ভেসে আসত, ওর মাও নিজের ঘর থেকে তা শুনতে পেত। যে সব কুকুর ওর ঘরে ঘুমাত, তারাও উঠে পড়ত এবং এমনভাবে ডাকাডাকি শুর করত যেন কোনো আগন্তুকের উপস্থিতি তারা টের পেয়েছে।

BanglaBook.org

সৈন্য অফিসারগুলো ওর এসব কথা উপহাস বলে উড়িয়ে দিত। পাদ্রি এ ব্যাপারে ছিল সবচেয়ে বেশি মুখরা। অবশেষে তারা ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে চাইল বাস্টারের ঘরে এক রাত কাটিয়ে। কিন্তু প্রতিদিন সকালেই প্রাতঃরাশের টেবিলে অফিসারদের মুখগুলো বিবর্ণ এবং চিন্তামগ্ন দেখাল। এমনকি মাঝরাতে এই পাদ্রিটি পেছনের ঘরগুলো পাল্টাতে চাইল।

পাদ্রির উপস্থিতি এমন ভৌতিক ঘটনার ওপর কোনো প্রভাব ফেলল না, বরং আগের ঘটনার সাথে যুক্ত হলো অন্যান্য সব অদৃশ্য শব্দ। দেয়াল থেকে ছবি পড়ে যাওয়া, টেবিল থেকে গয়নাপত্র ফেলে দেয়া এবং একদিন তো একটা মেয়েলি হাসিও কানে এল বাস্টারের। কিন্তু কোথাও কোনো মেয়ের ছায়াটি পর্যন্ত দেখা গেল না। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে সে বাগানে এল এবং গোড়ালি মচকে গেল। এবার ওর মা ভীষণভাবে মুষড়ে পড়লেন এবং এসবের একটা কিছু বিহিত করতে চাইল।

একজন প্রোটেস্ট্যান্ট হিসেবে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হবে না ভেবে বাস্টার একজন ক্যাথলিক যাজকের সঙ্গে পরামর্শ করল। সেই লোকটি ভূত ছাড়ানোর একটা যজ্ঞও করল। মন্ত্র উচ্চারণ করে, পবিত্র জল ছিটিয়ে ক্রস চিহ্ন আঁকল। কিছুদিন এসব কাজ করল। কিন্তু তারপরই সেই অদৃশ্য শক্তি এসব বাধা সরিয়ে দিয়ে আবার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ শুরু করল। পাথর ছোঁড়া, বাদ্য আর দেয়াল থেকে ছবি পড়া এসব আবার শুরু হলো।

এসব উপদ্রবের মধ্যে বাস্টার সবচেয়ে বিব্রতবোধ করতে লাগল ঘন ঘন জানালার কাঁচ ভাঙ্গার ব্যাপারটাতে। বাধ্য হয়েই বাস্টার এবার পুলিশ ডাকল। তাদের সবুজ উদ্ভিদে ঢাকা ছোট হেলমেট মাথায়। তারা বাগানে লুকিয়ে রইল। এরপর বাস্টারকে একবার লেনটা হেঁটে পেরোতে বলা হলো। খুব কাছ থেকেই পুলিশগুলো বাস্টারকে লক্ষ্য করে পাথর উড়ে আসতে দেখল। লক্ষ্য করল যে, পাথরগুলো একদিক থেকে আসছে না। বিভিন্ন দিক থেকে একই সঙ্গে ছুটে আসছে। পুলিশ তো ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। এ অভিজ্ঞতা তাদের নতুন, পরের দিন আবার একই ঘটনা ঘটল। পুলিশ যথারীতি চারপাশে লুকিয়ে রইল। বাস্টারকে বাগানের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন পথে হেঁটে এগুতে বলা হলো। একই ধরনের ভৌতিক ঘটনা পুলিশগুলো অবলোকন করল। সবকিছু পর্যবেক্ষণ শেষে তারা বাস্টারকে বলল, 'স্যার, এখানে কিছু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।'

কিন্তু এ ব্যাপারে তারা কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে না বলে জানাল। উল্টো বাস্টারকে তারা সিআইডি'র কাছে যেতে উপদেশ দিল। বাধ্য হয়ে বাস্টার তাই করল। কিন্তু ফলাফল একই হলো। তারাও নিজেদের অপারগতার কথা জানিয়ে মেরিল বন স্পিরিচুয়ালিস্ট এসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপদেশ দিল। এরপর কয়েক দিনের মধ্যে দু'জন মহিলা বাস্টারের ওখানে এসে পৌঁছাল। ওদের মধ্যে একজন বহুল পরিচিত এস্টেল রবার্টস। বাস্টারের চোখে ওদের বিস্ময়করভাবে সাধারণ এবং খুঁতখুঁতে

BanglaBook.org

মনে হলো। বাস্টার ওদেরকে সবকিছু খুলে বলল। পুরনো ভৌতিক ঘটনা ছাড়াও দরজার ঘণ্টা বারবার বাজানোর ভৌতিক ঘটনাটিও ওদের বলল, একজন পুরোদস্তুর ব্যস্ত মানুষের সাথে ঘণ্টা বাজানোর মতো নির্মম রসিকতা আর কিছুই হতে পারে না। এ জন্যই এখন সে সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। মহিলা দু'জন বলল, খুব তাড়াতাড়ি যে ঘরে বাদ্যযন্ত্র বাজে সেই ঘরে তারা প্রেতাত্মার বিষয়ে একটা বৈঠক করতে চায়। বাস্টারকেও তাদের সঙ্গে বসতে হলো।

নির্জন অন্ধকার ঘরে দু'জন মহিলা, প্রার্থনায় মগ্ন হলেন। এস্টেল রবার্টস, বাস্টারের বাবার প্রিয় ভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত ছত্রবাণী আবৃত্তি করল। প্রেতাত্মার মাধ্যমটি কিছুক্ষণ পর মিলিয়ে গেল। তার মাধ্যমে জানা গেল বাস্টারের বাবা মূলত এসব ভৌতিক কাজের জন্য দায়ী। মাধ্যম আরো জানাল তার বাবার মন খুব খারাপ। কেননা তিনি তার জীবদ্দশায় বাস্টারকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। এজন্য তিনি ছেলের কাছে ক্ষমা চান।

প্রথমে বাস্টার ওর বাবার উপস্থিতির ব্যাপারটা মোটেও বিশ্বাস করল না। কিন্তু দ্রুতই বিহ্বাল করে দেবার মতো প্রমাণ হাজির করা হলো। মাধ্যম মহিলাটি তার বাবার জন্মের এবং মৃত্যুর তারিখ বলে দিল। মহিলাটি ওর বাবার শারীরিক বর্ণনাও দিল। তাঁর চিবুকে জরুলের দাগের কথাও উল্লেখ করল। একটি পরিবারিক বাইবেলের বর্ণনা দেয়া হলো বাইবেলটির নির্দিষ্ট কিছু পাতার মাঝে পরিবারের সদস্যদের জন্মের রেকর্ড এবং তার দাদুর ছবিটিও রাখা ছিল। পাতার সংখ্যাটি বলে দেয়া হলো। বাস্টারকে আরো বলে দেয়া হলো– বাইবেলটি যে ড্রয়ারে আছে তার চাবিটি কোথায় পাওয়া যাবে?

সবশেষে বিস্ময়কর এক অভিজ্ঞতা লাভ করল বাস্টার। 'মিডিয়াম'-এর মাধ্যমে ওর বাবা সরাসরি কথা বললেন নিজের কণ্ঠস্বরে। বাস্টার বাবার গলাটা ভালোমতোই চিনতে পারল। তিনি জানালেন যে, অতীতের ক্রিয়াকলাপের জন্য তার আত্মা অতৃপ্ত। এবং তিনি ক্ষমা চাইলেন। তিনি আরো জানালেন যে, বাসার উঠোনটিকে যখন কুকুর ছাগলের বাসস্থানে পরিণত করেছিল তখন তিনি আসলেও বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার প্রেতাত্মার উত্থান ঘটেছিল। এবং তিনি বেশকিছু ভৌতিক ঘটনার মধ্যদিয়ে বাস্টারকে ঘাবড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এসবকিছুর এখন অবসান ঘটবে।

বাকি বছরগুলোতে ক্লাম্পিং ডেনি ছিল শান্ত। অশরীরীরা কাউকেই বিরক্ত করেনি। এস্টেল রবার্টও তাকে আশ্বাস দিয়েছিল এবং তার প্রমাণ স্বরূপ বাস্টার দুটি চিহ্ন খুঁজে পাবে। একটি হলো পানিতে ফোঁটা জল পদ্ম আর অপরটি হলো একটি ক্রস চিহ্ন।

এতসব ঘটনা সত্ত্বেও বাস্টার ওই চিহ্ন দুটিকে তেমন বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু যখন ক্রস এল ও সত্যি সত্যি জলে একটি পদ্ম ফুটে উঠতে দেখল। এ জিনিস সে এর আগে কোনোদিন দেখেনি। কয়েক সপ্তাহ পর যে দ্বিতীয় চিহ্নটি দেখল। একদিন রাতে সে দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠতে শুনল। আড়ষ্ট অনুভূতিতে সে অশরীরী আত্মা ভেবেই সে দরজ খুলল। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

BanglaBook.org

চারদিকে বিকট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির বারান্দায় একটা আলো ঝলকাচ্ছিল। তুষারাচ্ছন্ন জমিতে পড়ে থাকা একটা পিতলের ক্রস থেকে সেই আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল। যেই বাস্টার ক্রসটা স্পর্শ করল অমনি আলোটা ফিকে হয়ে গেল।

বাস্টার প্রেতাত্মা সম্পর্কিত ঘটনাগুলোকে এতোদিন ধরে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিলেও এরপর থেকে তার সমস্ত বিশ্বাস ফিরে এলো। পিতলের ক্রস দেখে ওর বিশ্বাস জন্মাল যে বাবার আত্মা হয়তো শান্তিতে আছেন।

কিন্তু এটাই গল্পের শেষ নয়। কিছুদিন পরে বাস্টার তার সান্ধ্যাকালীন অতিথিদের আমন্ত্রণে টেবিলে সাজানো বিভিন্ন অক্ষরের ওপর উপুড় করে রাখা গ্লাসগুলো ছুঁয়ে এক ধরনের বিচিত্র প্রশ্ন-উত্তর খেলায় অংশ নিয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে যা ঘটল তা সত্যি বিস্ময়কর। কোত্থেকে একজন লোক উদয় হলো। সে একটা ফরাসি নাম বলল এবং জানাল যে ১৯৪২ সালে উত্তর রাশিয়ার একটি কনভয়ের ওপর সে খুন হয়েছিল, যুদ্ধ বিষয়ক অনেক খুঁটিনাটি খবরও নেয়া হল। উপস্থিত সকলে অন্যান্য রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে জানাল সে সবই ঠিক আছে।

কয়েক বছর পর বাস্টার আবার এই খেলায় বসল। গ্লাসটা উল্টে দিল। এবার একজন লাস্যময়ী সুন্দরী মহিলা 'হিলারির'র সঙ্গে কথা হলো। সে জানাল যে ১৯৫৪ সালে নর্থ ফোকে যখন সাঁতার কাটছিল তখন সে ডুবে গিয়েছিল। মহিলাটি আরো জানাল যে বাস্টারের আগামী দিনগুলো ভালোই যাবে। আশ্বাস বাণীটি শুনতে ভালো লাগলেও, কারো তেমন বিশ্বাস হয়নি।

কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর আঘাত বাস্টারের জন্য অপেক্ষা করছিল। শৈশবের পোলিও রোগের জটিলতা স্বরূপ বাস্টারকে সারাজীবন রোগে ভুগতে হয়েছে। এবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো। ভালো হয়ে ফিরে এসে সে জীব-জন্তুদের নিয়ে আবার কাজে মেতে উঠল। শেষে ১৯৫৮ সালে বাস্টার তার ডান পা পঙ্গুত্বের কারণে হারালো। এরপর ক্রমশ তার হাত দুটিও অবশ হয়ে গেল। ফুসফুসও রেহাই পেল না। বাস্টার সেই অবস্থাতেই লড়াই করে চলল। কিন্তু বাস্টার একটি হুইল চেয়ারে বসে জীবজন্তুদের চিকিৎসা চালিয়ে গেল। ১৯৬৫ সালের দিকে সে পশু চিকিৎসাই ছেড়ে দিল।

ঠিক পাঁচ বছর পর সে তৃতীয়বারের মতো এক বিকেলের আসরে গ্লাস উল্টিয়ে সেই রহস্যজনক খেলাটি খেলতে বসল। এবার যে রহস্যজনক ব্যক্তিটি এল তিনি আর কেউ নন বাস্টারের বাবা। তার বাবার প্রেতাত্মা ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে বাস্টার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেও ডাক্তারদের মতামতের একদিন পূর্বেই হাসপাতাল থেকে ফিরে আসবে। বাড়িতে সেবায় সে সুস্থ থাকবে। বাবার প্রেতাত্মা আরো জানাল যে এভাবে তার মৃত পিতার সাথে যোগাযোগ রাখলে সে উপকৃত হবে।

বাস্টার বাবার কথামতো ভালোমতোই বাসায় ফিরল। কিন্তু তার বাবার আত্মার সাথে যোগাযোগ রাখল না বরং বই পড়েই সময় কাটাতে লাগল। বাস্টার আসলে ছোট

BanglaBook.org

বেলা থেকে তার বাবা-মার এতো কড়া শাসনের মাঝে ছিল যে সে বড় হয়ে বাস্তবিকই তাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল। সে মুক্তচিত্তে ঘুরে বেড়াত, গল্প করত বন্ধুদের সাথে। পরবর্তীতে গল্প লিখতেও শুরু করল। সম্পূর্ণ স্বাধীন এক জীবন সে শুরু করল। প্রাণী জগৎ নিয়ে তার বিচিত্র চিন্তা-ভাবনা সে তখন মানুষকে শোনাত। রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এ যেন বাস্টারের কাছে ছিল এক নতুন জীবনের আস্বাদ।

এভাবেই বাস্টার তার জীবনের দুঃখের আর কষ্টের সময়টিকে আনন্দে ভরিয়ে রাখার অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। রহস্যময় প্রেতাত্মা হিলারি এক সময় বলেছিল বাস্টারের ভালোমতোই কাটবে। বাস্টার শারীরিক অসুস্থতার মাঝেও নিজেকে উৎফুল্ল রেখে যেন সে বাণীরই প্রতিফলন ঘটাল।

দ্য ইন্ট্রুডার **অনুবাদ : আবদুল্লাহ শাহরিয়ার টুটুল**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বিনি পয়সার মাটি

চার্লস বিউমন্ট

পৃথিবীর আর কোনো মুরগি বোধহয় কখনো এভাবে চেটেপুটে খাওয়া হয়নি। প্লেটের এক কোণে গাদা হয়ে থাকা হাড়গুলোকে লাগছে ঠিক মোমের মতো সাদা, শুকনো আর উদোম দেখাচ্ছে রেস্তোরাঁর নরম আলোতে। প্লেটের এই হাড়ই আছে শুধু, মাংসগুলো সুন্দরভাবে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। হাড় না থাকলে পুরো প্লেটটাই অন্যরকম একটা ফাঁকা দ্যুতি নিয়ে ঝকমক করত।

ছোট ছোট অন্যান্য ডিশ পেয়ালাও ফাঁকা। চেটেপুটে সাফ করা হয়েছে প্লেটটার মতোই। কোনোটার ঝিলিক কোনোটার চেয়ে কম নয়। ফ্যাকাসে ক্রিম রঙের এই প্লেট-পেয়ালা-ডিশ সব স্থির হয়ে আছে বরফ সাদা টেবিল-ক্লথটার ওপর। একবিন্দু দাগও নেই টেবিল ক্লথটাতে। না মাংসের ঝোল, না কফি, না রুটির টুকরা, না সিগারেটের ছাই, না নখের কোনো আঁচড়– কিচ্ছু নেই। শুধু মুরগির ওই উচ্ছিষ্ট হাড় আর একটা ডেজার্ট কাপের তলায় শক্ত হয়ে থাকা লাল ফুটকিগুলো প্রমাণ করছে, সবই ছ'কোর্সের একটি চমৎকার ডিনারের অবশিষ্টাংশ এবং এ ডিনারের পুরোটাই এখন মি. আওর্টার পেটে।

মি. আওর্টাকে ছোট-খাটো মানুষ বলা যাবে না। ছোট একটা ঢেকুর তুলল সে। চেয়ার থেকে তুলে নেয়া পত্রিকাটা ভাঁজ করে রাখল আবার। এবার ডেস্কটা একটু দেখল– কোনো খাবার টাবার লেগে আছে কিনা। তারপর দ্রুত এগুলো ক্যাশিয়ারের দিকে।

এক বৃদ্ধা বসে আছে ক্যাশিয়ারের চেয়ারে। মি আওর্টার বিলের দিকে একবার তাকালো সে। তারপর ওটা বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এই যে, স্যার।'

'আচ্ছা ঠিক আছে', হপ পকেট থেকে বড়সড় কালো ওয়ালেটটা বের করল মি আওর্টা, সামনের দুই দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিস তুলল– 'দ্য সেভেন জয়েস অভ মেরি।'

শিসটা হঠাৎ করেই থেমে গেল। উদ্বিগ্ন দেখাল মি. আওর্টাকে। ওয়ালেটে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগল সে। তারপর বের করতে লাগল ভেতরের সব জিনিস। শেষে একদম খালি হয়ে গেল ওয়ালেটটা।

আশাহত হয়ে ভুরু কোঁচকালো সে।

BanglaBook.org

'কোনো সমস্যা হয়েছে, স্যার?' জানতে চাইল বৃদ্ধা।

'অ্যাঁ, না ঠিক সমস্যা নয়।' বলল হোঁৎকা লোকটা।

যদিও ওয়ালেটটা পরিষ্কার ফাঁকা দেখা যাচ্ছে, এরপরও ওটার দু'প্রান্ত মেলে ধরে ঝাঁকাতে লাগল উপুড় করে। যেন জলাতঙ্কে আক্রান্ত একটা বাদুড় হঠাৎ আটকে গেছে শূন্যে।

দুর্বল একটা হাসি ফুটল মি. আওর্টার মুখে। বিপর্যস্ত হাসি। একে একে নিজের চৌদ্দ পকেটের সমস্ত জিনিস বের করল সে। বিভিন্ন জিনিসের উঁচু একটা স্তূপ জমে গেল টেবিলের ওপর।

'দেখ!' অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠল মি. আওর্টা। 'কি কাণ্ড ম্যান! কি বিরক্তিকর ব্যাপার। জানেন, কি হয়েছে? আমার স্ত্রী এখান থেকে টাকা-পয়সা সব নিয়ে চলে গেছে, এমনকি ভাংতি কোনো পয়সাও রেখে যায়নি! কি যে করি এখন? উঁমম, আচ্ছা, এক কাজ করা যাক– আমার নাম জেমস ব্রকেলহার্স্ট, প্লাইড ফিল্ম কর্পোরেশনের সাথে আছি। আমি সাধারণত এভাবে বাইরে-টাইরে খাই না তেমন, আর– এখানে, না, সত্যি বলছি, চাপে পড়ে খেতে হয়েছে। ব্যাপারটা এখন আপনার জন্যও যেমন বিব্রতকর, তেমনি আমার জন্যও। আমার কার্ডটাই হচ্ছে এ মহূর্তে মূল ভরসা। আপনি যদি বিশ্বাস করে এটা রেখে দেন, তাহলে কাল সন্ধ্যায় ঠিক এই সময়ে এসে আপনার টাকাটা দিয়ে যাব।'

মি. আওর্টা তার নাম-ধাম লেখা পেইস্ট-বোর্ডটা খুঁজে দিল ক্যাশিয়ারের হাতে। মাথা নাড়ল বিশেষ ভঙ্গিতে। তারপর যে জিনিসগুলো বের করেছিল, সব আবার পকেটে ঢুকিয়ে একটা দাঁত খোঁচানি তুলে নিল একটা বাক্স থেকে। শেষে চলে এলো রেস্তোরাঁ থেকে।

নিজের প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট সে। কিছু না দিয়ে কিছু পাওয়ায় বরাবরের মতো সেই একই রকম প্রতিক্রিয়া হল তার। কোনো গোলমাল ছাড়ই চুকে গেল ব্যাপারটা, দারুন একটা ভোজ ছিল এটা!

স্ট্রিট কার স্টপের দিকে আয়েশি ভঙ্গিতে এগোলো সে। রাস্তার পাশে ডিপার্টমেন্ট স্টোরের জানালাগুলোতে ডিসপ্লে'র জন্য রাখা যে পোশাকবিহীন নারী মূর্তিগুলো রয়েছে, সেগুলোর দিকে বার কয়েক তাকাল কামুক দৃষ্টিতে।

গাড়ির জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা বরাবরের মতো কাজ দিল। দেখে-শুনে পছন্দমতো একটা গাড়িতে উঠে পড়ল মি আওর্টা। ভিড়ের মধ্যে হতবুদ্ধি গোবেচারা একটা ভাব ফুটিয়ে তোলে সে। যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। তারপর কন্ডাক্টরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে, তাকে না দেখার ভান করে সবক'টি পকেট হাতড়ে দেখে খুব আগ্রহের সাথে, শেষে পত্রিকাটা নিয়ে বসে পড়ে দুরের একটা সিটে। মি আওর্টা হিসেব করে দেখেছে, এরকম ফটকাবাজি করে এ পর্যন্ত ২১১.২০ ডলার বাঁচিয়েছে সে। কারণ তার এই ভাব-ভঙ্গি দেখে অনেক কন্ডাক্টরই কাছে ঘেঁষে না। ভাবে, হয় টাকা নেই, নয়তো টিকিট খুইয়েছে।

BanglaBook.org

বিদ্যুতের পুরনো তালিকাটা মি আওর্টার ফুরফুরে মেজাজে বাগড়া দিতে পারল না। এর চেয়ে বরং পত্রিকার ক্রীড়া-কৌতুকের পাতায় মন দিল সে। চলে এলো কারেন্ট পাজল-এ। হাজার হাজার ডলারের পুরস্কার রয়েছে এতে। ধাঁধার সমাধান বের করো, আর পুরস্কার জিতে নাও। নিমেষে হাজার হাজার ডলার পাওয়া যাচ্ছে, অথচ দিতে হচ্ছে না কিছুই। এই তো চায় সে। কোনো কিছু না দিয়ে অনেক কিছু পাওয়া।

কিন্তু পত্রিকায় বেশিক্ষণ মন বসাতে পারল না মি. আওর্টা। অত ধৈর্য নেই।

সিটের ঠিক পাশেই দাঁড়ানো এক বৃদ্ধার দিকে তাকাল মি. আওর্টা। রাজ্যের ক্লান্তি মহিলার দু'চোখে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। এবার তার জালে ছাওয়া জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে।

হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়তেই বুকটা ধক করে উঠল তার। প্রবল উত্তেজনা অনুভব করল সে। শহরের এই অংশটা দিয়ে রোজই আসা-যাওয়া হয়, অথচ আশ্চর্য, এর আগে কখনো চোখে পড়েনি ওটা! অবশ্য এদিকের দৃশ্যগুলো খুব একটা আগ্রহের সাথে দেখা হয় না কখনো। কারণও আছে। এই এলাকাটাকে অবজ্ঞা করে বললে 'মৃত্যুপুরী' বলা যায়। কবরখানা, কফিনের দোকান, শব পোড়ানোর জায়গা– মোটামুটি সবই আছে এখানে পুরো পাঁচটি ব্লক জুড়ে।

কৌতূহল দমাতে না পেরে ওখানেই নেমে গেল মি. আওর্টা। খানিকপর সে হাজির হলো কাঙ্খিত জিনিসটার কাছে।

একটা বিজ্ঞাপন। অগোছালোভাবে লেখা। তবে পড়া যায় স্পষ্ট। অবশ্য সাইনবোর্ডটা নতুন নয়। সাদা রঙের লেখাগুলো মুছে গেছে চিড় ধরে। মরচে ধরা পেরেক থেকে লালচে একটা রঙ এসে ছড়িয়ে গেছে সাইনবোর্ডটার মাঝে।

বিজ্ঞাপনে লেখা!

বিনে পয়সার মাটি

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন

লিলিভেল কবরখানা

বিজ্ঞাপনটি সাঁটানো হয়েছে সবুজ ছ্যাতলা পড়া একটি কাঠের বেড়ার ওপর।

মি. আওর্টা এক ধরনের পুলক অনুভব করল। এই সুখান ভুতিটা তার নতুন নয়। মাগনা মাগনা কোনো কিছু পাওয়ার সুযোগ ঘটলেই এমন খুশি খুশি লাগে তার। আসলে 'ফ্রি' শব্দটার মধ্যে এমন এক আশ্চর্য জাদু আছে, মি. আওর্টার হজমের জন্য দারুণ কাজ করে জিনিসটা।

ফ্রি। কি অর্থ ছোট্ট শব্দের? কোনো কিছু না দিয়েই কিছু পাওয়া এবং মি. আওর্টা তলিয়ে দেখেছে যে, তার এই নশ্বর জীবনে এই ফ্রি বা মাগনা কোনো কিছু পাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার।

তবে বিনে পয়সার মাটি নিয়ে একটু চিন্তায় পড়ে গেল মি. আওর্টা। মাটি দিয়ে কি করবে সে? আবার এ চিন্তাও তার মাথায় ঘুরপাক খেল যে, বিনে পয়সায় এই মাটি দিতে চাইছে কেন? এই কবরখানার এদিকে বিনে পয়সার মাটিইবা আসবে কোত্থেকে? তবে এক্ষেত্রে মাটির উর্বরা শক্তিটাই মূল বিবেচ্য।

BanglaBook.org

চতুর মি. আওর্টা খুব সহজে প্রলুব্ধ হলো না এই বিনে পয়সার মাটির প্রতি। সে ভাবল, এটা কি মাটি বিলি করার নিছক একটা সরল সাধারণ আহ্বান, নাকি মাটির ওসিলায় অন্য কোনো খাতে টাকা খসানোর গভীর কৌশল? আর এই মাটি কতটুকু নিয়ে যেতে পারবে সে? নির্দিষ্ট এতটা পরিমাণ পর্যন্ত, নাকি অঢেল? অঢেল হলে এত মাটি বয়ে নেবে কিসে?

তবে এসব ছোট-খাটো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

শেষমেষ মি. আওর্টার মুখে হাসির রেখা ফুটল। লিলিভেল কবরখানার প্রবেশদ্বারের দিকে এগোলো সে।

নির্জন এই পরিত্যক্ত কবরখানায় দু'-দুটি কারখানা গড়ে তোলা হবে। একটি কারখানায় তৈরি হবে বিছানার চাদর, দরজা-জানালার পর্দা ইত্যাদি। আরেকটিতে তৈরি হবে মেয়েদের জুতো। পুরো জায়গা জুড়ে নির্মাণ কাজের প্রাথমিক প্রস্তুতির চিহ্ন। ক্রুশ, স্লাব আর পাথরের টুকরা স্তূপ হয়ে আছে এখানে-ওখানে। তছনছ হওয়া আলগা মাটিতে কেমন গা-ঘিনঘিনে একটা পঁচা গন্ধ। সময় নষ্ট না করে কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ শুরু করে দিল মি. আওর্টা।

'আপনারাই তাহলে বিনে পয়সায় এ মাটি দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'একজন কতটুকু নিতে পারবে?'

'যতটুকু নিতে চান।'

'তা কবে নিতে পারব?'

'যে কোনো দিন– এ মাটি যখনই নেবেন, একেবারে টাটকা পাবেন। কোনো গড়বড় তো নেই এতে।'

মি. আওর্টা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সারা জীবনের জন্য কোনো কিছুর উত্তরাধিকারী হলে যা হয়, তেমনি একটা ভাব। পরের শনিবার মাটি নেয়ার দিনক্ষণ ঠিক করে ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখার জন্য বাড়ি ফিরল সে।

রাত তখন সোয়া ন'টা, বাড়িতে বসে ভাবতে ভাবতে মাটিগুলো কাজে লাগানোর দারুণ একটা জায়গা বের করে ফেলল মি. আওর্টা।

তার পেছনের বাড়ির উঠানটা খালি পড়ে আছে। শুকনো খটখটে মাটি। ফসলের জন্য অনুর্বর। তবে আগাছায় পরিপূর্ণ। এক সময় ওখানে একটা গাছে দিনরাত কিচির মিচির করত পাখির দল। মাতিয়ে রাখত জায়গাটা। এখন আর পাখিরা আসে না। মি. আওর্টা এ বাড়িতে আসার পরপরই এমনটি হয়েছে। এখন এই গাছটাকে কেমন ন্যাংটো ন্যাংটো লাগে। বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।

কোনো শিশু খেলতে আসে না পেছনের ওই উঠানে।

মি. আওর্টা ভাবল, কবরখানার ওই সার মাটি যদি ওখানে ফেলা যায়, তাহলে চাষবাসের জন্য ভালো কাজ দিতে পারে। বেশ আগে উদ্যোমি এক শাকসবজির খামারে নমুনা হিসেবে কিছু বীজ চেয়ে চিঠি লিখেছিল সে। খামারটা তাকে বিনে পয়সায় এতো

BanglaBook.org

সবজি দিয়েছে যে, তা দিয়ে শাক-সবজি ফলিয়ে গোটা এক সেনাবাহিনীকে খাওয়ানো যাবে। কিন্তু সেবার ফলনটা মোটেও সুবিধের হয়নি। শেষ দিকে মি. আওর্টা নিজেই ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। এখনো আছে অনেক বীজ...।

জোসেফ উইলিয়াম সান্টুক্কি নামে এক পড়শিকে ভজিয়ে কবরখানার ওই মাটি আনার ব্যবস্থা করে ফেলল মি. আওর্টা। সান্টুক্কি তার পুরনো রিও ট্রাকটা ধার দিল তাকে। অল্প ক'ঘণ্টা পর মাটির প্রথম চালান এসে পড়ল মি. আওর্টার পেছন বাড়ির উঠানে। বেলচা দিয়ে মাটিগুলা নেড়েচেড়ে সুন্দর একটা ঢিবি সাজানো হলো। ঢিবি দেখে মনটা ভরে গেল মি. আওর্টার। কাজটাতে যত ক্লান্তিই থাক, আবেগের তোড়ে ভেসে গেল তা। শীঘ্রই দ্বিতীয় চালানটা এসে পড়ল, তারপর তৃতীয়, সবশেষে চার নম্বর। শেষ চালানের মাটি একেবারে কয়লার মতো কালো।

কাজ শেষে ট্রাকটা ফিরিয়ে দিয়ে এসে ক্লান্তি বোধ করল মি. আওর্টা। এতে অবশ্যি রাতের ঘুমটা ভালোই হলো তার।

পরদিন গির্জার ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে দিন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল হতে পেছনের উঠানে নেমে পড়ল মি. আওর্টা। এলোমেলো ভাবে ছড়ানো কবরের মাটিগুলো কোদাল দিয়ে সমান করে দিতে লাগল উঠানের শক্ত মাটির সাথে। ঝুরঝুরে কালো এই মাটিতে কেমন বিষণ্ন একটা ভাব। পুরোপুরি শুকনো নয় মাটিটা, সূর্যের পূর্ণ তেজে পুড়েও ভেজা ভাবটা ধরে রেখেছে।

শীঘ্রী উঠানের বেশির ভাগ অংশ ঢাকা পড়ল কবরের কালো মাটিতে। ক্লান্ত মি. আওর্টা ফিরে এলো তার বসার ঘরে।

গানের ধাঁধা হচ্ছে রেডিওতে। মিস করল না মি. আওর্টা। একদম সময় মতো রেডিওটা চালু করল এবং ঠিক ঠিক ধাঁধা থেকে উদ্ধার করে ফেলল একটি জনপ্রিয় গান। ধাঁধার উত্তর একটা পোস্টকার্ডে লিখে ছেড়ে দিল সে। মি. আওর্টা নিশ্চিত, একটা টোস্টার কিংবা এক প্রস্থ নাইলন মোজা জুটে যাবে তার।

এবার মি. আওর্টা চারটে জিনিস খুব সুন্দর করে মুড়িয়ে নিল মোড়কে। একটি হচ্ছে এক কৌটো ভিটামিন ক্যাপসুল, যার অর্ধেকই খালি। দ্বিতীয় মোড়কে রয়েছে কফির টিন, এটারও অর্ধেক সাফ। তৃতীয় মোড়কে রয়েছে আধা বোতল স্পট রিমুভার, এটাও ব্যবহার করে করে অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। সবশেষ মোড়কে রয়েছে ঝুরো সাবানের বাক্স, যে বাক্সের বেশির ভাগ ঝুরো সাবানই ঝরিয়ে দেয়া হয়েছে। চারটে মোড়ক ডাকে চারটে কোম্পানিতে পাঠিয়ে দিল সে। প্রতিটি মোড়কের সাথে রাজ্যের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে নোট দেয়া হয়েছে। নোটগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষাটা বড় চাঁছাছোলা। প্রতিটি জিনিসের সাথেই শর্ত ছিল– বিফলে মূল্য ফেরত। এই শর্তের ব্যাপারটি প্রতিটি নোটে তুলে দিতে ভুল করেনি সে।

ডিনারের সময় হলে উপাদেয় খাবারের কথা চিন্তা করে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মি. আওর্টার। রুচিকর বেশ ক'দফা খাবার নিয়ে খেতে বসল সে। হেরিং মাছ, সামুদ্রিক মাছের পোনা, মাশরুম, ক্যাভিয়ার, জলপাই, বড় বড় পেঁয়াজ এসব দিয়ে ভুরি ভোজ

BanglaBook.org

সারল। তবে গণ্ডেপিণ্ডে খেলেও মি. আওর্টার খাওয়ার মাঝে সত্যিকারের কোনো আত্মতৃপ্তি নেই। এই খাবারগুলো সবই সে ভাগিয়েছে ছিঁচকেমি করে। মুদি দোকানগুলোতে গিয়ে জিনিস কেনার ভান করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে মি. আওর্টা। তারপর দোকানিরা যখন অন্যান্য খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, অমনি পাকা হাতে মেরে দিয়েছে ছোট-খাটো প্যাকেটগুলো।

মি. আওর্টা তার থালা-বাসন চেটেপুটে এমনভাবে পরিষ্কার করল, কোনো বেড়াল এলে কণা পরিমাণ দানাও খুঁজে পাবে না। এমনকি খাবারের টিন এবং ঢাকনাগুলো পর্যন্ত নতুনের মতো ঝকঝক করতে লাগল।

এবার সে একনজর দেখে নিল নিজের চেক ব্যালান্স। ইতরের মতো একটা হাসি ফুটল তার মুখে। শেষে এগোল পেছনের জানালা দিয়ে উঁকি দিতে (মি. আওর্টা বিয়ে করেনি, কাজেই রাতের খাওয়া সেরেই বিছানায় যাওয়ার কোনো তাড়া নেই তার)।

চাঁদের মায়াবি আলো এসে পড়েছে উঠানে। মাগনা কিছু পাথর যোগাড় করে তাই দিয়ে বাড়ির চারদিকে উঁচু বেষ্টনী দিয়েছে মি. আওর্টা। সেই বেষ্টনী ডিঙিয়ে নতুন কালো মাটিতে একটা গাম্ভীর্য নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের আলো।

মি. আওর্টা খানিকক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর নিয়ে এলো সংরক্ষিত বীজের বাক্সগুলো।

বীজগুলো এখনও দিব্যি চকচক করছে।

প্রতি শনিবার ধার নিয়ে নিয়ে জোসেফ উইলিয়াম সান্টুক্কির ট্রাকটা টানা পাঁচ সপ্তাহ ব্যবহার করল মি. আওর্টা। ভালো মানুষ সান্টুক্কি কৌতূহলের সাথে লক্ষ্য করল, তার পড়শি যখন ট্রাকটা ফেরত দিয়ে যায়, প্রতিবারই প্রচুর মাটি লেগে থাকে ট্রাকটাতে। বউকে ব্যাপারটা দেখাল সান্টুক্কি। আর কিছু নয়, ট্রাককে ট্রাক কবরের মাটি আনছে লোকটা। এ মাটি দিয়ে সে করবেটা কি? কিন্তু সান্টুক্কির বউ মি. আওর্টার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখাল না, বরং বলল 'লোকটা অন্ধের মতো ডাকাতি করছে আমাদের সাথে। সে তো পুরোপুরি চলছেই আমাদের ওপর দিয়ে। তোমার পুরনো কাপড়গুলো নিয়ে পোশাকের কাজ চালাচ্ছে। চিনি আর মশলাপাতি ইচ্ছেমতো নিয়ে যাচ্ছে বারবার। এভাবে যখন যে জিনিসের দরকার, ধার নিয়ে যাচ্ছে/ ধার কেন, এটাকে চুরি বলব আমি। নাকের ডগা দিয়ে চুরি? ধার নেয়ার নামে পুরোপুরি কব্জা করা। কোনো জিনিস আজ পর্যন্ত ফেরত দিয়েছে সে? যেখানে সে কাজ করে কম টাকা কামায় নাকি?'

মি. সান্টুক্কি বা তার স্ত্রী কেউই কিন্তু আসলে জানে না মি. আওর্টার রোজগার আসল কাজ হচ্ছে শিক্ষা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে, ফুটপাতে দিব্যি বসে যায় সে। তার সামনে থাকে তোবড়ানো একটা টিনের কাপ, আর চোখে থাকে কালো চশমা। এই চশমার জন্যই তখন সহজে চেনা যায় না তাকে। সান্টুক্কি এবং তার স্ত্রী দু'জনেই বেশ ক'বার হেঁটে গেছে আওর্টার সামনে দিয়ে, এমনকি আওর্টাকে পয়সাও দিয়েছে, তবু তার নিখুঁত ছদ্মবেশ উন্মোচন করতে পারেনি। আওর্টার এই ছদ্মবেশের উপকরণগুলো মাগনা, এমনকি এগুলো সে রাখেও বিনে পয়সার জায়গায়, রেকরড টার্মিনালের ফ্রি লকারে।

BanglaBook.org

মিসেস সান্টুক্কি উপায়ান্তর না দেখে শেষমেষ বিলাপের মতো করে বলে ওঠে, 'ডেকরা বেটা শুধু বার বার আমাদের সাথেই মরতে আসে।'

শিগ্রী বীজ বোনার সময় এসে গেল। লাইব্রেরিতে গিয়ে বেশকিছু বই পড়ে বীজ রোপনের নিয়ম-পদ্ধতি জেনে নিল মি. আওর্টা। তারপর সুন্দর করে সারির পর সারি বুনে দিতে লাগল বিভিন্ন ধরনের বীজ। গ্রীষ্মকালীন স্কোয়াশ (সবজি দেখতে বেগুন আর লাউয়ের মাঝামাঝি), মটর, ভুট্টা, সিম, পেঁয়াজ, শালগম, রুবার্চ (এক ধরনের লতানো সবজি গাছ), অ্যাসপ্যারাগাস, কিছু জলজ শাক এবং আরও কিছু সবজির বীজ বুনে দিল সে। যখন সব ক'টি সারি ভরে গেল, তখনও কিছু বীজ বয়ে গেছে বোনার জন্য। মি. আওর্টা ছড়িয়ে দিল স্ট্রবেরি আর তরমুজের বীজ। এভাবে দ্রুত খালি হয়ে গেল তার বীজের মোড়কগুলো।

কিছুদিন পর অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল মি. আওর্টা। বাগানের কালো মাটি ভেদ করে ছোট ছোট কি যেন বেরিয়ে আসছে। কৌতূহলী হয়ে কাছে গেল সে। দেখে, তার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। ফলন শুরু হয়েছে শাকসবজির।

শাকসবজির চাষবাস সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা নেই মি. আওর্টার। তবে এতো দ্রুত অঙ্কুর বেরোনোর কথা নয়, এটা অন্তত জানা আছে তার। ব্যাপারটা তাকে অবাক করলেও এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হলো না সে। বীজ থেকে জিনিস বেরোচ্ছে– এটাই তার কাছে বড়। আর এ জিনিস থেকে জমাবে লোভনীয় সব খাবার।

অঙ্কুরের পুষ্টি সাধনের জন্য আবার কবরখানা থেকে এক ট্রাক মাটি এনে বাগানে ফেলল মি. আওর্টা। সার মাটি পেয়ে ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে উঠতে লাগল চারাগুলো।

মি. আওর্টা ভাবল, এভাবে যদি ছুটির দিনগুলোতে এক ট্রাক করে মাটি এনে ফেলতে পারে এই শাকসবজির বাগানে, তাহলে বেশি বেশি পুষ্টি পেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হবে চারাগুলো।

কিন্তু পরের সপ্তায় গিয়ে ফক্কা খেতে হলো। এক ট্রাক কেন, এক বেলচাও হবে না। মাটি সব শেষ। ফলে শুকিয়ে যেতে লাগল বাগানের অঙ্কুরিত কচি চারাগুলো। মহাফাঁপরে পড়ে গেল মি. আওর্টা। বাগানটাকে বাঁচনোর জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সব ধরনের নতুন মাটি এনে ফেলতে লাগল। বইয়ের বর্ণনা অনুযায়ী সব ধরনের সার মেশালো মাটিতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বাগানটা যেন ফ্লপ করেছে, একইরকম সার মাটি চাই তার।

মি. আওর্টা তীরে এসে তরী ডোবাতে রাজি নয়। শেষে নির্জন এক রাতে সাহস করে চুপি চুপি হাজির হলো গিয়ে কবরখানায়। খুঁজে খুঁজে বের করল সদ্য খোঁড়া অব্যবহৃত কবরগুলো। একেকটা ছ'ফুট গভীর। প্রতিটা আরও এক ফুট করে খুঁড়ল মি. আওর্টা।

মি. সান্টুক্কির কাছ থেকে ধার নেয়া ট্রাকটার মাত্র চার ভাগের এক ভাগ ভর্তি হলো এ মাটিতে। এতেই খুশি আওর্টা।

বাগানে মাটি ফেলার পরদিনই আবার নতুন করে গজিয়ে উঠল চারাগুলো।

ব্যাস, এভাবেই চলতে লাগল। প্রয়োজন মতো কবরখানা থেকে সার মাটি যোগান দেয় মি. আওর্টা, আর তার বাগানটা দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কিছুদিন পর সবুজে সবুজে ছেয়ে গেল সমস্ত বাগান। সারির পর সারি নানা ধরনের সবজির প্রাচুর্য।

BanglaBook.org

মি. আওর্টা তো খুশিতে আটখানা। তার স্বভাবই হচ্ছে যখন পেলাম, তখন খেলাম। আর কোনো জিনিস কুক্ষিগত করার ব্যাপারে কোনো রকম লাজ-লজ্জার বালাই নেই তার। সেখানে বাগানের সব শাকসবজি তো সম্পূর্ণ তার নিজের। ফলে সেগুলো নিখুঁতভাবে ঘরে তুলে নিতে কোনো অসুবিধে হলো না। বেশ ধৈর্যের সাথে ভুট্টা, মটরদানা এবং আরও অন্যান্য ক্ষেতের ফসল ঘরে তুলল সে। শেষে বাগানে রয়ে গেল শুধু আগাছা আর লতাপাতা, যেগুলো কোনোভাবেই খাওয়ার যোগ্য নয়।

ঘরে তোলা শাকসবজি আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলো মি. আওর্টা। খোসা ছাড়াল। কেটেকুটে সুন্দর করে সাজালো। তারপর রান্না করতে লাগল সবজিগুলো।

রান্না শেষে অতিপ্রিয় মাগনা জিনিসগুলো সুন্দরভাবে একে একে টেবিলে এনে সাজালো মি. আওর্টা। তারপর হৃষ্টচিত্তে খেতে শুরু করল। ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে নাম ধরে একে একে খাবারগুলো টেনে নিল সে। অ্যাসপ্যারাগাস 'এ' দিয়ে শুরু, কাজেই ওটাই ধরল আগে। তারপর 'বি' দিয়ে বিট, মানে শালগমের কারি খেল। তারপর খেল 'সি' দিয়ে সেলারি, এক ধরনের শাক। এভাবে সিরিয়াল ধরে একটার পর একটা শাকসবজি খেয়েই চলল মি. আওর্টা। মাঝখানে শুধু পানি পানের জন্যে থামল একটুখানি। তার সবশেষ আইটেম ছিল 'ডব্লিউ' দিয়ে ওয়াটার মেলন, অর্থাৎ তরমুজ।

খাওয়া শেষে থালাবাসন আর ধোয়ার প্রয়োজন পড়ল না। বরাবরের মতো এমনভাবে চেটেপুটে খেয়েছে সে, সবই যেন বরফের ধবধবে স্নোফ্লেকের মতো ঝকঝক করছে।

গণ্ডেপিণ্ডে খাওয়ার পর পেটে মৃদু ব্যথা অনুভব করতে লাগল মি. আওর্টা। সেরকম কঠিন কিছু নয়। বরং এ ব্যথা মিঠে মিঠে একটা ভাব। বলতে গেলে, এই ভুঁরিভোজে প্রায় যৌন তৃপ্তির মতো একটা স্বাদ পেয়েছে সে। এমনকি একটা ঢেকুর পর্যন্ত তোলেনি।

বেশ সুখি সুখি একটা ভাব এসে যায় মি. আওর্টার। মাগনা পাওয়া আর মাগনা খাওয়া– দুটো স্বপ্নই আজ পূরণ হয়েছে তার। জীবনে এই দুটো চাওয়া-পাওয়া ছাড়া আর কিছু তো নেই মি. আওর্টার।

ফুরফুরে মেজাজে পেছনের জানালা দিয়ে উঠানের এই বাগানটার দিকে একবার তাকাল সে।

নিকষ কালো আঁধারের মাঝে উজ্জ্বল সাদা একটা ছোট ছোপ। ছোট হলেও ছোপটা চোখে পড়ার মতো। আর ওটা রয়েছে বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে।

কৌতূহলী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে এগোল মি. আওর্টা।

কিন্তু কাছাকাছি যেতেই জিনিসটা যেন আঁধারে মিলিয়ে গেল সহসা। চোখ সরু করে ভালোভাবে খুঁজে দেখল সে। হ্যাঁ, আছে ওটা। একটা গাছ। না, একটা ফুল। বেশ বড়। আর ওটা গজিয়েছে অগভীর একটা গর্তে, মৃতপ্রায় সেই গাছটার কাছে এগিয়ে গেল মি. আওর্টা। ভেবে পেল না কি করে তৈরি হয়েছে এই গর্তটা। সে ঝুঁকে পড়ে ওই সাদা ফুলটা ধরতে চেষ্টা করল। আশ্চর্য, ফুলটা সরে গেল একটু। আরেকটু ঝুঁকল মি. আওর্টা। এবারও কাজ হলো না। শেষে আরও ঝুঁকতে গিয়ে ধপাস করে গর্তে পড়ে গেল সে। কিন্তু কোথায় ওই সাদা ফুল? গর্তের তলাটা একদম ফাঁকা। তাছাড়া গর্তটা আগের চেয়ে বেশ গভীরও মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

হঠাৎ ওপরের দিকে চোখ পড়তেই মি. আওর্টা দেখে, সাদা ওই জিনিসটা তার মাথার ঠিক ওপরে দুলছে শূন্যে।

সহসা সে অনুভব করল, তার পেটের সেই মৃদু ব্যথাটা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রচণ্ড একটা চাপ যেন পাঁজর ভেঙে বের করে দিতে চাইছে তার নাড়ি-ভুড়ি। এমন সময় চাঁদের আলোতে মি. আওর্টা দেখে, সাদা ওই ফুলের মতো জিসিনটা আসলে একটা মানুষের পাঞ্জা। আঙ্গুলগুলো ঠিক ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে। আর পাঞ্জার সাথে লাগানো পুরু লতার মতো বাহুটা গেঁথে আছে গর্তের কানায়। হাতটা আবারো বিশাল, ধবধব করছে সাদা মোমের মতো।

মি. আওর্টা ওপরের দিকে উঠতে চাইল, কিন্তু পেটের যন্ত্রণা বাদ সাধল। এদিকে ওই হাতের পাঞ্জা তার মাথার ওপর ফুলের মতো ছড়িয়ে কি যেন ফেলছে। আবার এ তো মাটি! ঝুরঝুরে মাটির ছোট ছোট ডেলা।

মি. আওর্টা প্রাণপণ চেষ্টা করল গর্তটা থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু পারল না। একদিকে তার পেটের যন্ত্রণাটা যেমন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, তেমনি ওই পাঞ্জা থেকে মাটি ঝরে পড়ার বেগও বাড়ছে ততো। এমনকি এই চরম বিপদের মাঝে চিৎকার দেয়ারও সুযোগ পেল না মি. আওর্টা।

জোসেফ উইলিয়াম সান্টুক্কি এবং তার বউ মিলে খুঁজে পেল মি. আওর্টাকে। মেঝেতে টেবিলের সামনে পড়ে আছে সে। টেবিলে একগাদা বাসন কোসন– সবই ঝকঝকে পরিষ্কার।

মি. আওর্টার পেটটা ফুলে আছে অস্বাভাবিক রকম। কোমরের বেল্টার বকলেস ছুটে গেছে, বোতামগুলো ফর্দাফাই, এমনকি জিপার পর্যন্ত ফেটে পড়ার উপক্রম। পেটের ভাবখানা এই, যেন বিশাল এক সাদা তিমি পানি থেকে ভেসে উঠতে যাচ্ছে।

'শেষ পর্যন্ত খেতে খেতেই মরল বেচারা!' করুণ রস ঝরল মিসেস সান্টুক্কির কণ্ঠে।

এদিকে মি. সান্টুক্কি ছোট্ট এক মাটির ডেলা তুলে নিলো মৃত মি. আওর্টার ঠোঁটের কাছ থেকে। মাটিটা গভীর মন দিয়ে পরীক্ষা করল সে। একটা ধারণা মাথায় এলো তার, কিন্তু প্রকাশ করল না। বরং ধরনটাকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ডাক্তাররা যখন পোস্টমর্টেমের সময় মি. আওর্টার পেটে একগাদা মাটি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেল না, বিস্ময়ের সীমা রইল না মি. সান্টুক্কির। পরে প্রায় এক সপ্তাহ ভালো করে ঘুমোতে পারেনি —

মি. আওর্টার মৃত দেহটা তার সখের বনের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল কবরখানার দিকে। তাকে যে কবরখানায় চিরনিদ্রায় শোয়ানো হলো তার পাশেই একটা সবুজ ছ্যাতলা পড়া কাঠের বেড়া। বেড়ায় একটা বিজ্ঞাপন সাঁটানো। বিজ্ঞাপনে অযত্নে, আর স্পষ্টভাবে লেখা :

বিনে পয়সার মাটি
আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন...।

BanglaBook.org

ফ্রি ডার্ট

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

কুৎসিত লোকটা

হেলেন পিডডক

কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা কাউকে বিশ্বাস করানো যায় না, ঘটনাগুলোকে মনে হয় অতিলৌকিক। অথচ লর্ড ডারফিনের জীবনে ঠিক তাই ঘটেছিল। উচ্চপদস্থ এক কূটনীতিবিদ তিনি, একসময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলও ছিলেন। পুরো ব্যাপারটা নিজের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু নিজের চোখের সামনে দেখা জিনিসগুলোকে অস্বীকার করেন কিভাবে?

১৮৮০ সালের কথা। আয়ারল্যান্ডে কিছুদিনের জন্য ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন লর্ড ডারফিন। ওখানকার গ্রাম্য শান্ত জীবন তার ভালোই লাগল। সকাল থেকে সন্ধ্যা– সারাটা দিন তিনি ঘুরে বেড়ান গ্রামের বৃক্ষঘেরা পথে পথে। প্রাণভরে উপভোগ করেন সময়টুকু।

সেদিন হোটেলে নিজের রুমে ঘুমিয়ে ছিলেন ডারফিন। সারাদিন ঘুরে ঘুরে স্বভাবতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল তাঁর। কেন জানি চমকে উঠলেন। এরকম তাঁর সাধারণত হয় না। বরাবরই মরার মতো ঘুমান। হঠাৎ করে ঘুম ভাঙার কারণটা তাই বুঝতে পারলেন না তিনি। অস্বস্তি বোধ করলেন খুব। উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে। জানালা খুলে বাইরে তাকালেন। মাঝ রাত। চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। আকাশে তারাগুলো জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। নিচে, ঘাসে ঢাকা বিস্তৃত খোলা মাঠে গলে গলে পড়ছে যেন নরম জোছনা।

হঠাৎ মাঠের মধ্যে একটা মানুষের আকৃতি দেখতে পেলেন তিনি। ভালো করে দেখার জন্য ঝুঁকলেন। এবার মানুষটাকে দেখতে পেলেন। কিম্ভূতকিমাকার, বীভৎস। পিঠে বিশাল এক কুঁজ রয়েছে। দেখে মনে হলো পিঠের ওপর কি যেন একটা বোঝা চাপানো। ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে লোকটা। এতো রাতে লোকটাকে হোটেলের দিকে আসতে দেখে কৌতূহলী হয়ে পড়লেন লর্ড ডারফিন। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লেন। নিচে নেমে হোটেলের বাইরের লনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এবার ভালো করে দেখলেন লোকটাকে। পিঠের ওপর একটা কফিন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা।

'কফিনে করে কি নিয়ে যাচ্ছ তুমি?' চিৎকার করলেন লর্ড ডারফিন। চিৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। চোখ তুলে তাকালো ডারফিনের দিকে। গভীর এই রাতে লোকটার চোখে চোখ পড়তে চমকে উঠলেন ডারফিন। লোকটার সমস্ত চোখে-মুখে

BanglaBook.org

বীভৎসতার ছাপ। এমন কুৎসিত মুখ তিনি জীবনে দেখেন নি। চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করলেন। আবার তাকালেন চোখ তুলে। মুহূর্তে ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে। সামনে কেউ নেই, কফিনসহ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা। নিজের চারপাশে তাকালেন তিনি। কোথাও কেউ নেই। অবিশ্বাস্য এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়লেন লর্ড ডারফিন। ঘুরে হোটেলটায় ফিরতে যাবেন, এমন সময় তার চোখের সামনে ধ্বসে পড়ল দেয়ালটা। পুরো হোটেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পরিণত হলো ধ্বংসস্তুপে।

পুরো ব্যাপারটাই লর্ড ডারফিনের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো। আয়ারল্যান্ড থেকে ফেরার পরও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াল বীভৎস সেই স্মৃতি। কাউকেই বলতে পারলেন না ঘটনাটা। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হলো ওটা ছিল ভ্রান্তি, মনের ভুল। ধীরে ধীরে স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেললেন তিনি।

কয়েকটা বছর কেটে গেল। কূটনৈতিক কাজে এবার প্যারিসে গেলেন লর্ড ডারফিন। শহরের পাঁচতারা হোটেলে সম্মেলন হবে। হোটেলটায় ঢুকে রেজিস্ট্রি বইয়ে নাম সই করলেন, তারপর সেক্রেটারিকে সঙ্গে নিয়ে এগোলেন লিফটের দিকে।

লিফটের দরজাটা খোলা। ভেতরে লিফটম্যান অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি এগোলেন ডারফিন। লিফটম্যানের মুখের দিকে তাকাতেই জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো ধাক্কাটা খেলেন। দেখলেন, লিফটের দরজাটা খুলে ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুৎসিত লোকটা। ভীষণভাবে চমকে উঠলেন লর্ড ডারফিন। ভয়ে দু'পা পিছিয়ে এলেন তিনি। তাঁকে পাশ কাটিয়ে কয়েকজন লিফটটায় উঠল। সেক্রেটারি ডাক দিল তাকে, সেও উঠে পড়েছে লিফট-এ। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ালেন ডারফিন। সম্মেলনে যোগ দিতে তাঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলেও লিফট-এ উঠতে সাহস পেলেন না। তাঁর চোখের সামনে কেবল ভাসছে কুৎসিত লোকটার বিকৃত চেহারাটা।

সশব্দে লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অন্য লোকদের নিয়ে লিফটা উঠে গেল উপরের দিকে। লর্ড ডারফিন দ্রুত পায়ে হেঁটে রিসিপশনে এলেন। খোঁজ নিতে লাগলেন কুৎসিত লোকটার ব্যাপারে। কিন্তু কেউ কোনো তথ্য দিতে পারল না তাঁকে। কুৎসিত লোকটার কথা কেউ কিছুই জানে না। এ ধরনের কোনো লোককে কেউ নাকি হোটেলে কোনো দিন দেখেনি, লিফটেও চড়তে দেখেনি কেউ। বিব্রতবোধ করলেন লর্ড ডারফিন। রিসিপশনে যখন এসব আলোচনা হচ্ছিল এমন সময় বিকট এক শব্দ শোনা গেল। কেঁপে উঠল সমস্ত হোটেল। হুড়মুড় করে কি যেন পড়ল। লিফটের সামনে ভিড় জমে গেছে। হতবিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছেন লর্ড ডারফিন। পুরো লিফটটাই খসে পড়েছে পাঁচতালা থেকে। ভেতরে রক্তারক্তি অবস্থা, মারা গেছে সবাই। এই লিফটেই ওঠার কথা ছিল তাঁর।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডারফিন। বুঝলেন, কুৎসিত লোকটা আজো তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাল।

দ্য আগলি ম্যান **অনুবাদ : মিজানুর রহমান কল্লোল**

BanglaBook.org

অপারেশন

এডগার জেপসন
ও
জন গসওয়ার্থ

সেদিন বিকেলে টেলিগ্রামটা পেয়ে অবাকই হয়ে গেলাম। লন্ডন থেকে লিখেছে আমার পরম বন্ধু ক্লেভারিং, বলেছে চিঠি পাওয়া মাত্র যেন চলে আসি। শুধু তাই নয়, আরো লিখেছে নাকি অনেক বড় সুযোগ হবে আমার।

টেলিগ্রামের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে দেরি না করে সেদিনের ট্রেনেই লন্ডন চলে গেলাম।

স্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ক্লেভারিং। গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলল, 'বাড়িতে গিয়ে কথা হবে।'

ক্লেভারিং বিরাট বড় লোক। বিংস ক্রসে জমিদারি বাড়ি নিয়ে থাকে। শতাব্দী প্রাচীন বাড়িটা ওর দাদার আমলের।

ক্লেভারিংকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছিল। সে সরাসরি আমাকে নিয়ে সার্জারি রুমে ঢুকল।

প্রাচীন বাড়ির প্রাচীনত্বের আভাস এ বাড়িতেও আছে। তবে ফিটিংসগুলো সম্পূর্ণ আধুনিক। আমাকে হুইস্কি আর সোডা অফার করার পর আসল ব্যাপার খুলে বলল ক্লেভারিং।

'ঘটনাটা আমার হবু বউকে নিয়ে।' ঢোক গিলল সে। 'ওর নাম জানো তুমি– সিলভিয়া বার্ড, দক্ষিণ ফ্রান্সের সুইমিং চ্যাম্পিয়ন– ওর সাথে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে, তবে বউ করে ঘরে নিয়ে যেতে পারব কিনা ভেবে ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি। অন্তত অপারেশনটা ঠিকঠাক মতো না হবার আগে কিছুই পরিষ্কার বলা যাচ্ছে না। তবে ওর রোগটা ধরতে পারিনি আমরা। অথচ উত্তরের এমন কোনো ডাক্তার নেই যাকে আমি দেখাইনি।'

মিস বার্ডকে দেখেছি আমি। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী। ছেলেবেলায় শুধু একবার হাম হয়েছিল। তারপর থেকে সামান্য সর্দি-কাশিও ওকে কাবু করতে পারেনি। খুব ভালো টেনিস এবং গল্‌ফ খেলে সিলভিয়া। এমনকি নিজের এলাকার হয়ে হকি ম্যাচে পর্যন্ত অংশ নিয়েছে। গত হকি সিজনে সে দলের লোকজনের সাথে ট্রেনে চড়ে খেলতে গিয়েছিল রিভিয়েরায়। ওখান থেকে ফেরার ছ'সপ্তাহ পর সমস্যার শুরু।

BanglaBook.org

সমস্যাটা পেট সংক্রান্ত।

শুরুতে ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি সিলভিয়া, তাই ধীরে ধীরে অসুখটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। কিন্তু ক্লেভারিং বা তার ডাক্তাররা কেউ ধরতে পারেনি রোগটা কি। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সবাই। কিন্তু সবগুলোই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

সবশেষে বলল ক্লেভারিং, 'কখনো শুনেছ বা দেখেছ যে শরীরের ভেতর মাংস পিণ্ড জায়গা দখল করে?' প্রহৃত আর্তনাদের সুর বেরুল গলা থেকে।

'শুনিনি। আর পিণ্ড কখনো নড়াচড়া করতে পারে না।' বললাম আমি দৃঢ়তার সাথে।

'কিন্তু এটা পারে। এক্সরে ফটোগ্রাফগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখ।'

ড্রয়ার খুলে একটা প্যাকেট বের করল ক্লেভারিং, এক্সরে ফটোগ্রাফগুলো দিল আমার হাতে। একসাথে দু'জনই ওদিকে তাকালাম।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য!

পিণ্ডই বটে– নীলচে, কালো রঙের পিণ্ড। তবে এরকম আজব পিণ্ড জীবনে দেখিনি আমি। প্রথম ফটোগ্রাফে পিণ্ডটা যেখানে ছিল, দ্বিতীয়টাতে দেখা যাচ্ছে আগের জায়গা থেকে অন্তত আট ইঞ্চি ডানে সরে এসেছে।

'অপারেশন করাওনি কেন?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম। 'অপারেশন! করিয়েছি। উত্তরের শ্রেষ্ঠ সার্জন ডাউলিং অপারেশন করেছেন। কিন্তু পেট কাটার পর দেখা গেছে পিণ্ডটা ওখানে নেই– জিনিসটার তিনি খোঁজই পাননি।'

শুনে আমার চোয়াল ঝুলে পড়ার দশা।

'তাই তোমাকে তার করেছি আমি, আবার অপারেশন করানোর জন্য। তবে ভয় পাচ্ছি ভেবে, ব্যাপারটা দীর্ঘমেয়াদি রূপ না নেয়– তাহলে আর সহ্য করতে পারবে না সিলভিয়া– প্রথম বারেই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে ওর। কিন্তু ছুরিতে তোমার এতো দ্রুত হাত আমি আর কারো দেখিনি। আর তুমি এসেও পড়েছ যথাসময়ে।'

'ঠিক আছে। দেখি কি করতে পারি আমি।' বললাম আমি মৃদু গলায়। 'সিলভিয়া কোথায়?'

'ওকে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে', জবাব দিল ক্লেভারিং, 'বাড়িতে বসে এসব কাজ হয় না।'

'ঠিকই করেছ। এখন আমার জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করো। খিদেই পেট চোঁ চোঁ করছে।'

'নাস্তা রেডিই আছে।'

স্যান্ডউইচ খেয়েই ক্লেভারিং-এর সাথে দৌড়ালাম হাসপাতালে। ধোঁয়া ওঠা রাবার গ্লাভস পরে ঢুকলাম অপারেশন থিয়েটারে। স্ট্রেচারে করে নিয়ে এলো ওরা রোগিণীকে। অপূর্ব সুন্দরী সিলভিয়া বার্ডের এ কি দশা। মনে হলো একটা কংকাল শুয়ে আছে বিছানায়।

BanglaBook.org

'এ দেখছি না খাওয়া কেস!' আঁতকে উঠলাম আমি।

'দেখে মনে হয় তাই', মুখ গম্ভীর করে বলল ক্লেভারিং।

'আসলে তা নয়।'

'তাহলে শিগগির ব্লাড ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা কর। এই ফাঁকে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সেরে নিই।

সিলভিয়া বার্ডের পেটের দিকে তাকাতেই ওটাকে দেখতে পেলাম। ফুলে আছে একদিকে। চাপ দিলাম। লাফিয়ে উঠল। মনে হলো আঙুলের নিচে মোচড় খেল নরম, থকথকে একটা শরীর। জীবনেও দেখিনি পিণ্ড এভাবে লাফালাফি করে। এ্যানেসথেসিস্টের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম, সে সুঁই ফুঁড়ে দিলো সিলভিয়াকে, অজ্ঞান হয়ে গেল মেয়েটা।

এখন আমার পালা। ইতোমধ্যে মন স্থির করে ফেলেছি কি করব। পিণ্ডটার চেহারা আমার দেখতেই হবে। ফুলে ওঠা জায়গাটায় সুঁই ঢুকিয়ে ওটাকে গেঁথে ফেললাম। পেটের চামড়া তিরতির করে লাফাতে শুরু করল।

এবার যন্ত্রপাতিগুলো হাতে তুলে নিলাম আমি– কাজে নেমে গেলাম দ্রুত।

সুঁই দিয়ে গাঁথা জিনিসটার চারপাশের মাংস কেটে ফেললাম স্ক্যালপেল দিয়ে। নীলচে কালো রঙের স্পঞ্জের একটা জিনিস বিঁধে আছে সুঁইয়ের ডগায়, লাফাচ্ছে। আর ক্রমাগত মোচড় খাওয়া স্কন্ধের ঠিক মাঝখান দিয়ে দুটো পলকহীন চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

একটা অক্টোপাস!

অপারেশন টেবিলে আমরা সার্জনরা সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকি; কিন্তু এমন একটা দৃশ্য দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না মোটেই। অস্বীকার করব না, এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল একটা শয়তান ভীষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হঠাৎ মনে হলো, ওর শরীর থেকে আত্মপ্রকাশ করল কিলবিলে আটটা শুঁড়, সুঁইয়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে। তারপর দশ সেকেন্ড আমি যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম। অন্তত পঞ্চাশটা কোপ বসালাম আমি মোচড় খেতে থাকা স্পঞ্জের শরীরে।

মোচড়া-মুচড়ি অবশেষে থেমে গেল।

ফরসেপ দিয়ে তুললাম ওটাকে, সহজেই উঠে এলো শুঁড়গুলো নির্জীব।

'এই যে তোমার পিণ্ড', বললাম আমি। ছিন্নভিন্ন হওয়া দেহটাকে ফেলে দিলাম বেসিনে। বেসিনের জলের স্রোতে ওটা ড্রেন পাইপের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, শেষ মুহূর্তে মনে হলো ক্রুর দৃষ্টিতে ওটা এখনো দেখছে আমাকে।

শিউরে উঠল ক্লেভারিং।

সিলভিয়ার ক্ষত ধুয়ে দশ মিনিটের মধ্যে সেলাই করে দিলাম– অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে এতো দ্রুত কাজ কখনো করিনি।

BanglaBook.org

সিলভিয়া বার্ড ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। তারপর বিয়ে হয়ে গেল ওর ক্লেভারিং-এর সাথে। খবরের কাগজে আমার সম্পর্কে লেখা হলো, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে নাকি এতো দ্রুত গতিসম্পন্ন সার্জন দেখা যায়নি, যার হাত আগের চেয়েও দ্রুত বেগে চলে।

খুব অল্প দিনের মধ্যে সারাদেশে আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। লন্ডনেই প্রসার হতে লাগল। আমাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হলো না। সেই সাথে 'অনেক বড় সুযোগ হবার' রহস্যও উদঘাটিত হলো।

দ্য শিফটিং গ্রোথ **অনুবাদ : আনন্দ সিদ্ধার্থ**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ফাঁদ

ব্যাসিল কুপার

অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় ছোট্ট হোটেলটায় এসে পৌঁছলেন মসিয়ে পিনেট। রাস্তার ওপর শরতের শুকনো পাতা, বিবর্ণ পথটা ধরে হেডলাইটের আলোয় পাশে আঁধার চিরে আসার সময় মনটা বেশ উৎফুল্লই ছিল পিনেটের। তিনি প্যারিস টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচারারের একটি বড় ফার্মের রিপ্রেজেনটেটিভ। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় তিনি যান আনন্দ করতে।

আজ অবশ্য আলাদা আরেক অঞ্চলে এসেছেন তিনি। দক্ষিণের লিয়ন্স থেকে ইলেডি ফ্রান্সের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। তাঁর বেতন বেড়েছে, স্ফূর্তির অন্যতম একটি কারণ, আর ভিন্ন এলাকায় যেতে পারছেন, স্বভাবতই ভালো লাগছে তাঁর।

নতুন এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এক কথায় শ্বাসরুদ্ধকর। বিপুলবেগে গাড়ি ছুটিয়েছিলেন পিনেট, হাসিতে উদ্ভাসিত চেহারা। আনন্দে থাকারই কথা– অত্যন্ত সফল হয়েছে তাঁর এবারের ট্যুর। মক্কেলের দেয়া টাকায় মানিব্যাগটা ফুলে আছে।

এ মুহূর্তে তিনি ফ্রান্স থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে, তাঁর বাড়ি কুরবেভোই'র শহরতলিতে দীর্ঘ পথ ভ্রমণে শরীর বেজায় ক্লান্ত, গাড়ি ঠেলে বাড়ি পৌঁছার ধকল আর সইতে পারবেন না বুঝতে পারছেন। সেই অক্সেরে থেকে গাড়ি ছুটিয়ে আসছেন তিনি, এখন একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়। একটা গ্রামের পাশ দিয়ে ছুটছিলেন তিনি। হঠাৎ ছোট হোটেলটার সাইনবোর্ডে আটকে যায় চোখ। সিদ্ধান্ত নেন রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন বাড়ি চলে যাবেন।

হোটেলটা প্রায় একটা জঙ্গলের মধ্যেই বলা যায়। চারপাশে পাইন গাছ, একটা ক্যানভাসের নিচে কতগুলো চেয়ার-টেবিল ফেলে রাখা, তবে হলওয়েতে আলো জ্বলছে। তার মানে এটা পরিত্যক্ত নয়। পাইন গাছের নিচে গাড়ি রাখলেন পিনেট। একটা বার চোখে পড়ল তাঁর, অনেকগুলো বোতল সাজানো বারটিতে। দেখে মনে হয় উষ্ণ তরল পদার্থে বোঝাই বোতলগুলো।

হোটেল বা সরাইখানাটির সামনে আর কোনো গাড়ি নেই, তবে এ নিয়ে পিনেটের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তিনি কারো সঙ্গ আশাও করছেন না। এ মুহূর্তে আধা বোতল ওয়াইনের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে বুকটা, মদ গিলে শরতের হিমভাবটা থেকে রক্ষা

BanglaBook.org

পেতে চান। তারপর পেট পুরে ডিনার খেয়ে আট ঘণ্টা ঘুম দিলেই পরদিন সকালে তাজা মন ও শরীর নিয়ে যাত্রা শুরু করা যাবে প্যারিসের উদ্দেশে।

গাড়ি পার্ক করে ওটাতে তালা লাগালেন পিনেট, তারপর হলঘরে ঢুকলেন। পালিশ করা মেঝেতে শুয়ে আছে একটা বিড়াল। শহরে পোশাক পরা এক লোক পান করছে। এছাড়া জীবনের চিহ্ন নেই কোথাও। লোকটা পিনেটকে দেখে মৃদু গলায় 'শুভ সন্ধ্যা' বলল, তারপর তরল জিনিসটা শেষ করে বেরিয়ে গেল। মসিয়ে পিনেট জানালা দিয়ে দেখলেন একটা নীল রঙের বড় মার্সিডিজ নিয়ে চলে যাচ্ছে লোকটা। গাড়িটা রাস্তার ঢালে পার্ক করা ছিল।

কাউন্টারের বেল টিপে ধরতেই চটি ফটফট করে এগিয়ে এলো এক লোক। বিনয়ের অবতার সেজে সে জানাল, হ্যাঁ, মঁসিয়ে অবশ্যই এখানে একটা ঘর পেতে পারেন, আর ডিনারের ব্যবস্থাও করা যাবে।

মসিয়ে পিনেট রেজিস্টারে নিজের নাম সই করলেন। চারপাশে চোখ বুলিয়ে অবাকই লাগল তাঁর, এতো বড় ডাইনিং রুম, অন্তত দুশো মানুষ একসাথে বসে খেতে পারে। অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এটা ট্যুরিস্ট সিজন নয়, ব্যাখ্যা করল হোটেল মালিক। তাই লোকজন খুব কমই আসে। অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই পিনেটের। তিনি এখন ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই খুশি।

হোটেল মালিক মধ্য বয়স্ক, টাক মাথা, অস্বাভাবিক বড় কান। চোখ দুটি কুঁতকুঁতে, লোভ আর ধূর্তলতার ছায়া দেখতে পেলেন পিনেট। হাসার সময় বেরিয়ে এলো সোনা বাঁধানো দাঁত, আলো পড়ে ঝিকঝিক করে উঠল। হাসলে লোকটাকে মোটেই ভালো লাগে না, কুৎসিত দেখায়।

লোকটা তার নাম বললেও ঠিক শুনতে পাননি পিনেট। তবে প্রথম দর্শনেই টাকুকে অপছন্দ হয়েছে তাঁর। ডিনার টেবিলে হাজির থাকল সে। পিনেট আশপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না, অবশ্য রান্নাঘরে কেউ থাকতে পারে বলে ধারণা হলো তাঁর। একটু পর লো-কাট কালো ফ্রক পরা এক মুটকিকে দেখতে পেলেন তিনি এক ঝলকের জন্য, দূর থেকে হেঁটে যাচ্ছিল। চোখাচোখি হতে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সালাম করল, বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলে গেল। লোকটার বউ হবে, ধারণা করলেন পিনেট।

খাওয়ার আগে হাত-মুখ ধোয়া দরকার। টয়লেটের দরজা দেখিয়ে দিল হোটেল মালিক। ডাইনিং রুমের পরে ছোট্ট করিডোর, তার মাথায় টয়লেট। অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়ে বাতির সুইচ জ্বাললেন পিনেট এবং শিউরে উঠলেন দৃশ্যটা দেখে। একটা মাকড়সা প্রকাণ্ড। বাদামি রং। বসে আছে চির ধরা পাথুরে মেঝেতে।

ওটার ধাতব চোখজোড়া যেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল পিনেটের দিকে। মাকড়সার ভীষণ ভয় করেন পিনেট। প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে ওটাকে জুতোর নিচে পিষে ফেললেন তিনি।

BanglaBook.org

টয়লেটের দরজা খুলে আলো জ্বালতে আর্তনাদ করে উঠলেন পিনেট। এখানেও দুটো দানব, একটা দেয়ালে, তাঁর মাথার কাছে, অন্যটা কমোডের নিচে, মেঝেতে। ওটা নড়ে উঠতে খসখসে পায়ের শব্দও যেন শুনতে পেলেন পিনেট। আর অদ্ভুত ব্যাপার, নীল ধাতব চোখ মেলে সরাসরি তাকিয়ে থাকল মাকড়সা পিনেটের দিকে। পিনেটের মনে হলো ওটার চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণা। তিনি এটাকেও ভর্তা করে ফেললেন জুতো দিয়ে পিষে, চোখের আলো নিভে গেল ওটার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে।

অর মাকড়সাটা বিদ্যুৎ গতিতে ল্যাভেটরি সিস্টার্নের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। পিনেট আবার চিৎকার দিলেন।

তাঁর চিৎকার শুনেই চলে এলো হোটেল মালিক। মনে হলো মজা পেয়েছে লোকটা, চোখ জোড়া নাচছে।

'না, মঁসিয়ে', বলল সে। 'ভয় পাবার কিছু নেই। বছরের এ সময় স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার কারণে ওগুলো প্রায়ই চলে আসে এদিকে। ওগুলো আপনার কোনো ক্ষতি করবে না। সবগুলোই আমার পোষা।'

মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল লোকটা, পিনেটের কানে রীতিমতো অশ্লীল শোনালো, প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সিস্টার্নের আড়াল থেকে উদয় হলো বাদামি আতঙ্ক। পিনেটের চোখ বড় বড় হয়ে গেল অবিশ্বাসে, মাকড়সাটা লোকটার হাতের তালুতে উঠে আসছে। মাকড়সাটার গায়ে টোকা দিল হোটেল মালিক, কুঁকড়ে গেল ওটা। হাতের তালুতে চুপচাপ বসে রইল।

মসিয়ে পিনেট ম্লান এবং বিবর্ণ লোকটাকে 'এক্সকিউজ মি' বলে করিডোরের বেসিনে হাত মুখ ধুলেন। ডাইনিং রুমে ফিরে আসার পর খানিক স্বস্তি বোধ হলো তাঁর, লোকটার হাতে মাকড়সাটাকে দেখতে না পেয়ে পেশিতে ঢিল পড়ল তাঁর।

হোটেলঅলা অদ্ভুত মানুষ হলেও রান্নার হাতটা সত্যি ভালো। ডিনার খেয়ে তৃপ্তি পেলেন পিনেট। ডিনার শেষে হোটেলঅলাকে একসাথে ড্রিঙ্ক করার অফারও দিয়ে বসলেন।

সরাইখানাটা দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে কিনা জানতে চাইলে লোকটা বলল, 'না। আমরা বেশিদিন কোথাও থাকি না আমি এবং আমার স্ত্রী।'

এ বিষয় নিয়ে আর কথা বলার আগ্রহ অনুভব করলেন না পিনেট। ঠিক করলেন হোটেলঅলার চার্জ তখনই বুঝিয়ে দেবেন। তিনি হিসেবী মানুষ। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভোরে উঠেই চলে যাবেন।

টাকার বান্ডিলে ঠাসা মানি ব্যাগটা যখন খুললেন পিনেট, ওদিকে তাকিয়ে চোখ চকচক করে উঠল হোটেল মালিকের। লোকটা তার মানিব্যাগের দিকে চেয়ে আছে বুঝতে পেরে পিনেট দ্রুত কয়েকটা অফিসিয়াল চিঠি দিয়ে বান্ডিলগুলো আড়াল করার চেষ্টা করলেন। তাতে কোনো লাভ হলো না। উল্টো আরো ফুলে উঠল মানিব্যাগ।

মানিব্যাগের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে হোটেলঅলা বলল, 'এবার বেশ কামিয়েছেন মঁসিয়ে' কোনো প্রশ্ন নয়, বিকৃতির মতো শোনাল কথাটা। পিনেট দ্রুত

BanglaBook.org

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। খানিক পর শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের ব্যাগটা নিয়ে চললেন দোতলায় শোবার ঘরে।

করিডোরে কার্পেট বিছানো, কয়েকটা টেবিলও পাতা আছে, উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ১২ নম্বর ঘরটা পিনেটের। তিনি মাত্র তালায় চাবি ঢুকিয়েছেন, এমন সময় আলো নিভে গেল। নিচতলায় সুইচ বোর্ড, ওখান থেকেই ইলেক্ট্রিসিটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, দীর্ঘ এক মিনিট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো পিনেটকে। বামদিকে মৃদু খচখচ শব্দে তাঁর কপালে ঘাম ফুটল, তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। একটু পরে সিলিং-এর আলো জ্বলে উঠল। দরজা বন্ধ করে কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি কয়েক সেকেন্ড, ঘর দেখছেন।

ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো, অন্য সময় হলে ঘরের আরাম-আয়েশ ভালোই উপভোগ করতেন পিনেট। কিন্তু এ মুহূর্তে সিটিয়ে আছেন তিনি। দ্রুত কাপড় ছাড়লেন তিনি, ব্যাগ খুলে একটা বই বের করলেন, তারপর ঘরের কোণের বেসিনে গিয়ে দাঁড়ালেন দাঁত মাজতে।

বিছানায় ওঠার আগ মুহূর্তে কার যেন মৃদু পায়ের শব্দ পেলেন পিনেট। প্রবল ইচ্ছে হলো জানালা দিয়ে উঁকি মরে দেখতে তাঁর গাড়িটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা। উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ অস্পষ্ট খচমচ শব্দটা শুনতে পেলেন। সাথে সাথে তাঁর নার্ভগুলো টানটান হয়ে গেল, ধীরে ধীরে মাথা ঘোরালেন তিনি। শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করলেন। ঘড়ির দিকে এক পলক তাকালেন পিনেট। দুটো বাজে। খচমচ শব্দটা আসছে হাতের কোণা থেকে।

হাতের ওই কোণে টেবিল ল্যাম্পের আলো পৌঁছায়নি। এখন ঘরের আলো জ্বালতে হলে দরজার কাছে যেতে হবে পিটেনকে, আর খালি পায়ে কাজটা করার প্রশ্নই উঠে না। তিনি টেবিল ল্যাম্পটাকে কাত করে ধরলেন হাতের দিকে। ওখানে কিছু একটা আছে, তবে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

টেবিলের দিকে হাত বাড়ালেন পিনেট। চশমার জন্য কাজটা করতে তাঁকে ল্যাম্পটাকে খাড়া করতে হলো। আর হাতড়াতে গিয়ে শুনতে পেলেন মৃদু থপ করে একটা শব্দ হয়েছে বিছানার নিচে, কার্পেটে। চশমাটা পড়ে গেছে ওখানে। ঝুঁকলেন তিনি, হাত দুই দূরে চশমাটা, হাত বাড়ালেন চশমা তুলে নিতে।'

ঠিক তখন খচমচ শব্দটা আবার হলো। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন পিনেট। দেখতে পেয়েছেন ছায়া শরীর নিয়ে জিনিসটা কি, যদিও ওটাকে স্বীকার করতে চাইল না মন।

রোমশ একটা জীব, পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম বিষাক্ত মাকড়সা ট্যারানটুলার কথা মনে করিয়ে দিল। গোল সুপ প্লেটের চেয়েও আকারে বড়, টেলিফোন তারের মতোই মোটা পা সিলিং বেয়ে নেমে আসার সময় ওটার পার সাথে দেয়ালে ঘঁষা লেগে কচমচ শব্দ হচ্ছে, গলা থেকে অস্পষ্ট ঘরঘর একটা শব্দও বোধহয় শোনা গেল। এগিয়ে আসছে ওটা, টেবিল ল্যাম্পের আলোয় তীব্র ঘৃণা নিয়ে পিনেট দেখলেন, বাদামি লোমে ভরা মুখটা

BanglaBook.org

অশ্লীলভাবে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। লাঠি বা এ ধরনের কোনো অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন তিনি; তাঁর শুকনো জিভ টাকরায় লেগে আছে, চিৎকার যে করবেন সে অবস্থাও নেই; পাজামা ভিজে গেছে, কপাল থেকে বইছে ঘামের স্রোত। একবার চোখ বুঝলেন তিনি। তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকালেন। আশা করলেন চোখ মেলে দেখবেন আসলে এতোক্ষণ স্রেফ একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। ওসব মাকড়সা-ফাকড়সার কোনো অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু ঠিকই প্রাণীটাকে আরো কাছে আসতে দেখে তাঁর আশা নিভে গেল এক ফুৎকারে। ওটার নীলচে চোখ জোড়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাথরুমে ভর্তা করে দিয়ে আসা জীবনগুলোর মতো। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল ওটা। প্রবল ঘৃণা এবং ভয় নিয়েও বিস্ময়বোধ করলেন পিনেট– চোখ জোড়া যেন অবিকল হোটেলঅলার মতো।

থেমে দাঁড়াল জীবটা, তারপর লাফ মেরে নামল বিছানার ওপর। নাকে বিকট দুর্গন্ধ ঝাপটা মারল পিনেটের, বিশাল মাকড়সাটা ভয় ধরানো খচমচ শব্দ তুলে, লম্বা পা ফেলে উঠে এলো পিটেনের মুখে, তাঁর মুখ এবং চোখ ঢেকে দিলো চটচটে আঠালো শরীরে। মুখ হাঁ করে একের পর এক চিৎকার দিতে শুরু করলেন মঁসিয়ে পিনেট।

'অদ্ভুত একটা কেস', মঁসিয়ে পিনেটের ঘরের বেসিনে হাত ধোঁয়ার সময় বললেন ডাক্তার। 'ওনার হার্টের অবস্থা ভালোই ছিল, তবে আকস্মিক কোনো শকে মারা গেছেন। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে একটা ইনকোয়ারির দরকার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি।

হোটেলঅলার বউ দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, ভীরু পায়ে নেমে এলো নিচে।

নিচের বারে দাঁড়িয়ে হোটেলঅলা মুচকি মুচকি হাসছিল। সে টাকার মোটা একটা বান্ডিল ঢোকাল কাউন্টারের নিচে।

ওপরের ঘরে, ছোট, বাদামি রঙের একটা মাকড়সা, এক ইঞ্চির আটভাগের একভাগ হবে লম্বায়, মৃত লোকটির কপালের ওপর ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডাক্তার এক ঝটকায় লাশের ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন ওটাকে।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সমুদ্রের প্রেতাত্মারা

মাইকেল

ও

মলি হার্ডউইক

কুসংস্কার নাবিকদের নিত্যসঙ্গী। আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থেকে সমুদ্রের মাঝে নির্জন দ্বীনের মতো জাহাজে তাদের দিনের পর দিন কাটাতে হয়। সৈন্যদেরকেও হয়তোবা এরকম কঠিন সময় কাটাতে হয়। কিন্তু নিত্যনতুন অতিপ্রাকৃত গল্প নাবিকদের মগজে ঠাসা থাকে। আর তা তারা দিব্যি বিশ্বাসও করে থাকে। সমুদ্রের কুয়াশা আর নীল চাঁদোয়া এই আলো আঁধারির খেলায় তাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হতো। তারপর তারা যখন বহুদিন সমুদ্রে কাটিয়ে ডাঙার কোনো রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিত তখনই সেইসব ভুতুড়ে আর তার সাথে রঙ লাগিয় রগরগে গল্প তৈরি হতো। কিন্তু ওসব গল্পের সবটাই কি গল্প। তবে আর যাই হোক অন্তত ফ্লাইং ডাচম্যান নামের চরিত্রটি সমুদ্রের নাবিক বা যাত্রীদের কাউকে না কাউকে আতঙ্কিত করে তুলবেই।

প্রায় তিনশ' বছর আগে কর্নেলিয়াস ভ্যানডারডেকেন বেটাভিয়া থেকে হল্যান্ডের উদ্দেশে তার তরি ভাসালেন। ক্যাপ্টেন ভ্যানডারডেকেন তার নিষ্ঠুরতা আর একই সাথে নাস্তিকতার জন্য সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। একসময় তার জাহাজ কেপ অব গুড হোপে পৌছলো। কিন্তু ওখানে জাহাজ ভিড়তেই ভীষণ ঝড় হাওয়ার সম্মুখীন হলো। প্রায় নয় সপ্তাহ ধরে ভ্যানডার ডেকেন আর তার নাবিকরা প্রাণপণ চেষ্টা করে গেল। কিন্তু ঝড়ের তীব্রতা মোটেও কমল না আর সেই সাথে বেড়ে গেল নাবিকদের দুর্গতি।

কথিত আছে, ভ্যানডারডেকেনের অবিশ্বস্ততা আর অনমনীয়তাই তাদের সেই বিপর্যয়ের কারণ। ক্যাপ্টেন ডেক হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে কঠিন শপথ নেয় যে, কেয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এই অঞ্চলটিকে প্রদক্ষিণ করে চলবে।

এক অদৃশ্য শক্তি যেন তার কথা শুনতে পেরেছিল এবং বাতাসের গতি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু ভ্যানডারডেকেনের কর্ণবিদারী অভিশাপাত বাণী ঝড়ো বাতাসের সেই শব্দকেও হার মানাল। ডেকে পা ঠুকে ঠুকে সে ঈশ্বর বিরোধী গান গাইতে লাগল। রাতের অন্ধকার ভেদ করে তখন একটি উজ্জ্বল আলো দূর আকাশে দেখা দিলো।

BanglaBook.org

আলোটি এক দ্যুতিময় মূর্তি আকার ধারণ করল। মূর্তিটি ধীরে ধীরে জাহাজের উঁচু পাটাতনে এসে দাঁড়াল। নাবিকরা সব হাঁটু ভেঙে বসল, প্রার্থনা করল। কেউ কেউ মূর্তিটাকে দেবদূত মনে করল, আবার অনেকে সেটিকে পবিত্র আত্মা হিসেবে নিল। কিন্তু ভ্যানডারডেকেন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মূর্তিটিকে ক্রমাগত অভিশাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু তারপরও ক্যাপ্টেনের মন ভরল না। সে এমন একটি হীন কাজ করে বসল। যা কেউ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারবে না। সে মূর্তিটিকে হঠাৎ গুলি করে বসলো এবং তাকে জাহাজ ছেড়ে তৎক্ষণাৎ চলে যেতে বলল।

গুলির আঘাতে মূর্তিটির কিছুই হলো না। মূর্তিটি অবশেষে মুখ খুলল। 'ক্যাপ্টেন ভ্যানডারডেকেন তুমি শপথ নিয়েছিলে, প্রয়োজনে কেয়ামত পর্যন্ত জাহাজ চালিয়ে যাবে। একমাত্র একজন নাস্তিকই এ ধরনের কথা বলতে পারে। ঠিক আছে, তুমি না পারবে খেতে, না পারবে পান করতে। তোমার ঘুমও কেড়ে নেয়া হবে। আর কোনোদিন তুমি তোমার স্বদেশের বন্দরে ফিরে যেতে পারবে না।

সাত সমুদ্র তুমি শুধু জাহাজ চালিয়েই যাবে। আর যারা সমুদ্র যাত্রায় তোমার দর্শন পাবে। তাদের কাছে তা অশুভ পূর্বলক্ষণ বলেই বিবেচিত হবে। ক্যাপ্টেন ভ্যানডারডেকেন ঈশ্বর কোনোদিন মিথ্যা বলেন না।' সেই রাত্রি থেকেই সমুদ্র যাত্রীরা– যারা কেপ হরন, কেপ অব গুড হোপ অথবা আরো দক্ষিণে যাত্রা করতেন তারা হঠাৎ সমুদ্রের বুকে ভৌতিক জাহাজ দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। 'বাসন্তি' নামে একটি জাহাজের যাত্রীরা ১৮৮১ সালে মেলবোর্ন সিডনী যাওয়া অবস্থায় অশুভ জাহাজটিকে দেখতে পান। ঐ জাহাজের যাত্রী রাজা পঞ্চম জর্জ এবং তার সঙ্গীরা এ সম্পর্কে একটি বিশদ বিবরণ জাহাজের লগবুকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

'ফ্লাইং ডাচম্যান আমাদের জাহাজটিকে অতিক্রম করে গেল। জাহাজটিকে প্রথমে একটি লাল বাতির মতো কিছু একটা মনে হচ্ছিল। খেয়াল করে দেখলাম বাতির মাঝে দু'শ' গজ চওড়া একটি যান শোভা পাচ্ছিল। জাহাজটির সামনে যেতেই তেমন কিছু চোখে পড়ল না। রাতটি ছিল পরিষ্কার এবং সমুদ্রও শান্ত ছিল। মোট তেরো জন যাত্রী এ দৃশ্য অবলোকন করছিল।'

সেসব প্রত্যক্ষদর্শীর একজন যে প্রথম সেই ভুতুড়ে জাহাজটিকে দেখেছিল। সে মাস্তুলের কাছ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মারা যায়। পরের বন্দরে বাসন্তির আরেকজন যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে।

১৯১১ সালে তিনি শিকারি একটি জাহজ 'অরনি বেলি' অনুরূপ একটি ভৌতিক জলযানের সন্ধান পেয়েছিল।

একই সময়ে, অপর একজন ভৌতিক ডাচম্যানের বর্ণনা সমুদ্রযাত্রীরা দিয়ে গেছেন– যার নাম হলো ক্যাপ্টেন বানার্ড ফোক। বানার্ড ফোক একজন বুদ্ধিমান কিন্তু তার নামে কুখ্যাতি ছিল যে তিনি শয়তানের দোসর ছিলেন। এই লোকটির জাহাজও একদিন সমুদ্রের বুকে হারিয়ে যায়। ধারণা করা হয়, এই জাহাজের ক্যাপটেনকেও ঈশ্বর চিরকালের জন্য সমুদ্র পাড়ি দেবার শাস্তি দিয়েছিলেন।

BanglaBook.org

'দ্য গালফ অব সেন্ট লরেন্সকেও' সমুদ্র যাত্রীরা ভুতুড়ে জাহাজের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিল। কুইবেক আর নিউফাউন্ডল্যান্ডের মাঝেই চলাচল করত দ্য গালফ অব সেন্ট লরেন্স। কুইন এ্যানি ফরাসিদের এই নৌজাহাজ সম্বলিত নৌবহরকে দমন করতে কিছু জাহাজ পাঠিয়েছিলেন। জাহাজটি অবশেষে 'গ্যাম্পবের' সন্নিকটে 'ক্যাপ ডি এসপয়্যারের' চূড়ার কাছে নিমজ্জিত হয়। প্রতিবছরের যে দিনটিতে জাহাজটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়, সেই দিনটিতে জাহাজটিকে আবার ভেসে উঠতে দেখা যেত। জাহাজের ডেকগুলোতে বিশেষ টুপি পরিহিত আর লাল কোট পরা সৈন্যদের সমাবেশ দেখা যেত। জাহাজের বন্দরগুলো আলোকসজ্জায় আলোকিত থাকত। কিন্তু জাহাজের উজ্জ্বল আলো যখন আস্তে আস্তে নিভে যেত, জাহাজটিও তখন ক্রমেই সমুদ্রের জলে তলিয়ে যেত।

গালপ অব সেন্ট লরেন্সের এতো 'প্যাকেট লাইনও' শত্রুদের কবলে পড়েছিল। আর ভাগ্যে জুটেছিল একই পরিণতি। পরবর্তীতে এই জাহাজটিকে আলোর গোলার আকারে সমুদ্রের মাঝে দেখা যেত।

তবে সমুদ্রের সব ভৌতিক জাহাজই যে নাবিক বা যাত্রীদের জন্য অশুভ। এর উজ্জ্বল প্রমাণ রয়েছে 'সোসাইটি' জাহাজের বেলায়। এই জাহাজটির ক্যাপ্টেন ১৬৬৪ সালের কোনো এক সময় আমেরিকার পূর্ব উপকূল ধরে ভার্জিনিয়া যাবার জন্য যাত্রা শুরু করলেন। ক্যাপ্টেন যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ঠিক তখনই কে যেন তাঁর কাঁধ ঝাঁকালেন এবং ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করলেন 'ওঠো ক্যাপ্টেন ওঠো, দেখো কি হয়েছে'। ক্যাপ্টেন পড়িমরি করে উঠলেন। কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেলেন না। তারপরও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্যান্য নাবিকের মতোই ব্যাপারটিকে অলৌকিক কিছু মনে করে ঘুমাতে গেলেন। দ্বিতীয়বার আবার কে যেন তাকে ঘুম থেকে ডেকে সতর্ক করে দিল। এবারও ক্যাপ্টেন এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে তেমন কোনো বিপদের গন্ধ পেলেন না। তাছাড়া সোসাইটি তখন নিকটস্থ তীর থেকে প্রায় তিনশ' মাইল দূরে। অন্য কোনো আইসবার্গ বা জলজ পর্বতেরও কোনো দেখা তিনি পেলেন না। কিন্তু তারপরও তৃতীয়বারের মতো সেই অদৃশ্য শক্তি ক্যাপ্টেনকে সতর্ক করে দিল– 'ডেকে যাও ক্যাপ্টেন, সবকিছু ভালোমতো পর্যবেক্ষণ কর।' ক্যাপ্টেন ডেকে এসে পানির উচ্চতা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ জাহাজের নোঙর ফেলতে বললেন। ভোর হলে দেখা গেল, জাহাজটি আসলে উপকূলবর্তী অঞ্চলে রয়েছে। কেপ অব ভার্জিনিয়ার এ অঞ্চলটিতে সমুদ্রের গভীরতা একেবারেই কম। সেই ভুতুড়ে আগন্তুক বারবার ক্যাপ্টেনকে সাবধান না করে দিলে সেদিন সোসাইটি ভয়ানক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতো।

আরেকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন জোসুয়া (স্লোকাম)। তিনি একজন পুরনো পেশাদার নৌ বিশারদ ছিলেন। ডেকের সামান্য কর্মচারী থেকে জসুয়া একজন সুদক্ষ নাবিকের মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন।

কিন্তু জোসুয়ার জাহাজটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তাকে বাধ্য হয়েই বোস্টন শিপইয়ার্ডে দু'বছর কাজ করতে হয়। ১৮৯২ সালের দিকে তিমির জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন তাকে একটি পুরনো 'স্প্রে' নামের জাহাজ উপহার দেন। প্রায় তের সপ্তাহ সময় নিয়ে জোসুয়া

BanglaBook.org

জাহাজটিতে আমূল পরিবর্তন আনলেন। যদিও জাহাজটিতে তারপরও ছোট-খাটো অসুবিধা লেগেই ছিল। ১৮৯৫ সালের ১লা জুলাই স্লোকাম ম্যাসাচুসেটসের ইয়ামাউথ থেকে পৃথিবী ভ্রমণে বের হলেন।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য জোসুয়া স্লোকাম সাথে কোনো ক্রু এমনকি সফরসঙ্গীও নিলেন না। জোসুয়া যখন জাহাজ চালাতেন তখন মজা করে একটি কাল্পনিক হাতকে প্রশ্ন করতেন 'কি ব্যাপার কেমন চলছে' আবার নিজেই উত্তর দিতেন 'সব ঠিক আছে স্যার'।

এসব কিছু আসলে জোসুয়া নিজেকে চাঙা রাখার জন্যই করতেন। তবে যাত্রাপথে জোসুয়া একেবারেই যে নিঃসঙ্গ ছিলেন তা কিন্তু ঠিক নয়। ফায়াল দ্বীপের এজোর নামক স্থানের লোকজন জোসুয়াকে উষ্ণ অভিনন্দন জানালো। এমনকি সেখানকার একজন রমণী জোসুয়ার সফরকারী হিসেবে তাকে রন্ধন কার্যে সহায়তা করার প্রস্তাব দিলে তিনি তা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে দ্বীপবাসীদের দেয়া অফুরন্ত খাবার সাথে নিতে জোসুয়া ভুললেন না।

জাহাজে বসে ক্যাপ্টেন শুধু খাওয়া দাওয়াই করতেন, কাজ তেমন করতেন না। একসময় তার ভয়ানক পেটের পীড়া দেখা দিল। যন্ত্রণায় জোসুয়া কাতর হয়ে ডেকে শুয়ে রইলেন। একটু সুস্থবোধ করলে জাহাজটিকে কোনো মতে চালিয়ে নিতে লাগলেন। একসময় যন্ত্রণা এতো বেড়ে গেল যে জোসুয়া অজ্ঞান হয়ে বেশকিছু সময় কেবিনে পড়ে থাকলেন।

একসময় জ্ঞান ফিরলে জোসুয়া দেখল জাহাজটি কর্কের মতো পানিতে উঠানামা করছে। উপায় নেই, এ অবস্থায় তাকেই জাহাজের হাল ধরতে হবে। কিন্তু গড়িয়ে গড়িয়ে ডেকে এসে সে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। বিচিত্র এক পোশাক পরে একজন লম্বা লোক জাহাজের হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আগন্তুকটি তার মাথার টুপিটি খুলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তার পরিচয় দিল। আগন্তুক জানাল ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কলম্বাস স্পেন থেকে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেদিনের নৌবহরে সে 'পিন্টা' নামে একটি জাহাজের চালক ছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি কলম্বাস প্রায় চারশ' বছর আগে সেই সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন যার কথা আগন্তুক বলছে। যাই হোক আগন্তুককে আগামী সকাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়ে ক্যাপ্টেন সেদিন অতিকষ্টে কেবিনে প্রত্যাবর্তন করলেন। পরবর্তীতে জোসুয়া স্লোকামকে আর খোঁজ পেতে হয়নি। তিনি নির্বিঘ্নে জিব্রাল্টারে পৌঁছে দিলেন।

একই রকম অভিজ্ঞতা লিভারপুলের ক্যাপ্টেন জোহানসেন ও ১৯০০ সালের দিকে অর্জন করেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ও তার চৌদ্দ বছরের ছেলেটি জিব্রালটার থেকে আমেরিকার উদ্দেশে দুঃসাহসিক যাত্রায় সামিল হয়েছিলেন। তাদের ছোট নৌযানটির নাম ছিল লোট্টা। প্রথম আট দিন তারা বেশ শান্তিতেই কাটালেন। অষ্টম দিনের সকালে যখন বাপ-বেটা রোদ পোহাচ্ছিলেন তখন বেশকিছু অদ্ভুত ধ্বনি তারা শুনতে পেল। কিন্তু শব্দগুলোর মানে বা উৎস কিছুই তারা নিরিখ করতে পারল না। দুদিন পর সাগর অশান্ত

BanglaBook.org

হয়ে উঠল। কিশোর জোহানসেন শক্ত হাতে হাল ধরল। বাবা চেঁচিয়ে উঠল 'পালের কাপড়টা ফেলে দাও'। কিন্তু বাবার কথা শুনতে গিয়ে কিশোর জোহানসেন হালটা ছেড়ে দিল। অমনি নৌযানটি সমুদ্রের পানিতে ঘুরপাক খেতে লাগল। কিন্তু চারজন ভৌতিক ছায়ামূর্তি সে সময় আবির্ভূত হয়ে নৌযানটিকে সামাল দিল। ভৌতিক ছায়ামূর্তিগুলো অদ্ভুত পোশাক পরে ছিল আর তাদের বাম পায়ের স্থলে একটি লোহার দণ্ড শোভা পাচ্ছিল। অবস্থা নিরাপদ মনে করে, বাপ-বেটা বিশ্রাম নিতে গেলেন। ঘুম থেকে উঠে দেখেন ছায়ামূর্তিরা চলে গেছে। পরদিন রাতে ছায়ামূর্তিগুলো আবার ফিরে এলো। এবার তারা নতুন করে সংকেত দেওয়া শুরু করল। ক্যাপ্টেন জোহানসেন ওদের ভার নৌযানটি সইতে পারবে না মনে করে তার ছেলেকে বললেন ওদের সরে যেতে। কিন্তু কিশোর জোহানসেন ওদের দিকে এগুতেই ছায়ামূর্তিগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। জোহানসেন ১৯০০ সালের ৩০ আগস্টে ঘটে যাওয়া এই অলৌকিক কাহিনীগুলোকে সত্য কাহিনী হিসেবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন সমুদ্রযাত্রার সাথে জড়িত আরো একটি ঘটনা রয়েছে যা কিনা সত্যিই চমকপ্রদ। দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে সাবমেরিন কমান্ডারদের মধ্যে রায়ান ছিলেন সবচাইতে জনপ্রিয়। জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় এই চরিত্র একদিন যখন তার সাবমেরিনসহ ডেনমার্কের উপকূল পাহারা দিয়ে আর ফিরলেন না সবাই তখন সত্যিই খুব কষ্ট পেলেন।

অবশেষে অপর একটি সাবমেরিন কমান্ডার রায়ানের খোঁজে বের হল। সাবমেরিনটি জার্মান সৈন্যদের ভয়ে দিনে সমুদ্রের নিচে আর রাতে সমুদ্রের উপর ভেসে চলত। এভাবে এগুতে এগুতে একদিন সাবমেরিনের সেকেন্ড অফিসার পেরিস্কোপে রায়ানকে উন্মত্তের মতো সাঁতরানো অবস্থায় ওদিকে আসতে দেখলেন। কমান্ডার তৎক্ষণাৎ তার বন্ধুকে উদ্ধারের নির্দেশ দিলেন। লাইফবয়গুলো ছুঁড়ে দেয়া হলো। অথচ কি আশ্চর্য রায়ানের কোনো হদিস মিলল না। কিন্তু সেকেন্ড অফিসার বললেন, 'আমি স্বচক্ষে রায়ানকে দেখেছি, এর মাঝে কোনো ভুল হতে পারে না। আর ও সময়ে রায়ানকে মোটেও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল না। সুতরাং সে যে ডুবে যাবে তাও হবার নয়।' কিন্তু সাগরের মাঝে ভালো মতো খোঁজার পরও যখন রায়ানকে পাওয়া গেল না তখন কমান্ডার সাবমেরিনটিকে এগুতে বললেন। ঠিক সে সময় তাদের সম্মুখভাগে একজোড়া মাইন দেখতে পাওয়া গেল। রায়ানকে খুঁজতে যদি তারা এ পথে না আসত তাহলে সাবমেরিনটির দৃশ্য কি হতো তা ভাবাই যায় না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'মনোন গাহেলা' মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই জাহাজের পে-মাস্টার বা বেতনদাতা বেশ সমুদ্রে লোক ছিলেন। লাল দাড়িওয়ালা এই একচোখা লোকটি এতোই মাদকাসক্ত ছিলেন যে সেজন্য তাকে প্রাণও দিতে হয়েছিল। মরার সময় সে ডেকে শুয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, 'বন্ধুরা আমি তোমাদের ভালোবাসি। আর এই জাহাজটিও আমার খুব প্রিয়। জাহাজের দু'নম্বর কেবিনে একদিন ঠিকই আমাকে ফিরে পাবে।'

BanglaBook.org

পরবর্তী তিনটি সফরে জাহাজের নাবিকরা কুসংস্কার বশত দু'নম্বর কেবনটি খালি রেখেছিল। এরপর একজন সহকারী পে-মাস্টার যখন জাহাজটিতে যোগদান করলেন, তিনি সেসব কুসংস্কারের তোয়াক্কা না করেই দু'নম্বর কেবিনে উঠলেন। দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্রসীমা থেকে এপ্রিল মাসের কোনো এক রাতে যখন মনোন গাহেলা ফিরছিল ঠিক সে সময় নাবিকরা দু'নম্বর কেবিন থেকে ভয়ানক আত্মচিৎকার শুনতে পেল। দু'নম্বর কেবিনের সামনে ভিড় জমে গেল। শঙ্কিত সহকারী পে মাস্টার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'লাল দাড়িওয়ালা আর একচোখা লোকের লাশ বিছানায় দেখতে পেলাম।' লোকটার দাড়িতে সামুদ্রিক আগাছা লেগে ছিল। লোকজন সারা কেবিন খুঁজেও কোনো মৃতদেহ পেল না। তবে সহকারী পে-মাস্টারের বিছানার চাদরটি ভেজা অবস্থায় উদ্ধার করা হলো। আর সেখানে কিছু সামুদ্রিক আগাছার নমুনাও খুঁজে পেল।

তবে সমুদ্রের সব ভৌতিক কাহিনীর নায়ক যেসব নাবিক তারা কিন্তু সবাই সাধারণ সমুদ্রযাত্রী অথবা নৌবাহিনীর অফিসার ছিলেন। তাহলে বিখ্যাত নৌ এডমিরাল যেমন নেলসন, হোওই, কলিংউড, রডনি, বেনঘো অথবা ব্লেক তাদের বেলায় অনেকেই বলেন, নেলসনের আত্মাকে তারা সামারসেট হার্ডসের চতুর্ভুজ চত্বর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন। তারপর ছায়ামূর্তিটি এডমিনালের অফিসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এই প্রেতাত্মাগুলো কখনোই যুদ্ধের সময় অথবা বিজয়ের মুহূর্তে ব্রিটেনের নাবিকদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তবে এক্ষেত্রে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেককে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম বলতে হবে। যদিও ড্রেকের কোনো প্রেতাত্মা কেউ কখনো দেখতে পায়নি। কিন্তু তার রণভেরি ঠিকই শোনা যেত। কথিত আছে, ব্রিটেনের সেনারা যখনই বিপদে পড়তো তখনই তার 'ড্রাম অব স্টেট' বেজে উঠতো সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিতে। অনেক সময় সেটি আপনা-আপনি বেজে উঠত সৈন্যদের চাঙা করতে। শেষ যেবার সেটি শোনা যায় তাহলো ১৯১৯ সালের ২১শে জুন। সে সময়টি ছিল সন্ধ্যাপা স্রোতে জার্মানির সমুদ্র বহরের আত্মসমর্পণের ক্ষণ। ড্রেক সম্পর্কে আরো অনেক গল্প আছে। ডাটমুরের এক বিরাট দুর্গময় বাড়িতে ড্রেকের প্রেতাত্মাকে দেখা যেত। পরে ঐ বাড়িটির আঙিনায় একজন বড়সড় মানুষের কংকাল আবিষ্কৃত হয় যার পাশে কিনা এলিজাবেথ আমলের ঘড়ি পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা গেল এই মৃতদেহটি ছিল ড্রেকের অধীনস্থ একজন সাহসী নাবিকের।

আসলেও সমুদ্র যেন এক ভূতের আস্তানা। তীর থেকে অনেক দূরে, গা ছম ছম অন্ধকার রাতে কিংবা চাঁদের মায়াবি ছটায় সমুদ্রের অদ্ভুত নিরবতার মাঝে যেন এক অতীন্দ্রিয় জগত গড়ে ওঠে। অন্তত সমুদ্রের মানুষেরা সেই আভাস দিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে।

ফ্যাক্টস মেইলর অ্যান্ড শিপস **অনুবাদ : আবদুল্লাহ শাহরিয়ার টুটুল**

BanglaBook.org

বানরের থাবা

ডবল্যু. ডবল্যু. জেকবস

তীব্র শীতের রাত। ল্যাবারনাম ভিলার দরজা-জানালা বন্ধ। আগুনের পাশে বসে দাবা খেলছে পিতা-পুত্র। রাজার মারাত্মক এক ভুল চাল দিয়ে মনে মনে জিভ কামড়ালেন মি. হোয়াইট। পুত্র যাতে চালটা খেয়াল না করে সেজন্য বললেন, 'বাইরে কি তীব্র বাতাস।'

হারবার্ট কিন্তু ঠিকই খেয়াল করল ভুল চালটা। বলল, 'হ্যাঁ, চেক।'

'আজ বোধ হয় আর আসবে না ও', বোর্ডের ওপর হাত রেখে বললেন বাবা।

'মাত।' জবাব দিল ছেলে।

আগুনের ওপাশে বসে থাকা বৃদ্ধা উল বুনতে বুনতে দেখছিলেন পিতা-পুত্রের খেলা। 'আফসোস কর না', বললেন তিনি, 'পরের বার হয়তো তুমি জিতবে।'

কড়া নাড়ার শব্দ হল দরজায়।

'ওই এসেছে।' তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিলেন মি. হোয়াইট। একজন লম্বা, মোটা লোক ভেতরে ঢুকলেন। ছোট ছোট চকচকে চোখ। লাল টকটকে মুখ।

'সার্জেন্ট-মেজর মরিস।' নিজের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক।

সবার সাথে হাত মিলিয়ে আগুনের পাশে বসে পড়লেন তিনি। হুইস্কি, পানপাত্র এনে টেবিলে রাখলেন হোয়াইট। আবার ছোট একটা কেতলি চাপালেন আগুনে।

তৃতীয় গ্লাস শেষ হতে চোখ বড় বড় করে গল্প ধরলেন মি. মরিস। বনজঙ্গল, যুদ্ধবিগ্রহ, প্লেগ এবং নানা জাতের মানুষের নানা আশ্চর্য আশ্চর্য সব গল্প বলতে লাগলেন। আগ্রহের সাথে শুনতে লাগল ছোট্ট পরিবারটা।

'একুশ বছর আগে যখন পালিয়েছিল,' স্ত্রী এবং পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন হোয়াইট, 'মরিস তখন যুবক। এখন দেখ সে কেমন হয়েছে।'

'কেন, অস্বাভাবিক কিছু তো দেখছি না আমি', বললেন মিসেস হোয়াইট।

'বুঝলে মরিস', বললেন বৃদ্ধ, 'ভারত ভ্রমণ করার খুব সখ আমার। একবার ঘুরেফিরে দেখতে চাই শুধু।'

'থাক। এই বুড়ো বয়সে, আর শখ জাগিয়ে তুলো না।' হুইস্কির গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন না মরিস।

'ভারতের পুরানো মন্দির, ভোজবাজিকর আর তান্ত্রিকদের দেখার খুব সখ আমার।' আচ্ছা মরিস, তুমি সেদিন কি একটা বানরের থাবা সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে?'

BanglaBook.org

'সব কিছুতেই কান দাও তুমি। ওটা তেমন কিছু না।'

'বানরের থাবা?' আগ্রহে মিসেস হোয়াইটের গলায়।

'হ্যাঁ, যাদু বলতে পারেন ব্যাপারটাকে।'

স্বামী-স্ত্রী-পুত্র তিন জনই ঝুঁকে এলো সামনে। অন্যমনস্কভাবে শূন্য গ্লাস মুখে তুলে আবার নামিয়ে রাখলেন অতিথি। হুইস্কি ঢেলে দিলেন হোয়াইট।

'দেখেন তাহলে', পকেটে হাত ঢোকালেন মি. মরিস, 'খুব সাধারণ একটা থাবা। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

পকেট থেকে কিছু একটা বের করে এগিয়ে দিলেন সার্জেন্ট-মেজর। নাক সিটকে পিছু হাটলেন মিসেস হোয়াইট। কিন্তু হারবার্ট নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল জিনিসটা।

'এর মধ্যে দেখবার মতো কি আছে?' হারবার্টের হাত থেকে থাবাটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন হোয়াইট। তারপর টেবিলের ওপর রাখলেন।

'এক তান্ত্রিকের সাধনার ফল এটা। এই থাবা প্রমাণ করে দিতে পারে, ভাগ্যের প্রভাব মানুষের ওপর আছে। থাবাটার কাছে তিনজন লোক, প্রত্যেকে তিনটে করে জিনিস চাইতে পারবে। যাই চাওয়া হোক, পেয়ে যাবে সে।

'আপনি কি কিছু চেয়েছিলেন?' হারবার্টের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ।' বলেই চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর।

'আপনার ইচ্ছেগুলো কি সত্যি পূরণ হয়েছিল?' এবার মিসেস হোয়াইট।

'হ্যাঁ।'

'আর কেউ কিছু চায়নি?'

যে লোক প্রথমে এই থাবাটা পায় সে তিনটে জিনিস চায়। প্রথম ও দ্বিতীয়বারে কি চেয়েছিল জানি না। তবে তৃতীয়বারে চেয়েছিল– মৃত্যু। তার কাছ থেকেই আমি থাবাটা পাই।'

'যদি তিনটা জিনিস তুমি ইতোমধ্যে চেয়ে থাক তাহলে এটা তোমার কাছে রাখা না রাখা সমান। তবু কেন তুমি এটা রেখেছ?' বললেন হোয়াইট।

'এমনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে বিক্রি করে দিই। কিন্তু কে নেবে? সবাই ভাবে আমি আষাড়ে গল্প করছি। যদি কেউ নিতে চায়ও, আগে পরখ করে পরে দাম দিতে চায়।' থাবাটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেটা আগুনে ছুঁড়ে ফেললেন মরিস।

চিৎকার করে উঠলেন হোয়াইট। তাড়াতাড়ি আগুন থেকে তুললেন থাবাটা।

'ওটাকে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।'

'মরিস, তোমার যদি কোনো দরকার না থাকে তাহলে আমাকে দিয়ে দাও থাবাটা।'

'না', রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন সার্জেন্ট মেজর। 'আমার কোনো দরকার নেই।' থাকলে কি আর আগুনে ফেলে দিতাম? ওটাকে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো। ইচ্ছে করলে রাখতে পার, কিন্তু কিছু ঘটে গেলে, পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। তার চেয়ে বুদ্ধিমানের মতো আগুনে ফেলে দাও ওটা।'

BanglaBook.org

মাথা নাড়লেন হোয়াইট। থাবাটা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'কেমনভাবে কি করতে হয় বলো তো?'

'ডানহাতে থাবাটা উঁচু করে ধরে চিৎকার করে তোমার যা চাওয়ার চাইবে। কিন্তু, আবার বলছি, পরিণাম কিন্তু ভালো হবে না।'

'আরব্য উপন্যাসের মতো মনে হচ্ছে', বললেন মিসেস হোয়াইট। উঠে টেবিলে খাবার সাজাতে লাগলেন তিনি। স্বামীর দিকে তাকালেন, 'আমার জন্য চার জোড়া হাত চাওয়া উচিত তোমার।'

পকেট থেকে থাবাটা বের করলেন হোয়াইট। খপ করে তার একটা হাত চেপে ধরলেন সার্জেন্ট মেজর, 'তোমার যদি সত্যিই কিছু চাওয়ার থাকে তাহলে স্বাভাবিক কিছু চেয়।'

হো-হো করে হেসে উঠল তিনজন।

থাবাটা আবার পকেটে রেখে দিলেন হোয়াইট। নৈশভোজ শুরু হলো। নৈশভোজের পর মরিস আরেক দফা চালালেন তাঁর ভারত ভ্রমণের গল্প।

'বানরের থাবার গল্পটা যদি গাঁজাখুরি হয় তাহলে ওটা দিয়ে আমাদের কিছু লাভ হবে না,' মরিস বিদায় হবার সাথে সাথেই বলল হারবার্ট।

'এটার জন্য পয়সা-কড়ি কিছু দিয়েছ নাকি?' চোখ সরু করে তাকালেন মিসেস হোয়াইট।

'সামান্য কিছু। আমি জোর করে দিয়েছি, ও নিতে চায়নি। থাবাটা পুড়িয়ে ফেলতে বলল বারবার।'

'যদি এটা কাজ দেয় তাহলে আমরা বড়লোক হয়ে যাব, বিখ্যাত হয়ে যাব। যদি কিছু চাইতেই হয়, সম্রাট হতে চাও, বাবা।'

পকেট থেকে থাবাটা বের করলেন হোয়াইট, 'আসলে কি চাইবে সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন সব পাওয়া এক মানুষ আমি।'

'দুশ' পাউন্ড চাও বাবা।' পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসল হারবার্ট— টোকা দিল কয়েকটা। মিষ্টি, টুংটাং আওয়াজ উঠল।

লজ্জিত একটু হাসি হেসে হাত ওপরে তুললেন হোয়াইট, 'আমি দু'শ পাউন্ড চাই', পরিষ্কার গলায় উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ। তারপরই থাবাটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ওটা নড়ে উঠল! আমার হাতের মধ্যে ওটা নড়ে উঠল সাপের মতো।'

'যাই হোক, একটা পাউন্ডও দেখতে পাচ্ছি না আমি এবং বাজি ধরে বলতে পারি কোনো দিন দেখবও না।' থাবাটা কুড়িয়ে টেবিলে রাখল হারবার্ট।

'নড়ে উঠেছিল, ওটা তোমার মনের ভুল', বললেন মিসেস হোয়াইট।

'হতে পারে। যাক এটা তো কারও কোনো ক্ষতি করল না', কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার সত্যি মনে হলো ওটা যেন নড়ল।'

তিনজন আবার গিয়ে বসল আগুনের পাশে। বাতাসের বেগ বেড়েই চলেছে। কোথায় যেন একটা দরজা খুলছে, আবার দড়াম করে বন্ধ হচ্ছে আপনা-আপনি। সময়

BanglaBook.org

কেটে যাচ্ছে, কেউ কোনো কথা বলছে না। শেষমেষ হোয়াইট আর মিসেস হোয়াইট উঠলেন।

'গিয়ে দেখ, তোমাদের বিছানার মাঝখানে একটা বড় ব্যাগে পাউন্ডগুলো বাঁধা আছে', বলল হারবার্ট।

অন্ধকারে একা নিভু নিভু ফায়ার প্লেসের দিকে চেয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকল। বানরের থাবাটা হাতে নিল একবার। কেমন যেন শির শির করে উঠল গায়ের ভেতর। তাড়াতাড়ি রেখে দিল থাবাটা। শুয়ে পড়ল বিছানায় গিয়ে।

দুই.

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে গত রাতের ভয়ের কথা মনে করে হাসল হারবার্ট। জানালা দিয়ে টেবিলে এসে পড়েছে শীতের নরম সূর্য।

'সব বুড়ো সৈন্যরাই আষাড়ে গল্প করতে ওস্তাদ', বললেন মিসেস, 'আজকালকার দিনে ইচ্ছা পূরণ? পাগলামি আর কাকে বলে?'

'আকাশ থেকে ঝরে ঝরে মাথার ওপর পড়বে বোধহয়', বলল বাচাল হারবার্ট।

'মরিস বলেছে, খুব স্বাভাবিকভাবে পূরণ হয়ে যাবে ইচ্ছেটা।'

'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত টাকাটা খরচ করো না যেন।'

মিসেস হোয়াইট হেসে উঠলেন ছেলের কথায়। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত হারবার্টকে দেখা যায় দেখলেন, তারপর আবার এসে বসলেন টেবিলে। স্বামীকে যাই বলেন না যে, পিয়ন এসে দরজায় টোকা দিতেই তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললেন। মনে আশা, যদি কিছু আসে। দর্জির বিল দিলো পিয়ন।

'এই দর্জির বিল নিয়ে অনেক মজার কথা শোনা যাবে। হারবার্ট আসুক আগে।' দুপুরে খাবার টেবিলে বসে বললেন মহিলা।

'তোমরা টিটকারি মারছ কিন্তু থাবাটা যে আমার হাতের মধ্যে নড়ে উঠেছিল এটা কসম খেয়ে বলতে পারি।'

'ওটা তোমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা।'

'ওটা যে নড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

কিছু বললেন না মহিলা। তিনি তখন বাইরে একটা লোককে দেখছেন।

বাড়িতে ঢুকব কি ঢুকব না চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত টোকাই স্থির করল লোকটা। হঠাৎ করে সেই দু'শ' পাউন্ডের কথা মনে পড়ে গেল মিসেসের। বাইরে লোকটার কাপড়-চোপড়ও ভালো, মাথায় সিল্কের চকচকে নতুন টুপি। তাড়াহুড়ো করে অ্যাপ্রন খুলে ফেলে, উঠে দরজা খুলে দিলেন মহিলা।

লোকটাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন মিসেস হোয়াইট, যা মেয়েদের পক্ষে প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার।

'ম অ্যান্ড মেগিনস থেকে এসেছি আমি।' শেষমেষ মুখ খুলল লোকটা।

BanglaBook.org

ঢোক গিললেন মিসেস হোয়াইট, 'আপনি ম অ্যান্ড মেগিনস থেকে এসেছেন? হারবার্টের কি খবর? ভালো আছে তো ও?'

'তুমি চুপ করো তো।' বাধা দিলেন হোয়াইট, 'আপনি নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ বয়ে আনেননি?'

'আমি দুঃখিত।' বলল আগন্তুক।

'ও কি আহত হয়েছে?' মিসেস হোয়াইটের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তবে কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা আর নেই তার।'

'যাক। বাঁচা গেল। ঈশ্বর দয়াশীল। ধন্যবাদ আপ...।' হঠাৎ কণ্ঠ রোধ হয়ে এলো মিসেস হোয়াইটের। এতক্ষণে আগন্তুকের কথার গুঢ় অর্থ মাথায় ঢুকেছে। একবার তাকালেন স্বামীর দিকে। কাঁপা একটা হাত রাখলেন তাঁর কাঁধে। ঘরের সবাই চুপ।

'মেশিনে পড়ে গিয়েছিল।' অনেকক্ষণ পর নিচু গলায় বলল আগন্তুক।

'মেশিনে পড়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন হোয়াইট। চল্লিশ বছর আগের সেই প্রেমঘন দিনগুলোর মতো স্ত্রীর একটা হাত তুলে নিলেন মুঠোর মধ্যে।

'হারবার্টই আমাদের একমাত্র সন্তান।'

'ফার্ম আপনাদের এই গভীর শোকে সমবেদনা জানিয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। আমি ওদের আজ্ঞা বহন করে এনেছি মাত্র।'

কোনো উত্তর দিলেন না কেউ। কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বৃদ্ধার মুখ। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আগন্তুকের মুখের দিকে।

'ম অ্যান্ড মেগিনস এই মৃত্যুর কোনো দায়-দায়িত্ব নেয়নি। তবে আপনাদের ক্ষতি পূরনের কিছু ব্যবস্থা করেছে।'

স্ত্রীর হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন হোয়াইট, 'কত?'

'দুশ' পাউন্ড।'

মৃদু একটা বিষাদময় হাসি ফুটল বৃদ্ধের ঠোঁটে। অন্ধের মতো দু'হাত বাড়িয়ে টলমল করে দু'পা এগোলেন। সংজ্ঞা হারিয়ে দড়াম করে পড়ে গেলেন মেঝেতে।

তিন.

দু'মাইল দূরে বড় নতুন কবরস্থানটিতে হারবার্টকে কবর দিয়ে ফিরে এলেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সকালে নাস্তা করে কাজে গেল হারবার্ট, দুপুরে খবর এলো...। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল। এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না বুড়ো-বুড়ি। কেবলই মনে হচ্ছে ফিরে আসবে হারবার্ট। এসে বুকের ভার নামিয়ে দেবে। আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ছোট্ট পরিবারটা।

BanglaBook.org

এক এক করে দিন কাটতে লাগল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও তাঁরা বলেন না। ভোর হলে দুপুরের অপেক্ষা করেন, দুপুর হলে রাতের, রাত এলে আবার ভোরের। ভীষণ দীর্ঘ দিনগুলো আর কাটতে চায় না তাঁদের।

সপ্তাহখানেক পর এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মি. হোয়াইটের। হাত বাড়িয়ে অনুভব করতে চাইলেন স্ত্রীকে। কিন্তু পারলেন না, বিছানায় তিনি একা। জানালার কাছ থেকে চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। উঠে বসলেন তিনি।

'জানালার কাছ থেকে সরে এসো, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।'

'আমার হারবার্ট এর চেয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে শুয়ে আছে।' এবার হু হু করে কেঁদে উঠলেন মিসেস হোয়াইট।

ধীরে ধীরে কান্নার শব্দ কমতে কমতে আর কানে এলো না মি. হোয়াইটের। আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন তিনি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন জানেন না, হঠাৎ এক চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

'থাবা, সেই বানরের থাবাটা...'

'কি হয়েছে?'

'তুমি নষ্ট করে ফেলোনি তো ওটা?'

'না। পার্লারে আছে। কিন্তু ওটা দিয়ে কি করবে তুমি?'

পাগলের মতো একবার কাঁদলেন, একবার হাসলেন বৃদ্ধা। তারপর নিচু হয়ে চুমু খেলেন বৃদ্ধের গালে। 'হঠাৎ করে থাবাটার কথা মনে পড়েনি?'

'কি মনে পড়বে?'

'আমাদের আরও দুটো চাওয়ার আছে, আমরা তো শুধু একটা চেয়েছিলাম।'

'একটাই কি যথেষ্ট হয়নি?' তেতে উঠলেন হোয়াইট।

'না। যথেষ্ট হয়নি। এখনই নিয়ে এসো থাবাটা। চাও, আমাদের হারবার্ট আবার ফিরে আসুক।'

'তুমি, তুমি পাগল হয়ে গেছ।'

'থাবাটা আনো।' চিৎকার করে উঠলেন বৃদ্ধা।

'তুমি বুঝছ না। এটা অসম্ভব ব্যাপার।' মোমবাতি জ্বালালেন হোয়াইট।

'আমাদের প্রথম ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। দ্বিতীয়টাও হবে।'

'দেখো, দশ দিন গত হয়েছে।' স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ। 'মানুষ মরার দশ দিন পর তার চেহারা কি তুমি সহ্য করতে পারবে? ওসব বাদ দাও। শান্ত হও।

ওকে ফিরিয়ে আনবে কিনা বলো।' আবার চিৎকার করলেন মহিলা। 'ওসব টালবাহানা বাদ দাও। আমার সন্তানকে আমি সহ্য করতে পারব না!'

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হাতড়ে এগোলেন হোয়াইট। পার্লারের পাশ দিয়ে ম্যান্টেলপিসের কাছে গেলেন। জায়গা মতোই আছে থাবাটা। একবার ভাবলেন, স্ত্রীর ইচ্ছামতো দশ দিনের পচে গলে মাংস খসে পড়া ছেলে যদি সত্যিই হাজির হয় তাহলে

BanglaBook.org

কি ভয়াবহই না হবে ঘটনাটা! শিরশির করে উঠল বৃদ্ধের শরীর। ঘামে ভিজে গেল ভ্রু-জোড়া। বানরের থাবাটা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বৃদ্ধার ফ্যাকাসে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'এবার আমার হারবার্টকে ফিরে চাও।'

'দেখো, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না।'

'চাও বলছি।" ধমকে উঠলেন বৃদ্ধা।

থাবাটা উঁচু করে ধরলেন হোয়াইট। কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'আমি আমার সন্তানকে ফিরে চাই। তারপর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন চেয়ারে। থাবাটা পড়ে গেল মেঝেতে। জানালার পর্দা তুলে বাইরে তাকালেন মিসেস হোয়াইট।

বসে থাকতে থাকতে ঠাণ্ডায় জমে যাবার জোগাড় হলো মি. হোয়াইটের। মিসেস হোয়াইট অনড় দাঁড়িয়ে থাকলেন জানালার পাশে। মোমবাতি পুড়তে পুড়তে শেষ হয়ে নিভে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন হোয়াইট, থাবাটা এবার কোনো কাজ করল না তাহলে!

কেউ কোনো কথা বলল না। ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুধু কানে আসছে। মোমবাতি আনার জন্য একটা ম্যাচ হাতে নিচতলায় গেলেন হোয়াইট। সিঁড়ির নিচে একটা কাঠি নিভে গেল। আরেকটা কেবল ধরাতে যাবেন, টোকার শব্দ হলো সামনের দরজায়। হাত থেকে ম্যাচ পড়ে গেল তাঁর। দৌড়ে ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

আবার টোকার শব্দ হলো।

'কে?' চমকে উঠলেন বৃদ্ধা।

'ইঁদুর। একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল আমার পাশ দিয়ে।'

আবার টোকার শব্দ হলো। এবার জোরে।

'হারবার্ট। নিশ্চয়ই আমার হারবার্ট।'

দরজার দিকে ছুটে গেলেন বৃদ্ধা। পথ রোধ করে দাঁড়ালেন হোয়াইট।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'হারবার্ট এসেছে। আমার হারবার্ট। আমি শুধু ভাবছিলাম, আসতে এতো দেরি হচ্ছে কেন! বাছা যে আমার দু'মাইল দূর থেকে আসছে, কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি আটকাচ্ছ কেন আমাকে? দরজা খুলব। ছাড়ো।'

'এ দুর্বুদ্ধি বাদ দাও।' কাঁপতে কাঁপতে বললেন বৃদ্ধ।

'তুমি নিজের ছেলেকে ভয় পাও? ছাড়ো। আমাকে ছাড়ো বলছি। আমি আসছিরে, হারবার্ট...।'

টোকার পর টোকার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। হঠাৎ এক ঝটকায় নিজেকে ছড়িয়ে দৌড়ে নিচে নেমে গেলেন বৃদ্ধা। একটু পরেই চিৎকার করে উঠলেন, 'ছিটকিনিটা খুলতে পারছি না। তুমি নেমে এসো।'

কিন্তু বৃদ্ধ তখন পাগলের মতো মেঝেতে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন বানরের থাবাটা। ওটা যে পেতেই হবে। এখন টোকার শব্দ জোরাল হয়ে উঠেছে যেন বাড়িটা ভেঙে পড়বে।

BanglaBook.org

ভারি ছিটকিনি নিচে নামার শব্দ হলো খটাস করে। চেয়ারের ওপর উঠে ছিটকিনিটা খুলতে পেরেছেন মিসেস হোয়াইট। ঠিক এই সময় বানরের থাবাটা খুঁজে পেলেন হোয়াইট। কেঁপে উঠল তাঁর সারা দেহ। সময় নষ্ট না করে হাত ওপরে তুলে শেষ চাওয়াটা চাইলেন।

মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল টোকার শব্দ। অথচ টোকার রেশটা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়ি জুড়ে।

নিচতলা থেকে বুকফাটা চিৎকার ভেসে এলো। হতাশার।

ওই চিৎকার সাহস যোগাল বৃদ্ধকে। ছুটে নিচে নেমে গেলেন। দাঁড়ালেন স্ত্রীর পাশে। ঘরের দরজা হাট করে খোলা।

সামনে পড়ে আছে বাতির আলোয় উজ্জ্বল রাস্তা।

শূন্য।

মার্কিজ প' **অনুবাদ : খসরু চৌধুরী**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পূর্ব পুরুষ
মেরী ক্লার্ক

রোজমেরি হার্ট বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছে ম্যান্টলপিসের ওপর ঝোলানো পোর্ট্রেটটির দিকে। বহু বছর ছবিটি চিলেকোঠায় নানির ঘরে ছিল। আজ সকালে রোজমেরির ঘরে আনা হয়েছে ওটা।

নানি মারা গেছেন তাই অন্যান্য অনেক জিনিসের মতো পোর্ট্রেটটিও বংশাধিকার সূত্রে পেয়ে গেলেন রোজমেরির মা।

'এ ছবিটি তোমার প্রপিতামহের।' মিসেস হার্ট বলেছেন মেয়েকে। 'নেবে এটা? তোমার ঘরে টাঙিয়ে রাখবে।'

'সত্যি দেবে আমাকে?' উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে রোজমেরি।

'তাহলে খুব মজা হবে। ওঁকে দারুণ লাগছে আমার। অভিজাত... রাজকীয়।' মা'র দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'তুমিও অবশ্য তাই।'

হেসে উঠলেন মিসেস হার্ট, মেয়ের কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'রাজকীয়-টাজকীয় বুঝি না, তবে উনি ছিলেন আমার প্রপিতামহ। কাজেই চেহারায় মিল থাকতেই পারে। ব্যক্তি জীবনে ওনার মতো হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি। উনি খুব সাহসী ছিলেন, রানী ভিক্টোরিয়ার সময় যুদ্ধ করেছেন।'

'উনি সৈনিক ছিলেন নাকি?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল রোজি। তার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসও আছে। প্রাচীন সময়ের ইতিহাস পড়ার সময় সেই সময়ে যেন চলে যায় ও, নিজেকে ইতিহাসের একটা অংশ মনে হতে থাকে। রানী বা রাজকুমারী জাতীয় কিছু একটা ভাবে রোজমেরি নিজেকে।

'প্রপিতামহ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মারা গেলেন।' বলল ওর মা। 'সাংঘাতিক আহত হয়েও ব্যাটল অব ইঙ্কারম্যান দল নিয়ে গেছেন তিনি। যুদ্ধ করেছেন রাশানদের বিরুদ্ধে। নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবেননি কখনও। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবার আগ পর্যন্ত বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। ইতিহাস বলে, ওই যুদ্ধে জয়ী হবার পেছনে প্রপিতামহের ব্যাপক ভূমিকা ছিল।'

সেদিন সারাক্ষণ নিজের পূর্ব পুরুষের কথা ভাবল রোজমেরি। কিন্তু তাঁকে তো শুধু প্রপিতামহ গ্রেগরি বলে ডাকা যাবে না, সংক্ষিপ্ত একটা নাম দেয়া উচিত। অনেক ভেবে

BanglaBook.org

রোজমেরি ঠিক করল তাঁর পূর্বপুরুষকে শুধু গ্রেগরি নামে ডাকবে। কারণ গ্রেগরি তার কাছে রক্তমাংসের মানুষের মতোই বাস্তব মনে হচ্ছে। যেন ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু।

রাতের বেলা ঘুমুবার সময় বিচিত্র এক অনুভূতি হলো রোজমেরির। আগে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে ঘুমাতে তার খুব ভয় লাগত। মাকে অবশ্য এ কথা কখনো বলেনি রোজি, মা হাসাহাসি করবে বলে। সত্যি তো, দশ বছরের একটা মেয়ে আলো নিভিয়ে ঘুমাতে ভয় পায় শুনলে সবাই হাসবে।

তবে আজ ভয় লাগবে না। মাথার ওপর গ্রেগরির ছবি আছে বলেই হয়তো। যে লোক যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করতে পারেন, তিনি সহজেই তাঁর আত্মীয় ছোট একটি মেয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবেন। কাজেই রোজমেরির ভয় পাবার কিছু নেই। বরং ওকে আরো সাহসী হতে হবে। ভয় পেলে তার পূর্বপুরুষকে লজ্জায় ফেলে দেয়া হবে।

বিছানায় কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে গায়ের চাদর সরিয়ে নিঃশব্দে নেমে পড়ল রোজমেরি, দাঁড়াল জানালার সামনে, পর্দা সরাল। এ ধরনের কাজ আগে কখনো করেনি সে। জানালা সব সময় বন্ধ রেখেছে রোজি। কারণ চাঁদের আলো পড়ে দেয়ালে ভ্যাম্পায়ার আকৃতির যেসব নকশা তৈরি করে, রোজমেরি খুবই ভয় পায়।

জানালা থেকে সরে এলো রোজমেরি। তাকাল পোট্রেটের দিকে। গ্রেগরির চোখ ওকে অনুসরণ করছে। বিছানায় লাফ দিলো রোজমেরি, হাসল পূর্ব পুরুষের দিকে তাকিয়ে।

'গুডনাইট গ্রেগারি।' বলল সে। তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সুইচ টিপে আলো নেভাল রোজমেরি, একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সে রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখল রোজমেরি। তার স্বপ্নে জ্যান্ত হয়ে ছবির ফ্রেম থেকে নেমে এলেন গ্রেগরি। রোজমেরি দেখল দৃশ্যপট বদলে গেছে। সে চলে এসেছে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সেই সময়। গ্রেগরি বিশাল তরবারি নিয়ে বীর বিক্রমে শত্রুর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ লড়াই করা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। আহত হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। রোজমেরি সেগুলোকে ছুটে গেল তাঁর কাছে। তিনি মৃত্যুর আগে বলে গেলেন, 'রোজমেরি সাহসী হও। ভয়ের কিছু নেই।'

রোজমেরি এরপর জেগে গেল। স্বপ্নটাকে তার খুব বাস্তব মনে হতে লাগছে। ভয়ে ভয়ে সে পোট্রেটের দিকে তাকাল। ভেবেছে ওখানে গ্রেগরির ছবির বদলে রাশান কোনো সৈনিককে দেখবে।

না, গ্রেগরি আছেন আগের জায়গাতেই। শান্ত, স্থির ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রোজমেরি। 'তুমি তাহলে এখনো ওখানে আছ। বেশ।'

'সাহসী হও।' পোর্ট্রেটকে বলতে শুনল রোজমেরি।

স্কুলের কাউকে গ্রেগরি সম্পর্কে কিছু বলল না রোজমেরি। ব্যাপারটা গোপন থাকল। তবে গ্রেগরি তার মনে সত্যি সাহস এনে দিলেন। একটা ছোট্ট ঘটনাই এর প্রমাণ।

BanglaBook.org

রোজমেরিদের স্কুলে একটি খেলা খেলতে হয়। প্রথমে বৃত্তাকারে দাঁড়ায় মেয়েরা, একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাঝখানে, ঘোরাতে থাকে একটি রশি, রশির অন্য পাশ চাপা থাকে পাথর দিয়ে। এখন ঘুরন্ত ওই রশি এক লাফে পার হয়ে যেতে হবে। টাইমিংটা এক্ষেত্রে নিখুঁত হওয়া চাই। আর এখানটায় রোজমেরির গড়বড় হয়ে যায়। সে রশি পার হতে গিয়ে প্রতিবার আছাড় খেয়েছে। আর ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে হেসে উঠেছে, সেই সাথে পি. টি. টিচার মিস ব্রিগসের কঠিন ধমক তো আছে।

তবে এবার ঠিক ঠিক রশি পার হয়ে গেল রোজমেরি। সে যখন লাফ দেবে ঠিক করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রেগরির গলা শুনতে পেল, ওকে অভয় দিচ্ছেন তিনি, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলছেন। তারপর বলে উঠলেন, 'এখন! লাফাও!'

লাফ দিলো রোজমেরি এবং চমৎকারভাবে রশি পার হয়ে গেল। মিস ব্রিগস স্বীকার করতে বাধ্য হলেন আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে রোজমেরির। কিন্তু রোজমেরি তো জানে কৃতিত্বটা আসলে কার।

সেদিন স্কুলে লাইব্রেরিতে গিয়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ওপর বই খোঁজ করল রোজমেরি।

'অত কঠিন বই তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না খুকী।' লাইব্রেরিয়ান বলল ওকে। 'সত্যি ওটা নিতে চাও তুমি?'

মাথা দোলাল রোজি। 'জি, চাই। কারণ আমাদের পরিবারের একজন ওই যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তাঁর ছবি আছে আমার কাছে। আমি যুদ্ধটি সম্পর্কে জানতে চাই। টিফিন পিরিয়ডে খেলার মাঠে বসে ইঙ্কারম্যানের যুদ্ধ সম্পর্কিত লেখা সমস্ত তথ্য গোগ্রাসে গিলল রোজমেরি। শিউরে উঠল যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা জেনে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথাও লেখা আছে, উনি যুদ্ধাহত মানুষের সেবা করেছেন। গ্রেগরির সাথে কি ফ্লোরেন্সের সাক্ষাৎ হয়েছিল, ভাবল সে।

রোজমেরি ঠিক করল বড় হয়ে সে নার্স হবে, মানুষের সেবা করবে। কল্পনায় দেখল হাসপাতালে একটি ওয়ার্ড ধরে সে হেঁটে যাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে থাকা রোগীদের কুশল জিজ্ঞেস করছে। তারপর দেখল সম্পূর্ণ সাদা পোশাকে সে চার্চে যাচ্ছে, সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে তরবারি হাতে লম্বা এক সৈনিক, অপেক্ষা করছে তার জন্য।

'বই পোকা!' খেলার মাঠে এক মেয়ে ঠাট্টা করে ডাকল রোজমেরিকে। সাথে সাথে কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলো রোজি। বইয়ের আরেকটি পাতা উল্টাতেই গ্রেগরির নাম চোখে পড়ল তার। তার পূর্বপুরুষের নাম সত্যি আছে ইতিহাস বইতে। ক্যাপ্টেন গ্রেগরি হ্যাসকস। আবার কল্পনার ডানায় ভর করল রোজমেরি। দেখল টিভিতে কুইজ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন; 'ক্যাপ্টেন গ্রেগরি হ্যাসকস ছিলেন?'

'প্রত্যেকে তার বাটনে চাপ দিল, প্রথমজন বলল, 'ব্যাটল অব ইঙ্কারম্যানের হিরো ছিলেন তিনি'

গর্বে বুক ফেটে যেতে চাইল রোজমেরির। আমাকে আর কেউ ভীতু বলতে পারবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সে। আমি ক্যাপ্টেন হ্যাসকসের নাম রক্ষা করব।

BanglaBook.org

মাকে বইটি দেখানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল রোজমেরি, ছুটল বাড়ির দিকে। মা সাধারণত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে তার জন্য। আজ তাকে দেখা যাচ্ছে না। কলিংবেল টিপল রোজমেরি, অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ পরেও কারো সাড়া-শব্দ না পেয়ে ভয় লাগল ওর। মা কি কোথাও গেছে? ফেরার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে? নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে?

হঠাৎ ঝাং করে খুলে গেল দরজা, চৌকাঠে এসে দাঁড়াল কুৎসিত দর্শন, বিশালদেহী এক লোক। 'এতক্ষণে তোমার স্কুল থেকে ফেরার সময় হলো খুকি।' বলল সে বিশ্রী হেসে।

এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। ভেতরে ঢুকতে দিলো রোজমেরিকে। মাকে এই সময় দেখতে পেল সে। ম্লান, বিবর্ণ, থরথর করে কাঁপছেন ভয়াল দর্শন লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে।

'ওহ রোজি, আমার সোনা, প্রায় ডুকরে উঠলেন তিনি। তারপর লোকটাকে বললেন, 'এবার তুমি চলে যাও প্লিজ। বললামই তো আমাদের এখানে তোমার কোনো কাজ নেই। দয়া করে চলে যাও!'

'রোজি।' বলল লোকটা। 'বেশ সুন্দর নাম। লোকটার গলায় এমন কিছু ছিল, ভয় পেয়ে গেল রোজমেরি। 'তুমি দেখতেও ভারি সুন্দর।' ঘুরে দাঁড়াল সে মিসেস হার্টের দিকে। 'আপনি নিশ্চয়ই চান না আপনার মেয়ের কোনো ক্ষতি হোক? ধরুন, ওর সুন্দর মুখে নিদেন একটা খুরের পোঁচ।' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল লোকটা শেষের দিকে। 'চান নাকি?'

রোজমেরির কানে কানে কে যেন ফিসফিস করে বললো, 'সাহসী হও।' মনে মনে জবাব দিলো সে। 'হবো গ্রেগরি। অবশ্যই হবো।'

গলায় জোর এনে রোজমেরি লোকটাকে বলল, 'তুমি এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও। নইলে আমি পুলিশ ডাকব।'

খ্যাক খ্যাক হেসে উঠল লোকটা। 'কিভাবে ডাকবে খুকী? ফোনের লাইন কেটে দিয়েছি। শোনো, মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না। আমার কিছু টাকা দরকার। দিয়ে দাও। সুবোধ বালকের মতো চলে যাই।'

শিরদাঁড়া টানটান করে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল রোজমেরি। 'তুমি খামোখাই তর্ক করছ। আজকাল বাড়িতে কেউ টাকা-পয়সা রাখে না– লোকে চেক ব্যবহার করে।'

মিসেস হার্টের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচালো লোকটা, 'খুব চালাক মেয়ে বানিয়েছেন তো!'

রোজমেরি মা'র দিকে তাকাল। বসে আছেন তিনি চেয়ারে, ভয়ে সাদা হয়ে আছে মুখ।

'ভয় পেয়ো না মাম্মি।' শান্ত গলায় বলল সে। 'ড্যাডি যে কোনো সময় চলে আসবে।'

BanglaBook.org

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল লোকটা। 'তুমি সত্যি খুব চালাক রোজি। তোমার বাবা মারা গেছে অনেক আগে, সে কথা জানি না ভেবেছ? সব জেনেশুনেই এসেছি।'

হঠাৎ মুখের চেহারা বদলে গেল লোকটার। থমথমে হয়ে উঠল। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, বেশ বুঝতে পারছি। হিস হিস করে বলল সে। দেখাচ্ছি মজা।

এক লাফে পৌঁছে গেল সে মিসেস হার্টের পেছনে। পেছন দিয়ে চেপে ধরল গলা। রোজমেরি স্থির দাঁড়িয়ে রইল। আপনা আপনি মুঠো পাকিয়েছে। লোকটাকে থামাতে হবে কিন্তু কিভাবে? কিভাবে?

'আগে তোমার মাকে শেষ করব তারপর তোমাকে কিন্তু মেয়ে। শুয়োরের মতো খোঁত খোঁত করছে সে। মিসেস হার্টের গলায় শক্ত আঙ্গুলগুলো চেপে বসল।

গ্রেগরি, গ্রেগরি, ওকে থামাও! মৃগী রোগীর মতো চেঁচিয়ে উঠল রোজমেরি।

হতভম্ব দেখাল লোকটাকে, মিসেস হার্টের গলা ছেড়ে দিল। 'কি বললে তুমি?' খেঁকিয়ে উঠল সে। গ্রেগরি আবার কে?

রোজমেরিই প্রথমে দেখতে পেল গ্রেগরিকে। মা'র চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পরনে তাঁর ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম, হাতে ব্যাটেল অব ইস্কারম্যানের সেই ভারি তরবারি যা দিয়ে অনেক শত্রু ঘায়েল করেছেন তিনি। ক্যাপ্টেনকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রোজমেরি, মা বা লোকটা কী দেখতে পাচ্ছে না?

শিউরে উঠলেন মিসেস হার্ট। খুব ঠাণ্ডা লাগছে। রোজমেরি বুঝতে পারল গ্রেগরির উপস্থিতি টের পেয়েছে মা। কিন্তু লোকটা? রোজমেরির চিৎকার শুনেই কি সে ওভাবে দমে গেল?

হঠাৎ লোকটার গোটা শরীর ঝাঁকি খেল, হাত মুঠো করল সে, ঘন ঘন ঢোক গিলল, কাউকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে। হঠাৎ দুলে উঠল শরীর, দপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

ওহ মাই গড, আমার হার্ট, গুঙিয়ে উঠল সে। আমার বোধহয় হার্ট এ্যাটাক হচ্ছে।

মুখ আর শরীর কুঁকড়ে গেল তার, অনবরত গোঙাচ্ছে, চাপ দিয়ে ধরছে বুক।

বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। আর্তনাদ করে উঠল। মনে হচ্ছে কেউ আমাকে ছুরি মেরেছে। সিধে হলো সে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে, পরক্ষণে দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।

কিছুক্ষণ পর পুলিশ অ্যাম্বুলেন্স এলো রোজমেরিদের বাড়িতে। শয়তান লোকটার লাশ নিয়ে গেল। হৈচৈ কমলে দোতলায় উঠে রোজমেরি দাঁড়াল পোর্ট্রেটের সামনে। ওহ গ্রেগরি, তুমি সত্যি দারুণ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। চোখে জল নিয়ে বলল ও। গ্রেগরি তাকিয়ে আছেন ওর দিকে, মুখে হাসি, চোখ মুছে রোজমেরিও হাসল। ফিস ফিস করে বলল, ব্যাপারটা শুধু আমরা দু'জনেই জানি, তাই না?

এমন সময় বাতাস এসে নাড়িয়ে দিলো পর্দা, আর ছবিটি সত্যি সত্যি চোখ পিট পিট করে উঠল রোজমেরির দিকে তাকিয়ে।

BanglaBook.org

নরফকের ভূতের আড্ডা

জেমস ওয়েন্টওয়ার্থ

চারিদিকে ভয়ানক তুষারপাত। ইস্টনরফোক কোস্টের হিকলিং ব্রড আর হর্সি মেয়াবের মাঝে যে তৃণাচ্ছাদিত তুহিন শিক্ত জলাভূমি রয়েছে তার মাঝ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। ইংল্যান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চল তো বটেই, শীতলতম স্থানেরও একটি জায়গা এটি। জায়গাটিতে কত শত জাহাজ ডুবে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

ভয়ানক হাড় কাঁপানো শীতের মাঝ দিয়ে আমরা যখন জায়গাটি পার হচ্ছিলাম, তখন এই বিরানভূমি আর ব্রোগ্রেভ মিলের পরিত্যক্ত গম্বুজখানি দেখে মনে হলো কত সহস্র বছর ধরে জনমানুষের পদার্পণ ঘটেনি এ অঞ্চলে।

শিকার করতে বেরিয়েছিলাম। দুপুরের খাওয়া আপাতত ব্রোগ্রেভের সেই কুইন এ্যানের ফায়ার প্লেসসমৃদ্ধ বাড়িতেই আমরা সেরে থাকি। আমার সঙ্গী হলো ডিক জেটেন্স।

ডিক জেটেন্সকে বললাম– 'গরু বাছুরের চলাচলের এই ট্রাকটা না থাকলে আমাদের পথ চেনাই কুশকিল হয়ে দাঁড়াত ভারি ডাক গান, শিকার করা বুনোপাখি আর খরগোশের বোঝা নিয়ে। তা না হলে পথ হারিয়ে কাঁদতে হতো। রাতের অন্ধকারে এরকম জায়গায় পথ হারানোর মতো অভিশাপ আর কিছু হতে পারে না।' আমার কথায় সায় দিল ডিক। 'আমি অন্তত একা এক থলি সোনার লোভেও এমন গভীর রাতে এই পথ মাড়াতাম না।' ডিকের কাছ থেকেই জানলাম, এই ব্রোগ্রেভ অঞ্চলের প্রায় পুরোটার মালিক ছিলেন স্যার বার্নি ব্রোগ্রেভ। ওয়াক্সাম হলে এই ভুতুড়ে ব্যারনটি এ অঞ্চলে ঘোড়া দাবড়িয়ে বেড়াতেন। ঐ ভদ্রলোক নাকি শয়তানের কাছে নিজের আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

স্যার বার্নির কথা বলার আগে 'ওয়াক্সাম হলের' কথাও একটু বলে নিতে হয়। প্রাচীন স্থাপত্যকলা, ইতিহাস, নান্দনিকতা যারা উপভোগ করতে চান, তারা এই সুবিশাল অট্টালিকা আর সুন্দর গির্জাটি দেখে অভিভূত না হয়ে পারবেন না। 'নর্থসির' একশ' মাইলের মধ্যে অবস্থিত এই ওয়াক্সাম হল বালির পাহাড়ের পাদদেশে আর নীল আকাশের পটভূমিকায় উজ্জ্বল রত্নের মতোই মনে হতো। সমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ প্রায়ই বালির পাহাড়ের বাঁধ ভেঙে এই অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আর গবাদিপশুর জীবন কেড়ে নিয়েছে। ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একরাতে এমনি এক সামুদ্রিক

BanglaBook.org

জলোচ্ছ্বাসে এখানকার হাজার হাজার একর জমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ওয়াক্সাম হল আর গির্জাটিকে তখন সেই প্লাবিত অঞ্চলের মাঝে দ্বীনের মতো দেখাচ্ছিল। ডিক সবকিছু গল্পের মতো বর্ণনা করছিল আর আমিও তা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম।

হঠাৎ ডিক ওর গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিস করে বলল– 'শোনা যায়। সেই জলের মাঝ দিয়েই ঘোড়ায় চড়ে স্যার বার্নির প্রেতাত্মা ওয়াক্সাম হলে এসেছিলেন। সেখানে জিনের ওপর দাঁড়িয়ে প্লাবনের দিকে মুষ্টি প্রদর্শন করে তিনি সমুদ্রকে অভিশম্পাত দিয়েছিলেন।

জীবদ্দশায় এই ওয়াক্সাম হলে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছেন স্যার বার্নি। যুদ্ধবিগ্রহ, আমোদ-প্রমোদ সবকিছুই তিনি এই ছোট্ট জলাভূমির বুকে করে গেছেন। ১৭৭৫ সালে প্রকাশিত ব্লুমফিল্ডের হিস্ট্রি অব নরফোক গ্রন্থ থেকে জানা যায়–

অলিভার ডি ইঙ্গহাম ১১৮৩ সালে এই প্রাসাদসহ এখানকার লর্ড ছিলেন। রাজা জনের আমলে তিনি স্যার জন ডি ইঙ্গহাম উপাধিতে ভূষিত হন। বিবাহসূত্রে এই পরিবারের সম্পত্তি চলে যায় স্যার জন উইলথর্পের হাতে। উইলথর্পের নাতি উইলিয়াম ক্যাডথ্রাপ এই সম্পত্তি পরবর্তীতে স্যার টমাস উডহার্ডসের কাছে বেচে দেন। উডহার্ডস রানী এলিজাবেথের সময়কার একজন লর্ড ছিলেন।

এই প্রাসাদটি যে ব্রোগ্রেভ পরিবারের প্রেতাত্মাদের নিবাস ছিল বলে কথিত আছে, তাদের প্রত্যেকের ভয়ানক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যদিয়ে মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে স্যার র‍্যালফ ক্রুসেডের সময় বর্শার আঘাতে মারা যান। তারপর স্যার এডমন্ড ব্যারনের যুদ্ধে নিহত হন। স্যার জন এগিন কোর্ড তীরবিদ্ধ হয়ে মির্মমভাবে মারা যান। স্যার ফ্র্যান্সিসও পরবর্তীতে এক যুদ্ধে ল্যাঞ্চাসট্রায়ারদের পক্ষে লড়তে গিয়ে মারা যান। স্যার টমাসকে জঘন্যভাবে হত্যা করা হয় 'মাস্টন মুরে'। আর স্যার চার্লস মারা যান র‍্যামি লিজে।

ডিক জেটেন্সের এখনো মনে পড়ে, ছোটবেলায় বড়দের মুখে শোনা স্যার বার্নির দেয়া সেই বার্ষিক নৈশভোজের জমজমাট আসরটির কথা। এই ভোজটি স্যার বার্নি তার মৃত পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাদের স্মরণার্থে উৎসর্গ করেছিলেন। ছ'জন প্রেতাত্মার জন্য খাবার টেবিলটিকে সুসজ্জিত করে রাখা হতো। ভৃত্যরা নিঃশব্দে স্যার বার্নির খাবার পরিবেশন করে যেত। স্যার বার্নি প্রতিটি অদৃশ্য অতিথির উদ্দেশ্যে এবং তাদের কুশল কামনা করে পান করতেন। তিনি অতিথিদের উদ্দীপক যুদ্ধ সঙ্গীত শোনাতেন। মধ্যরাত হলে স্যার বার্নি বেহুশ হয়ে খাবার টেবিলেই মাথা রেখে নাক ডেকে ঘুমাতেন। পরের দিন সমুদ্র সৈকতে বেশ কয়েক মাইল ঘোড়ায় না চড়লে তার ঘোর কাটতো না। প্রাচীন অধিবাসীরা স্যার বার্নিকে শয়তানের দোসর বলেই জানতেন।

এই ব্রডল্যান্ডে আরো একজন ঘোড়সওয়ার বা প্রেতাত্মাকে দেখতে পাওয়া যেত। ১৭৭০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কর্নেল টমাস সিউয়েলকে অপহরণ করে শয়তান বিশাল ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছিল। ঐ এলাকার লোকজন প্রতি বছরের শেষ দিনে এমন দৃশ্য প্রায় প্রত্যক্ষ করেছে বলে শোনা যায়।

BanglaBook.org

প্রাচীন চিত্রকলা আর ভাস্কর্যের যে অমূল্য নিদর্শন র‍্যানওয়ার্থ গ্রামের চার্চে রয়েছে তার স্রষ্টা ছিলেন একজন সন্ন্যাসী। মধ্যযুগের এই শিল্পী আর তার কুকুরের প্রেতাত্মার নৌকা ভ্রমণ, ব্রডল্যান্ডের অনেক লোকই অবলোকন করেছেন। তবে এই প্রেতাত্মাগুলো কার্ডকে তেমন ভয় দেখাত না।

শীতের রাতে ডিকের গল্পগুলো শুনতে বেশ লাগছিল। এরপর ডিক বলতে শুরু করল এ অঞ্চলের প্রচলিত লোক কাহিনীগুলো। জলাভূমির এক বৃদ্ধের কাছ থেকে এ অঞ্চলের লোক কাহিনীর রচয়িতা সার্ফলিং গল্পগুলো শুনেছিলেন।

শীতের এক রাতে ওই বৃদ্ধ ওয়ালশাম থেকে ফেয়ার পথে এমনই এক ভয়ানক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল। বৃদ্ধটির ফেরার সময় কেন জানি মনে হচ্ছিল, একটু পেছনে ফিরে তাকানো দরকার। ওই সময় সে অবশ্য কোনো অদৃশ্য জন্তুর ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। পেছনে ফিরে তাকাতেই একটা সাদা গাধা বৃদ্ধের নজরে এলো। ঘোড়াটা থামাতেই গাধাটাও থেমে গেল। আবার চলা শুরু করতে গাধাটাও চলতে শুরু করল। একবার মনে হলো গাধাটার কাছাকাছি গিয়ে ওটা কার গাধা তার চেনা দরকার। কিন্তু গাধার সামনে যেতেই ঘোড়াটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এবং উর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটতে লাগল। কোনো মতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল বৃদ্ধ লোকটি। সে দিব্যি টের পেয়েছে গাধাটা যে তার পিছু নিয়েছে। অজ্ঞাত এক ভয় বৃদ্ধের উপর ভর করল। পেছন ফিরে দেখে গাধাটা প্রায় তাকে ধরে ফেলেছে। তার নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে গরম ধোঁয়ার কুণ্ডলি আর গোলাপি আগুনের ফুলকি। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরার সাথে সাথে বিদ্যুৎ গতিতে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গাধাটা। আতঙ্কে বৃদ্ধের চোখ বড় হয়ে গেল। গাধাটির সারা শরীর স্বচ্ছ কাচের মতো। রাস্তার ধারের গেটের রেলিংগুলো গাধার শরীর ভেদ করে স্পষ্ট দেখতে পেল। রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে গিয়ে মাথার টুপিটা কোথায় উড়ে পড়েছে তা ঠাহর করতে পারল না বুড়োটা।

লংলেন ধরে গাধাটা গ্রামের দিকে দৌড়াতে লাগল। পথে চার্চের কাছে এসে যে দৃশ্য দেখল তা বিশ্বাস করার মতো নয়। গাধাটা দেয়াল ভেদ করে চলে গেল। যেন মাখনের মাঝ দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এমন কিছু। দেয়ালের একটা পাথরও নড়ল না। কিন্তু গাধাটা দেয়ালের ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে টুপিটা উদ্ধার করতে গেল বৃদ্ধ। আগের রাতে ফিরে গিয়ে টুপি আনার সাহস তার ছিল না। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, চার্চের সেই দেয়ালটাতে কোনো ফাটল বা গর্ত তো নেইই, আর রাস্তাতেও গাধার ক্ষুরের কোনো দাগ পাওয়া গেল না।

সাম নরফোক গোস্টস **অনুবাদ : আবদুল্লাহ শাহরিয়ার টুটুল**

BanglaBook.org

ভবঘুরে

রিচার্ড মিডলটন

ধীরে ধীরে বরফের শক্ত চূড়ার ওপর উঠে এলো সূর্য, তুষার রাজ্যে অদ্ভুত সোনালি রশ্মি ছড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করল সকাল হয়েছে। সারারাত বরফ পড়েছে। পাখিরা, যারা সারাদিন লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়ায় এখানে-ওখানে রূপালি পেভমেন্টসে, তাদের পায়ের ছাপও পড়েনি তুষারপাতের কারণে। খাদের পাশে গজিয়ে ওঠা ঝোপ-ঝাড় বরফ মেখে সাদা হয়ে আছে, সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠল গা, যেন বর্ণালি রং ছড়াল। কমলা কমলা আকাশে শুরু হলো রঙের খেলা। কমলা রঙ গলে গিয়ে ধারণ করল গভীর নীল রঙ, সেখান থেকে ক্রমে ম্লান নীলে পরিণত হলো। সমতল মাঠের ওপর দিয়ে গেল ঠাণ্ডা বাতাস নীরবে। গাছের গায়ে ধরল কাঁপন, তুষারের শিরশিরে ধুলো উড়ল। তবে বরফের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে থাকা ঝোপগুলোর মাঝে কোনো আলোড়ন তুলল না। মাথার ওপর সূর্য ক্রমে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে, তার উষ্ণ উত্তাপ মিশে গেল ঠাণ্ডা বাতাসে।

উত্তাপ আর শীতলতার অদ্ভুত পরিবর্তন বিরক্তির উদ্রেক করল ভবঘুরের স্বপ্নের মাঝে, জেগে গেল সে সারা গায়ে বরফ নিয়ে। কয়েক মুহূর্ত রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হলো তাকে বরফ সরাতে। উঠে বসল সে, চোখ বিস্ফারিত, প্রশ্ন সে চোখে— ঈশ্বর, আমি ভেবেছিলাম আমি বিছানায় ঘুমিয়ে আছি। বিশাল ল্যান্ডস্কোপের দিকে তাকিয়ে আপন মনে যেন নিজেকেই কথাটা শোনালো সে। অথচ সারাদিন এখানেই পড়ে থেকেছি। আড়মোড়া ভাঙল সে, সাবধানে পা মুড়ল, বৃষ্টিভেজা কুকুরেরা ঝাড়া দিল গা, ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল শরীর থেকে ছিটকে। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ছুঁয়ে গেল তাকে, শিউরে উঠল সে।

যাক, তবু ঘুমোবার পর শরীরটা ঝরঝরে লাগছে একটু। ভাবল ভবঘুরে। ভাগ্যিস জেগে গিয়েছিলাম। নাকি দুর্ভাগ্যই বলব কারণ আরো চল্লিশ মাইল রাস্তা আমাকে হাঁটতে হবে। আল্পস পর্বতমালার দিকে তাকাল সে। আকাশের গায়ে বরফ মোড়া আল্পসকে ঠিক ছবির মতো লাগছে। হিসেব করে দেখল সে, গতকাল ব্রাইটন থেকে মাত্র বারো মাইল রাস্তা হেঁটে আসতে পেরেছে।

BanglaBook.org

শালার বরফ। শালার ব্রাইটন। শালার সবকিছু। নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসছে সে। সূর্য আরো ওপরে উঠে গেছে। পাহাড়টাকে পেছনে রেখে ভবঘুরে রাস্তা ধরে আবার হাঁটা দিল। হাঁটতে তার ভালোই লাগছে। রাস্তায় তার পায়ের আওয়াজ উঠছে। থপ থপ। তিনটে মাইলস্টোন পার হবার পর ছেলেটাকে দেখতে পেল সে। সিগারেট ধরাচ্ছে। পরনে ওভারকোট নেই, বরফের রাজ্যে ভীষণ ভঙ্গুর আর দুর্বল মনে হলো হালকা-পাতলা কাঠামোটাকে।

আপনি ওদিকে যাচ্ছেন নাকি, স্যার? ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'হুম!' সংক্ষিপ্ত জবাব ভবঘুরের।

চলুন। আমিও আপনার সাথে যাই। আমিও ওদিকেই যাচ্ছি। একা হাঁটতে ভালো লাগে না। সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না। আপন মনে বকবক করে যেতে লাগল ছেলেটা। জবাবে ভবঘুরে শুধু মাথা দোলাল।

আমার বয়স আঠার, বলল ছেলেটা কথায় কথায়। কিন্তু আমাকে দেখলে আরো কম বয়সী মনে হয় তাই না?

ভেবেছিলাম পনের।

ভুল ভেবেছেন। আমি রাস্তায় পড়ে আছি ছ'বছর ধরে। ছোটবেলায় বাড়ি পালিয়েছি অন্তত পাঁচবার। প্রতিবারেই পুলিশ ধরে নিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে বাড়িতে। পুলিশ সব সময় আমার প্রতি সদয় ছিল। এখন আর আমার বাড়িটাড়ি নেই যে পালিয়ে বেড়াব।

'আমারও।' নিরুত্তাপ শোনাল ভবঘুরের কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।' বলল ছেলেটা।

তবে আপনাকে দেখে ভদ্রলোক মনে হয়। আমার মতো মনে হয় না। ভবঘুরে রোগাটা কাঠামোটার দিকে একবার তাকল, কমিয়ে আনল হাঁটার গতি।

'তোমার মতো অতোদিন ধরে রাস্তায় নেই আমি।' বলল সে।

'তা আপনাকে দেখে বোঝা যায়। আপনাকে দেখে তেমন ক্লান্তও মনে হচ্ছে না। রাস্তার শেষ মাথায় কিছু আশা করছেন নাকি?'

কি যেন ভাবল ভবঘুরে। তারপর বলল, 'জানি না। তবে সব সময়ই আমি কিছু না কিছু আশা করি।'

'বেশি আশা করে লাভ নেই।' মন্তব্য করল ছেলেটা। 'বেশি আশা করলে কিছুই পাওয়া যায় না।'

তবু আশা ছেড়ে দেয়া ভালো নয়। একদিন হয়তো এমন কারো সাথে দেখা হয়ে যাবে সে বুঝতে পারবে। শহরের মানুষ কিছু বুঝতে চায় না, বাধা দিলো ছেলেটা। ওদের চেয়ে গ্রামের মানুষ অনেক ভালো। কাল রাতে আমি একপাল গরুর সাথে এক ঘোলাঘরে ঘুমিয়েছি। আজ সকালে খামার বাড়ির চাষী লোকটা আমাকে চা খেতে দিয়েছে। শহরের লোকদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। দেখেছি তো লন্ডনে-

BanglaBook.org

'কাল রাতে আমি হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ি', বলল ভবঘুরে। ভেবেছিলাম মারাই যাব। কিভাবে যে বেঁচে আছি অবাক লাগছে।' ছেলেটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

'আপনি যে মারা যাননি বুঝলেন কিভাবে?'

'মারা যে যাইনি বুঝতেই তো পারছি', সামান্য বিরক্তির স্বরে বলল ভবঘুরে।

'শুনুন!' কর্কশ গলায় বলল ছেলেটা, 'আমাদের মতো লোকেরা চাইলেই এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে না। সবসময় আমাদের কুকুরের মতো ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকতে হবে। ছয় বছর ধরে আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। আপনার কী ধারণা আমি বেঁচে আছি? না, আমি মরে গেছি অনেক আগেই। মার পেটে গোসল করার সময় আমি একবার মরেছি, আমাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করেছে এক জিপসি ধারাল স্পাইক দিয়ে। দু'বার আপনার মতো আমি বরফে জমে গেছি, আরো একবার একটা গাড়ি উঠে গিয়েছিল আমার গায়ে তারপরও আমি হেঁটে বেড়াচ্ছি। হেঁটে চলেছি লন্ডনের দিকে। কারণ এ আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনাকে আবারো বলছি, চাইলেই আমরা এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাব না।'

হঠাৎ বেদম কাশতে শুরু করল ছেলেটা। কাশি না থামা পর্যন্ত ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইল ভবঘুরে।

তুমি আমার কোটটা ধার নিতে পারো ছোকরা।' বলল সে। 'খুব ঠাণ্ডা লেগেছে দেখছি।

'দয়া দেখাতে হবে না।' ক্ষেপে উঠল ছেলেটা। জোরে জোরে টান দিতে লাগল সিগারেট। 'আমি ঠিকই আছি। আপনি রাস্তা খুঁজছেন। এখনো ওটার সন্ধান পাননি। তবে পেয়ে যাবেন শিগ্গা। আমরা আসলে সবাই মৃত। আপনিও তাই। আমরা সবাই ক্লান্ত। বেজায় ক্লান্ত। কিন্তু তারপরও এই পথ ত্যাগ করতে পারি না। আমরা।' বলতে বলতে আবার কাশি শুরু হলো ছেলেটার। কাশির দমকে বাঁকা হয়ে গেল শরীর। তাকে ধরে রইল ভবঘুরে। এদিক-ওদিক তাকালো সাহায্যের আশায়। নির্জন রাস্তায় বাড়িঘর বা মানুষজন কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। হঠাৎ কোত্থেকে একটা মোটরকার উদয় হলো রাস্তার মাঝখানে। থামালো ওদের সামনে।

'কি হয়েছে?' ড্রাইভার নেমে এলো গাড়ি থেকে। 'আমি একজন ডাক্তার।' ছেলেটার দিকে তাকালো সে। ছেলেটা মুখ হাঁ করে শ্বাস টানছে।

'নিউমোনিয়া।' মন্তব্য করল ডাক্তার। 'ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ইচ্ছে করলে আপনি আসতে পারেন। মাথা নাড়ল ভবঘুরে। না আমি হেঁটেই যাব।

ডাক্তার আর সে ছেলেটাকে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলল।

'আপনার সাথে আমার রেইলগেটে দেখা হবে।' বলল সে বিড় বিড় করে। তারপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল। গাড়িটা একটু পরে অদৃশ্য হয়ে গেল সাদা রাস্তার বাকে।

BanglaBook.org

সারাটা সকাল বরফ ভেঙে পথ চলল ভবঘুরে। দুপুর নাগাদ এক গৃহস্থের কুটিরের সামনে থামল। দু'টুকরো রুটি ভিক্ষা চাইল। নির্জন এক গোলাঘরে ঢুকে রুটি খেল সে। এখানে বেশ গরম। সারাদিন সে খড়ের গাদার ওপর ঘুমিয়ে রইল। যখন জাগল, ততক্ষণে ঘনিয়ে আসছে সাঁঝের আলো। আবার বরফ আর কাদায় ঢাকা পিচ্ছিল রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করল সে।

রেইলগেট ছাড়িয়ে মাইল দুয়েক আসার পর অন্ধকারে এক লোককে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। ভীষণ দুর্বল শরীর।

'ওদিকে যাচ্ছেন নাকি স্যার?' কর্কশ গলায় বলল সে। 'কিছু মনে না করলে আপনার সাথে যেতে পারি। একা হাঁটতে ভালো লাগে না। সঙ্গী পেলে মন্দ হয় না।'

'তোমার না নিউমোনিয়া হয়েছে।' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ভবঘুরে।

'জ্বি, আজ সকালে নিউমোনিয়াতেই মারা গেছি আমি।' জবাব দিলো ছেলেটা। এবার সত্যি সত্যি।

অল দ্য ব্লাইটন রোড **অনুবাদ : আনন্দ সিদ্ধার্থ**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রত্যাবর্তন

এলিজাবেথ বোয়েন

লন্ডনে মিসেস ড্রোভারের আজ শেষ দিন। তাই অবরুদ্ধ বাড়িটিতে এসেছেন নিজের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেতে। কিছু জিনিস তাঁর নিজের, কিছু পরিবারের। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এখন গ্রামের বাড়িতে।

আগস্টের শেষাশেষি। সারাদিন আজ থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে। বিকেলের হলুদ আলোতে পেভমেন্টের পাশের গাছের পাতা ঝলমল করছে। আকাশের এক কোণে জমতে শুরু করেছে কালো মেঘ, সম্ভবত আবারো বৃষ্টি নামবে।

যে রাস্তা ধরে বাড়িতে ঢুকেছেন মিসেস ড্রোভার, একদা এখানে সত্যি পদচারণা ছিল তাঁর। বহু বছর আবার এসেছেন পরিত্যক্ত বাড়িটিতে। তবে পরিত্যক্ত বলতে একজন পার্টটাইম কেয়ারটেকার বাড়িটির দেখাশোনা করে। সে আজ বাসায় নেই। দরজা ভেড়ানো ছিল, খুলতেই মরা হাওয়া ধাক্কা দিয়েছে মিসেস ড্রোভারকে। বড় জানালাটা খুলে দিলেন আলো-বাতাসের জন্যে।

বাড়ির সবকিছু আগের মতোই আছে। সাদা মার্বেল পাথরের ম্যান্টল পিস? লেখার টেবিলের ওপর সেই ফ্লাওয়ার ভাসটা আগের মতো আছে; ওয়ালপেপারের দাগগুলো এখনও অম্লান। তেমন ধুলোটুলো পড়েনি কোনোটির ওপরই। ভেন্টিলেশন বলতে সেই চিমনিটা আগের মতোই আছে। ড্রইংরুমকে ঠাণ্ডা উনুনের মতো মনে হলো মিসেস ড্রোভারের। টেবিলের ওপর পার্সেলগুলো রাখলেন তিনি। পা বাড়ালেন সিঁড়ির দিকে। তাঁর প্রয়োজনীয় জিসিনপত্র বেডরুমের সিন্দুকে।

পার্টটাইম কেয়ারটেকার গেছে ছুটিতে। আজও ফেরেনি। তবে লোকটা যে তাঁর বাড়ির যত্নটত্ন তেমন নেয় না দেখেই বোঝা যায়। দেয়ালের কয়েক জায়গায় ফাটল, সর্বশেষে বোমা বর্ষণের চিহ্ন।

হলঘরে এক ফালি আলো এসে পড়েছে। ওখান থেকে যাবার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মিসেস ড্রোভার। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন টেবিলের দিকে। একটা চিঠি। খামের ওপর তাঁর নাম লেখা।

মিসেস ড্রোভার প্রথমেই ভাবলেন তাহলে কেয়ারটেকার লোকটাই এসেছিল, চিঠিটি রেখে গেছে। অবশ্য কেয়ারটেকার জানে না যে তিনি লন্ডনে আসবেন। সে চিঠিটি তাঁর

BanglaBook.org

নামে পোস্ট করতে পারত। তা না করে গাফিলতির চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে ধুলোর মধ্যে চিঠিটি ফেলে রেখেছে। চরম বিরক্ত হলেন মিসেস ড্রোভার। খামটি তুলে নিলেন। খামের ওপর কোনো ডাকটিকিট নেই। ওটা নিয়ে সোজা দোতলায় চলে এলেন তিনি। বেডরুমের ঘরটা বাগানের দিকে মুখ ফেরানো। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা বেড়ে গেছে আরো। রীতিমতো অন্ধকার হয়ে আসছে। আলো জ্বাললেন মিসেস ড্রোভার। তারপর খামের মুখ ছিঁড়ে বের করলেন চিরকুট। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। তিনি পড়তে শুরু করলেন

'প্রিয় ক্যাথেলিন,

তুমি নিশ্চয়ই জানো আজ আমাদের অ্যানিভার্সারি ডে। বছরগুলো পেরিয়ে গেছে কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর গতিতে। তবু মনে হয় কিছুই বদলায়নি। তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে সে বিশ্বাস আমার ছিল। তুমি লন্ডন ছেড়ে চলে গেলে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, তবে ঠিক সময়ে ফিরে এসেছ বলে খুশিও হয়েছি। তোমার সাথে আমার দেখা হবে নির্ধারিত সময়েই।

ততক্ষণ পর্যন্ত...

কে.'

তারিখটা লক্ষ্য করলেন মিসেস ড্রোভার। আজকের তারিখ। বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেললেন তিনি চিঠিটি। তারপর আবার তুলে নিয়ে পড়লেন। তাঁর প্রসাধনী চর্চিত ওষ্ঠ যুগল সাদা হয়ে গেল। টের পেলেন চেহারায় ভাংচুর শুরু হয়ে গেছে। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ, মাথার হ্যাটটা অবহেলায় কপালের ওপর টানা, গালে পাউডার বোলাতে ভুলে গিয়েছিলেন। সরু গলায় স্বামীর দেয়া মুক্তোর হার ঝুলছে, গলাটা বেশি সরু লাগছে। পরনে গোলাপি রঙের উলেন জাম্পার, তাঁর বোনের দেয়া। সহজে ভেঙে পড়ার পাত্রী তিনি নন। তবে চিঠিটি তাঁকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে। আয়নায় নিজের উদ্বিগ্ন চেহারা দেখতে পাচ্ছেন মিসেস ড্রোভার। আয়নার সামনে থেকে সরে এলেন তিনি, সিন্দুকটার দিকে এগোলেন। ওটার ভেতরেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে। সিন্দুক খুলে জিনিসগুলো খুঁজছেন, আবার দৃষ্টি চলে গেল চিঠিটির দিকে। হঠাৎ গির্জার ঘড়িতে ঢংঢং শব্দ শুরু হয়ে গেছে। মনে মনে আঁতকে উঠলেন মিসেস ড্রোভার। 'নির্ধারিত সময়...? মাই গড', বিড় বিড় করলেন তিনি, 'কি নির্ধারিত সময়? কিন্তু আমি কিভাবে...? পঁচিশ বছর পর...'

পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। ক্যাথেলিন নামের এক তরুণী প্রেমে পড়েছিল এক তরুণ সৈনিকের। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এক সন্ধ্যায় প্রেমিকটি বিদায় নিয়ে যাচ্ছিল তার প্রেমিকার কাছ থেকে। বলছিল, 'আবার ফিরে আসব আমি। আজ হোক কাল হোক। তোমার সাথে আবার সাক্ষাৎ হবে আমার। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।'

কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। অপেক্ষা করেছিল ক্যাথেলিন। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও প্রেমিকের দেখা না পেয়ে পরিবারের চাপে বিয়ে করে ফেলে সে জনৈক উইলিয়াম

BanglaBook.org

ড্রোভারকে। ক্যাথেলিন হয়ে যায় মিসেস ড্রোভার। কেনসিংটনের নির্জন এই বাড়িতে একসময় সুখের সংসার গড়ে তোলে ওরা, সন্তানের মুখ দেখে। ছেলেমেয়েরা এখানেই বড় হয়ে উঠেছে। তারপর শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সবাই পালিয়ে গেল গ্রামে, বোমার ভয়ে। তারপর আর ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেনি কেউ যুদ্ধবিধ্বস্ত পুরনো বাড়িতে।... আবার বাস্তবে ফিরে এলেন মিসেস ড্রোভার। চোখ বুজে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। চিঠিটাকে অস্বীকার করতে মন চাইল। ভাবতে চাইলেন ওটা স্রেফ কল্পনা। কিন্তু চোখ মেলে চাইতেই ওটাকে বিছানার ওপর দেখতে পেলেন তিনি।

চিঠিটা পাঠিয়ে কেউ তাঁকে ভয় দেখাতে চেয়েছে। কে সে? কারো তো জানার কথা নয় আজ তিনি এ বাড়িতে আসবেন। কেয়ারটেকার যদি আজ বাসায় আসত, সেও নিশ্চয়ই আশা করত না মিসেস ড্রোভারকে। সেক্ষেত্রে চিঠিটি সে ডাকঘরে নিয়ে মিসেস ড্রোভারকে পোস্ট করে দিতো। তবে কেয়ারটেকার যে আসেনি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাহলে চিঠিটা হলঘরে এলো কি করে? ওটার তো হাত-পা বা পাখা নেই যে হেঁটে বা উড়ে এসে টেবিলে বসে থাকবে। নিশ্চয়ই ওটাকে কেউ নিয়ে এসেছে– কিন্তু কেয়ারটেকার ছাড়া আর কারো কাছে চাবি নেই। অবশ্য চাবি ছাড়াও ঘরে ঢোকা যায়, এ চিন্তাটা মাথায় আসতে মন খচখচ করতে লাগল। এর মানে এটাই হতে পারে– তিনি আর একা নন। নিচতলায় অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে চিঠির মালিকের জন্য। অপেক্ষা করতে হবে– কতক্ষণ? যতক্ষণ না 'নির্ধারিত সময়' আসে। তবে সে সময়টা বোধহয় ছটা নয়– ছটা তো বেজেই গেছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস ড্রোভার, দরজা বন্ধ করলেন।

এখান থেকে চলে যেতে হবে তাঁকে। ট্রেন ধরতে হবে! আগে ট্যাক্সি ডাকা দরকার। কারণ এতো মালামাল নিয়ে হেঁটে রেল স্টেশনে যাওয়া সম্ভব নয়। মনে মনে আওড়ালেন মিসেস ড্রোভার : আমি এখন ফোন করে ট্যাক্সি ডাকব। ট্যাক্সি হয়তো সাথে সাথে আসতে পারবে না। তবে ট্যাক্সির শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত হলঘরে পায়চারি করে বেড়াব।

কিন্তু ফোন করতে গিয়ে দেখলেন লাইন কাটা। ঘাম ফুটল মিসেস ড্রোভারের কপালে। বিচলিত বোধ করছেন।

আমি কেন ওর কথা ভাবব, ভাবলেন তিনি। ও তো কখনো আমার প্রতি সদয় ছিলো না। মা বলতো আমাকে সে কখনোই ভালোবাসেনি। সে তার প্রয়োজনে আমাকে ব্যবহার করেছে– ওটাকে ভালোবাসা বলে না। আমাকে দিয়ে সে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়েছিল কি? আমার ঠিক মনে পড়ছে না– কিন্তু ঠিকই মনে পড়ছিল তাঁর। তবে মনে পড়লেও তিনি ভুলে থাকতে চাইলেন সেই মুখখানা। সিদ্ধান্ত নিলেন এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বেন। ঘর থেকে ক'পা এগুলেই একটা স্কোয়ার। ওটা মিশেছে মূল রাস্তার সাথে। রাস্তায় নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। আর একবার ট্যাক্সিতে উঠতে পারলে তার আর ভয় করবে না।

BanglaBook.org

দরজা খুললেন মিসেস ড্রোভার। সিঁড়ির ধারে দাঁড়ালেন, কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছেন।

কিছুই শুনতে পেলেন না তিনি, শুধু এক পশলা শুকনো হাওয়া ঝাপটা মেরে গেল মুখে। শিউরে উঠলেন তিনি। বাতাসটা এসেছে পেভমেন্ট থেকে। কেউ হয়তো ওখানকার কোনো দরজা বা জানালা খুলেছে ঘর থেকে বেরুবার জন্য।

থেমে গেছে বৃষ্টি। চকচক করছে পেভমেন্ট। সদর দরজা দিয়ে সাবধানে শূন্য রাস্তায় পা রাখলেন মিসেস ড্রোভার। বিপরীত দিকের বাড়িগুলোতেও লোকজন থাকে না, খাঁ খাঁ করছে, ভাঙা কাঠামো নিয়ে বাড়িগুলো যেন কটমট করে তাকিয়ে থাকল মিসেস ড্রোভারের দিকে।

সামনে পা বাড়ালেন তিনি। পেছন ফিরে তাকাবেন না পণ করেছেন। এতো নির্জন রাস্তা, গা ছমছম করে উঠল। যুদ্ধের ভয়ে সবাই পালিয়েছে। স্কোয়ারের শেষ মাথা সেখানে মিলেছে চৌরাস্তার সাথে, দুটো বাস দেখলেন মিসেস ড্রোভার, পাল্লা দিয়ে ছুটছে। রাস্তায় লোকজন দেখা গেল। জীবনের চিহ্ন। ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। চৌরাস্তার মোড়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, তবে একটামাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত, লাফ মেরে উঠে পড়লেন মিসেস ড্রোভার। ঠিক তখন গির্জার ঘড়িতে সাতটা বাজার ঘণ্টা ধ্বনি শোনা গেল। মেইন স্ট্রিটের দিকে মুখ করে ছিল ট্যাক্সিটা; তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে হলে ঘুরতে হবে কিন্তু মিসেস ড্রোভার কিছু বলার আগেই চলতে শুরু করল বাহনটা। যাত্রী আর ড্রাইভারকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে যে গ্লাস প্যানেলটা ওটার ওপর ঝুঁকলেন বিরক্ত ড্রোভার, অধৈর্য ভঙ্গিতে টোকা দিয়ে ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

প্রায় সাথে সাথে ব্রেক কষল ড্রাইভার, মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। যাত্রী এবং ড্রাইভারের মাঝে বাধা সৃষ্টি করে থাকলো গ্লাস প্যানেল। তবে ওরা পরস্পরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, চোখে চোখে চেয়ে আছে।

মিসেস ড্রোভারের মুখ হাঁ হয়ে গেল। চিৎকার দিতে যাচ্ছেন। গ্লাসের অপরদিকে হিমশীতল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে তাঁর প্রেমিক, যে মারা গেছে বলেই জানেন মিসেস ড্রোভার।

মিসেস ড্রোভার গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিচ্ছেন। মুখ ঘোরাল ড্রাইভার, ফুল স্পিডে ছুটল ট্যাক্সি। তবে মেইন স্ট্রিটের দিকে নয়। কেনসিংটনে মিসেস ড্রোভারের পরিত্যক্ত বাড়ির দিকে। রাস্তাটা ঢাল হয়ে নেমে গেছে একটা গভীর খাদে। সেদিকেই তীরবেগে ছুটছে ট্যাক্সি।

BanglaBook.org

দ্য ডেমন লাভার **অনুবাদ : অনীশ দাস অপু**

নেকড়ে

ফ্রেডারিক ম্যারিয়েট

দুপুরের আগেই পাল তুলে দিলো দু'বন্ধু। ফিলিপ আর ক্রাঞ্জ। গন্তব্য– সুমাত্রা। জাহাজ ছোট হলেও কোর্স নিয়ে কোনো ঘাপলায় পড়তে হলো না তাদের। শান্ত পানি। দিনের বেলা আশপাশের দ্বীপ এবং রাতের বেলা আকাশের তারা কম্পাসের কাজ করছে। আরো নিশ্চিন্ত হবার জন্য উত্তর ঘেঁষে চললো তারা।

চমৎকার এক সকালে দুটো দ্বীপের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট জাহাজটি। ফিলিপ বলল, 'ক্রাঞ্জ, তুমি বলেছিলে, তোমার জীবনে নাকি বহু রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে? পরে কোনা এক সময় বলবে বলেছিলে– আজ ফুরসৎ হবে কি?

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো ক্রাঞ্জ, হ্যাঁ, বলব বলব করেও একের পর এক ঝামেলায় শেষ পর্যন্ত বলা হয়নি। গল্পটা বলার এটাই বোধহয় উপযুক্ত জায়গা। গল্পটা অবশ্য অদ্ভুত লাগবে তোমার কাছে– শুরু করি তাহলে।'

'তুমি নিশ্চয়ই হার্জ পর্বতমালার নাম শুনেছ? লোকে হার্জের কথা কেন এতো বলাবলি করে জানো?'

না। লোকে যে এই পর্বতমালা সম্বন্ধে বলাবলি করে তাও জানি না। তবে দু'একটা বইপত্রে পড়েছি, অদ্ভুত কিসব কাণ্ডকারখানা নাকি ঘটে ওখানে।

জায়গাটা জঙ্গুলে। বহু গল্প-কেচ্ছা প্রচলিত আছে জায়গাটা সম্পর্কে। প্রত্যেকটাই অদ্ভুত। কিন্তু যতো অদ্ভুতই হোক, সেসব বিশ্বাস করি আমি। কারণ আছে বলেই বিশ্বাস করি। আমার বাবা আসলে হার্জের অধিবাসী ছিলেন না। ট্রান্সলিভেনিয়ায় বসবাসকারী এক সম্ভ্রান্ত হাঙ্গেরিয়ানের ভূমিদাস ছিলেন তিনি। ভূমিদাস হলেও গরিব বা মুখ্য কোনোটাই ছিলেন না বাবা। বুদ্ধিসুদ্ধি ভালোই ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত মনিবের বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করার অধিকার পেয়েছিলন। সত্যি কথা বলতে কি ধনীই ছিলেন তিনি। তবে আমার মনে হয় একজন ভূমিদাসের ভূমিদাস থাকাই উচিত।

বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে। আমার বড় ভাই সিজার, আমি এবং বোন মার্সেলা। মা ছিলেন খুবই সুন্দরী মহিলা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বুদ্ধির চেয়ে সৌন্দর্যের পাল্লাই ছিল ভারি। গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাবাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হতো। এদিকে মা ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েন বাবার মনিব, সেই সম্ভ্রান্ত লোকটির সাথে।

BanglaBook.org

একদিন দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন বাবা। দারুণ মর্মাহত হয়ে রাগের মাথায় প্রেমিক-প্রেমিকা দু'জনকে খুন করে ফেললেন তিনি। খুন করার পর সবদিক বিবেচনা করে দিশা হারিয়ে ফেললেন বাবা। বুঝতে পারলেন, আজ হোক কাল হোক আইন রক্ষীরা ধরবেই। তাড়াহুড়োর ভেতর সাধ্যমতো কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় করে আমাদের তিন ভাই-বোনকে ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়ে রাতের অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সারারাত একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে হার্জ পর্বতমালার মধ্যে গাড়ি ঢুকতে হাঁফ ছাড়লেন। এতক্ষণ যেটুকু বললাম, এর সবই আমি বড় হয়ে শুনেছিলাম। বোঝার মতো বয়স তখনো হয়নি আমার।

আমার নিজের যা মনে পড়ে, ঘন জঙ্গলের ভেতর একটা কুটিরে বাবা আর আমরা তিন ভাইবোন থাকতাম। কুটিরের আশপাশে কয়েক একর চাষযোগ্য জমি ছিল আমাদের। কুটিরটা এবং জমিটুকু এক শিকারির কাছ থেকে কিনেছিলেন বাবা। শিকার করে এবং কয়লা বেচে পেট চালাতো লোকটা। গরমের সময় ওই জমিতে চাষাবাদ করতেন বাবা। যা ফসল ঘরে উঠত আমাদের ক্ষুদ্র সংসারটির জন্য তাই ছিল যথেষ্ট। শীতকালে বেশিরভাগ বাড়িতে থাকতাম আমরা। চারদিক থেকে ভেসে আসত নেকড়ের গর্জন। প্রায়ই তাদের ধাওয়া করতেন বাবা। জায়গাটা আমি এখনো মোটামুটি পরিষ্কারই মনে করতে পারি। পাহাড়ের ওপর লম্বা লম্বা পাইন গাছের সারি মাথা উঁচিয়ে আছে। নিচে গভীর অরণ্য। সবচেয়ে কাছের জনবসতিটাও ছিল মাইল দুয়েক দূরে। গরমের সময় খুব ভালো লাগত। অসুবিধা হতো শীতকালে। কী প্রচণ্ড যে শীত।

সারা শীতকালটা নেকড়ের পিছু নিতেন বাবা। শিকারের ভীষণ নেশা ছিল তাঁর। যাবার সময় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিতেন কুটিরে– যাতে আমরা বাইরে যেতে না পারি। তাঁর সঙ্গী হবে, এমন কেউ ছিল না। ছিল না আমাদের যত্ন নেবারও কেউ। কোনো চাকরানী পাওয়া ছিল দুষ্কর। লোকালয় ছেড়ে এই বনের মধ্যে থাকতে কেইবা রাজি হবে? আর পাওয়া গেলেও বোধহয় নিতেন না বাবা। জৈবিক ব্যাপারটাতেই কেমন একটা আতঙ্ক এসে গিয়েছিল তাঁর। মেয়েদের সহ্যই করতে পারতেন না। তুমি হয়তো ভাবছ, বাবা আমাদের কেবল অবহেলাই করতেন– সন্দেহ নেই বাবা আমাদের অবহেলা করতেন, কিন্তু আমাদের নিয়ে ভাবতেনও। সবসময় চিন্তা করতেন, কখন জানি কী বিপদ ঘটিয়ে ফেলি আমরা। তাই যখন বাইরে যেতেন, কোনো বাতি থাকত না কুটিরে। তাঁর অনুপস্থিতিতে যদি আগুন নিয়ে খেলা করতে যাই আমরা। পুড়িয়ে ফেলি হাত-পা। ভাল্লুকের চামড়া গায়ে দিয়ে কুকুর কুণ্ডলী হয়ে থাকতাম আমরা। শীত যতটা কাটানো যায়। কুঁড়েতে ফিরে যখন বাতি জ্বালাতেন বাবা, তখন আমাদের সেকি আনন্দ। বাবার এই ছন্নছাড়া জীবন সবার কাছেই অদ্ভুত ঠেকত। আসলে কাজ ছাড়া চুপচাপ থাকতেই পারতেন না তিনি।

শিশুদের একলা একলা রাখলে তাদের চিন্তাধারা স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হয় না। আমাদেরও তাই হয়েছিল। বুড়োর মতো চিন্তা করতাম। এই বিশ্রি শীত পেরিয়ে কবে

BanglaBook.org

আসবে গ্রীষ্ম, গাছে ধরবে পাতা, ফুটবে ফুল, পাখি গাইবে গান, বরফ যাবে গলে এবং আমরা আবার বেরুতে পারব কুটির ছেড়ে।

ভাই সিজারের নয়, আমার সাত এবং মার্সেলার পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এই ছিল আমাদের জীবনধারা। এরপরই ঘটল সেই বিশেষ ঘটনা।

সে রাতে বাবা ফিরলেন খারাপ মেজাজ নিয়ে। কোনো শিকার পাননি। ঠাণ্ডায় কাহিল। কাঠ জড়ো করতে আমরা চারদিক ঘিরে ধরলাম। আগুন পোয়াবো। হঠাৎ বাবা মার্সেলা বেচারিকে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মাটিতে পড়ে কপাল কেটে গেল মার্সেলার। রক্ত পড়তে লাগল ঝর ঝর করে। সিজার দৌড়ে গেল কাছে। বাবার ভয়ে মার্সেলা কাঁদল না পর্যন্ত। টুল টেনে বসলেন বাবা। আগুনও জ্বলে উঠল। মজা করে আগুন পোয়াতে লাগলেন বাবা। আমরা কেউ কাছে গেলাম না। ঘরে এককোণে মার্সেলার দু'পাশে বসে রইলাম। মার্সেলার কপাল থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল একটু একটু। প্রায় আধঘণ্টা পরে আমাদের কুঁড়ের জানালার ঠিক নিচ থেকে ভেসে এলো নেকড়ের হিংস্র গর্জন। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন বাবা। রাইফেল বের করলেন। আবার ভেসে এলো নেকড়ের ডাক। রাইফেলঠা পরীক্ষা করেই তাড়াহুড়া করে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে গেলেন বাবা। বাইরে তালা লাগালেন যথারীতি। আমরা কান খাড়া করে রইলাম। বাবা যদি নেকড়েটাকে মারতে পারেন, ফিরবেন খুশি হয়ে। বাবার নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে হাসি-খুশি দেখতে চাইতাম। সবসময় একসঙ্গে থাকা সত্ত্বেও কোনো ঝগড়াঝাঁটি ছিল না আমাদের তিন ভাইবোনের ভেতর। যদিও বা আমার এবং সিজারের মধ্যে ঝগড়ার কোনো পূর্বাভাস দেখা দিতো, মার্সেলা দৌড়ে এসে আমাদের দু'জনকেই চুমু খেত। গণ্ডগোলের আর পথ থাকত না। অত্যন্ত চমৎকার, অমায়িক শিশু ছিলো মার্সেলা। এখনও আমার চোখে ভাসে তার সুন্দর নিষ্পাপ চেহারাটা। বেচারি মার্সেলা।

'ও কি মারা গেছে?' জানতে চাইল ফিলিপ।

'হ্যাঁ।' দীর্ঘশ্বাস বেরুলো ক্রাঞ্জের বুক চিরে। 'আমাকে গল্পটা শেষ করতে দাও ফিলিপ। বাগড়া দিয়ো না।'

'বেশ। তুমি বলে যাও।'

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন রাইফেলের কোনো শব্দ পাওয়া গেল না, আমরা তখন মার্সেলার মুখের রক্ত ধুয়ে দিলাম। তারপর আগুনের পাশে বসলাম সবাই।

প্রায় মধ্যরাত পর্যন্তও যখন ফিরলেন না বাবা, চিন্তিত হলাম আমরা। তাঁর যে কোনো বিপদ হতে পারে। কথাটা একবারও মাথায় এলো না। ভাবলাম, নিশ্চয়ই নেকড়েটাকে অনেকক্ষণ ধরে ধাওয়া করছেন বাবা।

'দেখি কিছু দেখা যায় কিনা?' দরজার কাছে যেতে যেতে বলল সিজার।

'সাবধান', বলল মার্সেলা, 'নেড়কেটা কাছে পিঠেই আছে। আমরা ওটাকে মারতেও পারবো না ভাইয়া।'

'খুব সাবধানে দরজা দু'এক ইঞ্চি ফাঁক করে বাইরে তাকাল সিজার।'

BanglaBook.org

'না কিছু দেখা যাচ্ছে না।' বলে আবার এসে বসলো আগুনের ধারে।

'আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি তখনো। সাধারণত বাবাই রান্না করতেন। সুতরাং তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরা চুপচাপ বসে থাকতাম।'

'চলো আমরাই রেঁধে ফেলি আজকে।' বলল মার্সেলা। 'বাবা ফিরে এসে খাবার তৈরি দেখলে খুব খুশি হবেন।' টুলে চড়ে মাংস নামাল সিজার। জানতাম না সেগুলো হরিণের না ভালুকের। মাংস কেটে রান্নায় মনোযোগ দিলাম আমরা। রান্না হলে বাবার জন্য অপেক্ষা করছি, হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এলো শিঙ্গা ফোঁকার শব্দ। বাবা ঢুকলেন। সাথে একজন যুবতী আর শিকারির পোশাক গায়ে একজন বিশালদেহী কালো কুচকুচে লোক।

'কুড়ের বাইরে পা দিয়েই গজ তিরিশেক দূরে একটা বড়সড় সাদা নেকড়ে দেখতে পান বাবা। তাঁকে দেখেই গড় গড় করতে করতে পিছতে থাকে নেকড়েটা। বাবাও এগোন নেকড়েও পিছায়। বাবা গুলি করেননি কারণ তিনি একেবারে এমন দূরত্বে পৌঁছতে চেয়েছিলেন, সেখান থেকে এক গুলিতেই কাজ হয়ে যায়। একসময় নেকড়েটা দাঁড়াল। আক্রমণের পাঁয়তারা নিয়ে মুখোমুখি হলো বাবার। কিন্তু বাবা আরেকটু এগোতেই আবার পিছু হটল ওটা।

সাদা নেকড়ে দুষ্প্রাপ্য, তাই বাবারও গোঁ চেপে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা অনুসরণ করলেন ওটাকে। ডিঙোলেন পাহাড়ের পর পাহাড়।

হার্জ পর্বতমালার কিছু কিছু জায়গা অশুভ। প্রত্যেক শিকারি সেসব চেনে। বাবাও তেমনি একটা জায়গা দেখে থমকে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর মাথার মধ্যে তখন শুধু সাদা নেকড়ে। তোয়াক্কা না করে আবার পিছু নিলেন। এক সময় গতি কমাল নেকড়েটা। পাল্লার মধ্যে আসতেই রাইফেল তুলে সতর্ক নিশানা নিয়ে গুলি করতে যাবেন সেসময় বেমালুম উবে গেল নেকড়েটা। এরকম চোখের সামনে থেকে জলজ্যান্ত একটা প্রাণীর গায়েব হওয়াটা কোনো যুক্তিতেই ফেলা গেল না। শেষমেশ ভাবলেন অত্যন্ত সাদা ঝকঝকে বরফে তাঁর দৃষ্টিভ্রম হয়েছে।

এতদূর ধাওয়া করেও নেকড়েটাকে মারা গেল না ভেবে মন খুব খারাপ হলো বাবার। হঠাৎ শিঙার আওয়াজ। এই সময় গভীর রাতে বনের মধ্যে শিঙা ফোঁকে কে? ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলো। আবার শিঙার শব্দ। আবার। তিনবার শিঙা ফোঁকা একটা সংকেত। বাবাও সেটা ভালো করেই জানতেন। কেউ পথ হারিয়েছে। একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেলেন। হার্জ পর্বতমালার এদিকে অলৌকিক জিনিস প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু গাড়িটা কাছে আসতে দেখলেন না, আমাদের মতোই মানুষ। শিকারীর পোশাক পরা একটা লোক গাড়ি চালাচ্ছে। পেছনে বসে আছে কমবয়সী একটা মেয়ে।

'ভাই, কি কপাল আমাদের, এই গভীর রাতে আপনার দেখা পেলাম।' বাবার দু'হাত চেপে ধরল লোকটা, 'আমরা রাস্তা হারিয়ে সাধের প্রাণটা খোয়াতে বসেছিলাম। আমার মেয়ে ক্ষুধায়, পিপাসায় মরতে বসেছে। আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারেন কি?'

BanglaBook.org

'আমার কুটির আছে মাইল কয়েক দূরে। খুব যে আরামের তা নয়। তবে ওতেই যদি আপনাদের চলে, আসতে পারেন। তা এদিকে কখন এসেছেন?'

'সত্যি বলতে কি বন্ধু, আমরা ট্রানসিলভেনিয়া থেকে পালিয়ে এসেছি। আমার মেয়ের সম্মান এবং আমার জীবন, দুটোরই সংশয় দেখা দিয়েছিল।'

'সাথে সাথে কৌতূহলী হলেন বাবা। মনে পড়ল তিনিও পালিয়েছিলেন বোধ হয়। 'তা আপনি এতো রাতে এখানে কি করছিলেন?'

'একটা বড় সাদা নেকড়ের পিছু নিয়েছিলাম, নাহলে এটা কি বেরোবার সময়?'

'আমরা জঙ্গল থেকে বেরুতেই জন্তুটা আমাদের পাশ কাটিয়ে পালাল,' বীণার এতো স্বর বেজে উঠল মেয়েটির।

'আমি গুলি ছুঁড়ে বসেছিলাম প্রায় আর কি। কিন্তু তখন দেখছি ওটাকে ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছি। নেকড়েটার জন্যই তো দেখা হলো আপনার সাথে।'

'ঘণ্টা দেড়েক পর তাঁরা কুঁড়েতে পৌছুলেন। 'ভালো সময়েই এসেছি দেখা যাচ্ছে', রোস্টের গন্ধ শুঁকলো শিকারী।

'হুঁ। বাচ্চা বাঁধুনীরা রান্না করে ফেলেছে দেখছি। ভালোই হলো। এতো রাতে আর রান্নার ঝামেলায় যেতে হবে না।'

'আমার ঘোড়া রাখার কী হবে?'

'সে হবে।' বাবা মেয়েটিকে বললেন, আগুনের পাশে এসে বসতে। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘোড়া রাখতে।

মেয়েটির বয়স বছর বিশেক। খুবই সুন্দরী। আয়নার মতো ঝকঝকে চুল। আমার দেখা সবচেয়ে উজ্জ্বল দাঁত। কিন্তু মেয়েটির চোখে কি যেন ছিল। এক ধরনের হিংস্রতা যেন লুকিয়ে ছিল ওখানে। সে যখন আমাদের কাছে ডাকল, খুব ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। হাত-পা কাঁপছিল। মেয়েটি আমাদের গা মাথা নেড়ে খুব আদর করল। মার্সেলা কিন্তু একেবারেই কাছে ভিড়ল না। বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল, না খেয়েই। অথচ খাবারের জন্য সেই ছিল সবচেয়ে বেশি আগ্রহী।

তাড়াতাড়িই ফিরলেন বাবা। খাওয়া-দাওয়া সারা হতে শুতে গেল মেয়েটি। বাবা এবং শিকারি বসলেন আগুনের পাশে।

ঘুম আসছিল না আমাদের। জানি না কি কারণে। এই দু'জন আসাতে কুঁড়েটার আবহাওয়াই যেন পাল্টে গেছে। বাবা এবং শিকারিটি কী বলাবলি করছে, শোনার জন্য কান খাড়া করলাম।

'আপনি ট্রানসিলভেনিয়া থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার মনিব আমাকে বাধ্য করতে চেয়েছিল মেয়েটিকে তার হাতে ছেড়ে দিতে। কি আর করি, হান্টিং নাইফটা ব্যবহার করতে হলো।'

'আমরা একই জায়গার লোক। দুর্ভাগ্যেও সমান।'

'তাই নাকি? আপনিও ট্রানসিলভেনিয়া থেকে?'

'হ্যাঁ। এবং আমিও পালিয়েছিলাম প্রাণের ভয়ে কিন্তু আমার গল্পটা একটু করুণ।'

BanglaBook.org

'আপনার নাম?'

'ক্রাঞ্জ।'

'অ্যাঁ? সেই ক্রাঞ্জ? আপনার গল্প আমি শুনেছি। থাক আপনার সেই দুর্ভাগ্যের ঘটনাটি আবার বলার কোনো দরকার নেই। আমি উইলফ্রেড বার্নসডর্ফের। আপনার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হই।'

'শিংয়ের পাত্রে ডুবুডুবু করে মদ ভরে জার্মান ফ্যাশন মোতাবেক একের পর এক পাত্র নিঃশেষ করতে লাগলেন তাঁরা। আরও ঘণ্টাখানেক পর শুয়ে পড়লেন।

'মার্সেলা, গল্পগুলো শুনেছিস?'

'হুঁ। সব। জানো মেয়েটার দিকে তাকাতেই আমার ভয় লাগছিল।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে গেলাম আমরাও।

পরদিন সকালে আরও সুন্দর লাগল মেয়েটিকে। কাছে টেনে সে আদর করল মার্সেলাকে। মার্সেলা কান্না জুড়ে দিল। সেই সাথে চিৎকার।

'শিকারী ও তার মেয়ে মোটামুটি স্থায়ী আসন গেড়ে বসল। ক্রিশ্চিনাকে রেখে বাবাসহ প্রতিদিন শিকারে যেত সে। সাংসারিক কাজকর্ম ক্রিশ্চিনাই করত। এতো ভালো ব্যবহার করত আমাদের সাথে যে, ধীরে ধীরে মার্সেলারও ভয় কেটে গেল। অদ্ভুত পরিবর্তন হলো বাবার। ক্রিশ্চিনার পেছনে সবসময় ঘুর ঘুর করতে লাগলেন। মাস খানেক পরই ক্রিশ্চিনাকে বিয়ের প্রস্তাব করে বসলেন বাবা। উইলফ্রেড ও ক্রিশ্চিনা উভয়ে সম্মতি দেবার পর উইলফ্রেড ও বাবার মধ্যে একটা বৈঠক হলো।

'আমার সন্তান এবং আশীর্বাদ তোমায় দিলাম। আমাকে এখন অন্য কোনো জায়গায় আস্তানা খুঁজতে হবে।'

'কেন? এখানেই থেকে যাও না উইলফ্রেড।'

'আমার থাকা নিয়ে পীড়াপীড়ি করো না। তুমি ক্রিশ্চিনাকে পেয়েছ, ব্যাস।'

'সে জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। আমি যথাসাধ্য ভালোভাবে রাখার চেষ্টা করব তোমার মেয়েকে। কিন্তু অসুবিধা হলো...'

'বুঝেছি, তুমি কী বলতে চাও। এখানে নেই কোনো আইন, নেই কোনো পুরোহিত, তবু একটা অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। এই তো? তুমি যদি আমার রীতি মাফিক চলতে চাও আমিই বিয়ে দিতে পারি তোমাদের।'

'বেশ তো।'

'ক্রিশ্চনার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা কর।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি...।'

'হার্জ পর্বতমালার সমস্ত প্রেতাত্মার নামে...।'

'না।' বাধা দিলেন বাবা। 'স্বর্গের নাম নয় কেন?'

'আগেই তো বলেছি, আমার রীতি মাফিক।'

'বেশ। কিন্তু তুমি কী আমাকে এমন কিছুর নামে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতে চাও যেসবে বিশ্বাস নেই আমার?'

BanglaBook.org

'দেখো, অনেক খ্রিস্টান আমার রীতিতে চলে। তোমার যদি পছন্দ না হয় বলো, আমি ক্রিশ্চিনাকে নিয়ে চলে যাই।'

'না না। তা কেন? তুমি শুরু করো।'

'আমি হার্জ পর্বতমালার সমস্ত প্রেতাত্মার নামে প্রতিজ্ঞা করছি, ক্রিশ্চিনাকে আমি বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম। আমি তার দেখাশোনা করব, ভালোবাসব, বিপদ থেকে রক্ষা করব। কখনো তার কোনো ক্ষতি করব না।'

বাবাও উইলফ্রেডের সাথে এসব বলে গেলেন।

আবার শুরু করল উইলফ্রেড, 'যদি প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হই, প্রেতাত্মাদের সমস্ত প্রতিহিংসা পড়বে আমার এবং আমার সন্তানদের ওপর। শকুন, নেকড়ে বা বনের অন্য কোনো পশু হত্যা করবে তাদের। দেহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বনের মধ্যে পড়ে থাকবে তাদের হাড়।'

'একটু ইতস্তত করলেন বাবা। তারপর উচ্চারণ করলেন কথাগুলো। শেষ শব্দটা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মার্সেলা। খেঁকিয়ে উঠলেন বাবা। মার্সেলা চুপ করল।

পরদিনই চলে গেল উইলফ্রেড।

বাবা ও নতুন মা আমাদের ঘরেই বিছানা পাতলেন। মা বিয়ের পর সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি ধরল। বাবার অনুপস্থিতিতে সে প্রায়ই আমাদের মারতে লাগল। বিশেষ করে মার্সেলার দিকে তাকিয়ে তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরত।

এক রাতে আমাকে ও সিজারকে ডেকে তুলল মার্সেলা।

'কি হয়েছে?' ঘুম জড়ানো গলায় বলল সিজার।

'ক্রিশ্চনা বাইরে গেছে।'

'কি বললি? বাইরে গেছে? এত রাতে!'

'হুঁ।' সে উঠে দেখল বাবা অঘোরে ঘুমুচ্ছেন, তারপর রাতের পোশাক পরেই বাইরে চলে গেল।'

এই প্রচণ্ড শীতের রাতে সে নাম মাত্র কাপড় গায়ে দিয়ে বাইরে গেল কেন বুঝতে পারলাম না। ঘণ্টা খানেক পর জানালার কাছ থেকে ভেসে এলো নেকড়ের গর্জন।

'নেকড়েটা ওকে খেয়ে ফেলবে।' বলল সিজার।

'না না।' আর্তনাদ করে উঠল মার্সেলা।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের নতুন মা ঘরে ঢুকে আস্তে ছিটকিনি লাগাল যাতে বাবা টের না পান। পানি দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল বাবার পাশে।

'আমরা তিনজনই ভয়ে কাঁপছিলাম। তবু আমরা পরের রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। ক্রিশ্চিনা সে রাতেও বাইরে গেল। প্রতি রাতেই যেতে লাগল। সে বাইরে যাবার সাথে সাথে জানালার কাছ থেকে ভেসে আসত নেকড়ের গর্জন। ফিরেই প্রথমে ভালো করে মুখ ধুতো ক্রিশ্চিনা, তারপর বিছানায় যেত। আমরা খেয়াল করেছিলাম, সে খেত না বললেই চলে। যদিও বা খেত, খুব অনীহা নিয়ে। এবং মাংস রান্না করার সময় প্রায়ই সে টুক করে কাঁচা এক টুকরো মাংস মুখে ফেলত।

BanglaBook.org

সিজার ছিল সাংঘাতিক দুর্দান্ত টাইপের ছেলে। সে বাবাকে কিছু বলল না। ঠিক করল, ক্রিশ্চিনা বাইরে গেলে সে অনুসরণ করবে। অনেক বুঝিয়েও তাকে ক্ষান্ত করা গেল না। এক রাতে ক্রিশ্চিনা বাইরে যাবার সাথে সাথে উঠে পড়ল সিজার। বাবার রাইফেলটা নিয়ে চলে গেল বাইরে।

চিন্তা করো ফিলিপ, সিজার বাইরে যাবার পর আমাদের দু'ভাইবোনের কী অবস্থা। কিছুক্ষণ পর দড়াম করে গুলির শব্দ হলো। বাবা তবু জাগলেন না। ভয়ে কাঁপতে লাগলাম আমরা। একটু পরেই ঘরে ঢুকল ক্রিশ্চিনা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার পোশাক। আমার নিজেরই অবস্থা কাহিল, তবু সে অবস্থাতে মার্সেলার মুখে হাত চাপা দিলাম, যেন চিৎকার করে না ওঠে। বাবা তখনও ঘুমিয়ে আছেন দেখে বাইরে গেল ক্রিশ্চিনা। কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালাল।

'কে ওখানে?' বাবা জাগলেন।

'আমি ডার্লিং। তুমি আবার উঠছ কেন? পানি গরম করছি। গলাটা ব্যথা করছে।'

পাশ ফিরে ফের ঘুমোলেন বাবা। কাপড় পাল্টালো ক্রিশ্চিনা। পুরনো কাপড়টা আগুনে ফেলে দিলো। ডান পা থেকে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে তার, যেন গুলি লেগেছে পায়ে। তারপর পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে সারারাত আগুনের ধারে কাটিয়ে দিল।

মার্সেলা জড়িয়ে ধরল আমাকে, 'সিজার কোথায় ভাইয়া?'

পরদিন সকালে জীবনে প্রথমবারের মতো বাবার মুখোমুখি হলাম, 'আমাদের ভাই, সিজার কোথায় বাবা?'

'সিজার? সে আবার কোথায় যাবে? আছে কোথাও।'

'গত রাতে ঘুমের মধ্যে মনে হলো ছিটকিনি খুলে যেন কেউ বাইরে গেল। আরে! আপনার রাইফেলটা কোথায় বাবা?'

বাবা দেখলেন তাঁর রাইফেলটি উধাও হয়েছে। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চুপচাপ থাকার পর বড় একটা কুঠার হাতে পা বাড়ালেন তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাবা ফিরলেন। তার সাথে ফিরল সিজারের ছিন্নভিন্ন দেহ। টুলে বসে পড়ে মুখ ঢাকলেন বাবা।

ক্রিশ্চিনা উঠে দেখল। আমি আর মার্সেলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে লাগলাম।

'যাও ঘরে যাও।' তীব্র স্বরে চেঁচাল সে। 'তোমার ছেলে রাইফেল নিয়ে নেকড়ে মারতে বেরিয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় নেকড়েটা ছিল বেশি চালাক। আহা বেচারি!'

বাবাকে সবকিছু খুলে বলতে চাইলাম আমি। বলতে দিলো না মার্সেলা। আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রাখল।

যদিও কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না কিন্তু আমার এবং মার্সেলার বারবার মনে হতে লাগল এসবের সাথে নতুন মা জড়িত আছে।

কবর খুঁড়লেন বাবা। সিজারের হাড়গোড় নামালেন তাতে। ওপরে চাপালেন পাথরের পর পাথর, যাতে নেকড়েগুলো আবার কবর খুঁড়তে না পারে। খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন বাবা। দিনের পর দিন ঘরে বসে কাটালেন; যা তাঁর ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না।

BanglaBook.org

বাবার এই দুঃখের সময়ও আমাদের নতুন মার নৈশ ভ্রমণ কিন্তু নিয়মিত চলতেই থাকল।

অবশেষে রাইফেল হাতে একদিন বেরোলেন বাবা। ফিরলেন একটু পরেই। 'ওহ-হো-হো, তুমি কল্পনা করতে পারো ক্রিশ্চিনা, হারামজাদা নেকড়েগুলো আবার কবর খুঁড়েছে। এখন বাছার আমার হাড় ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই।' আহ হা বুক চাপড়ে বিলাপ করতে লাগলেন বাবা।

'রোজ রাতে আমাদের জানালার পাশে নেকড়ে ডাকে বাবা।' বললাম আমি।

'তাই নাকি? আমাকে বলিসনি কেন? এবার ডাক শুনলে আমাকে ডেকে তুলিস তো বাছা।'

ক্রিশ্চিনার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঝরতে লাগল। ঝিকিয়ে উঠল হিংস্র দাঁত।

সিজারের কবরের ওপর আরো ভারি ভারি পাথর চাপা দিলেন বাবা।

বসন্ত এসে গেল। বরফ নিলো ছুটি। আমরাও কুঁড়ের বাইরে বেরোতে লাগলাম। কিন্তু যেখানেই যাই, মার্সেলাকে ছাড়তাম না কখনো। বাবা আবার চাষাবাদে মন দিলেন। আমি সাধ্য মতো সাহায্য করতে লাগলাম তাঁকে।

কাজ করার সময় ছোট্ট মার্সেলা বসে থাকত পাশে। ক্রিশ্চিনা একা থাকত কুটিরে। বসন্তকালের সাথে সাথে সেও বদলে গেল অনেকখানি। রাতে সে আর বাইরে যায় না। নেকড়ের ডাকও শোনা যায় না জানালার পাশে।

একদিন আমরা যথারীতি কাজ করছি। মার্সেলাও বসে আছে পাশে। এমন সময় ক্রিশ্চিনা এসে বলল, সে বনে যাবে কিছু শেকড়-বাকড় তুলতে। অতএব মার্সেলার কুঁড়েতে থাকা দরকার। চলে গেল মার্সেলা।

ঘণ্টা খানেক পর কুটির থেকে ভেসে এলো মার্সেলার চিৎকার। নিশ্চয়ই আগুনে পুড়িয়েছে নিজেকে, আমি হাতের কোদাল ছুঁড়ে ফেললাম। বাবা ও আমি দৌড় দিলাম কুটিরের দিকে। কুটিরে ঢুকেই দেখলাম মুমূর্ষু মার্সেলাকে। সারা শরীর ছিন্নভিন্ন। রক্তে ভেসে গেছে উঠান। বাবার ধাত হিসেবে তখনই রাইফেল হাতে বাইরে ছুটে বেরোনো উচিত। কিন্তু এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য তাঁকে হতবাক করে দিলো। মরণোন্মুখ সন্তানের পাশে বসে থেকে কাঁদতে লাগলেন অঝোরে। কয়েক সেকেন্ড করুণভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল মার্সেলা। তারপরই তার সুন্দর চোখ দুটো বুজে গেল। আমাদের চিরদিনের মতো ছেড়ে গেল সে।

বাবা আর আমি বিলাপ করছি, এমন সময় ক্রিশ্চিনা এলো। এ দৃশ্য দেখে সেও হা হুতাশ করল কিছুক্ষণ।

আহা রে! এটা নিশ্চয় সেই বড় সাদা নেকড়েটা। আমার পাশ দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে গেল।

এই দ্বিতীয় আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না বাবা, এমন একটা ধারণা হলো আমার। কবর দেয়া ভুলে মার্সেলার মৃতদেহের পাশে বসে থাকলেন বাবা। বুক চাপড়ালেন। ক্রিশ্চিনা সবসময় বলছিল কবর দিতে। অবশেষে সিজারের কবরের পাশেই

BanglaBook.org

একটা কবর খুঁড়ে মার্সেলাকে সমাধিস্থ করা হলো। এবার খুব সাবধান হলেন বাবা। যাতে কোনো মতেই নেকড়েরা মার্সেলার মৃতদেহ আর কবর থেকে তুলতে না পারে।

এবার সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম আমি। যে বিছানায় সিজার, মার্সেলা ঘুমাতো আমার পাশে, সেখানেই আমি থাকতে লাগলাম। একা। দুটো মৃত্যুর জন্যে আমার নতুন মা দায়ী এটাও মনে করতে পারলাম না। আবার সে যে নির্দোষ তাও ভাবতে পারলাম না। তবে তাকে দেখে ভয়-ডর আর ছিল না আমার। ছোট্ট হৃদয়টা ঘৃণা এবং প্রতিহিংসার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

মার্সেলাকে কবর দেয়ার পরের রাতেও বেরোলো ক্রিশ্চিনা। একটু অপেক্ষা করে আমিও বিছানা ছাড়লাম। বাইরে পরিষ্কার চাঁদের আলো। সিজার এবং মার্সেলার কবর দেখতে পেলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখি ক্রিশ্চিনা তাড়াহুড়ো করে মার্সেলার কবরের পাথর সরাচ্ছে দু'হাতে।

'তার সাদা পোশাক চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। বুঝতে পারছিলাম না কী করব। শেষমেশ যখন দেখলাম সে মার্সেলার মৃতদেহ তুলে পাশে রাখল আর সহ্য করতে পারলাম না। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে ডাকলাম, 'বাবা বাবা, ওঠেন ওঠেন, তাড়াতাড়ি ওঠেন। রাইফেল বের করেন।' চমকে জাগলেন বাবা। 'নেকড়েগুলো আবার বেরিয়েছে বুঝি?'

তাড়াহুড়োয় বাবা খেয়াল করলেন না তাঁর স্ত্রী বিছানায় নেই। বাবার পিছু পিছু আমিও বেরোলাম।

বাবা যখন দেখলেন (এই দৃশ্যের জন্য তিনি নিশ্চয়ই তৈরি ছিলেন না) তাঁর স্ত্রী তাঁরই প্রিয় মার্সেলার দেহ থেকে বড় বড় মাংসের টুকরো ছিঁড়ে গ্রোগ্রাসে গিলছে, চিন্তা করো ফিলিপ বাবার অবস্থাটা। ক্রিশ্চিনা অবশ্য আমাদের উপস্থিতি টের পেল না। বাবার হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল। খাড়া হয়ে গেল মাথার সব কটা চুল। আমারও। হঠাৎ করে বাবা যেন প্রাণ পেলেন। রাইফেল তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করলেন। টেনে দিলেন ট্রিগার। সাথে সাথে চিৎকার করে কাৎ হয়ে পড়ে গেল রাক্ষুসী।

গুলি করেই গর্বে চিৎকার ছাড়লেন বাবা।

কিছুক্ষণ পর উদভ্রান্তের মতো বাবা বললেন, 'আমি কোথায় আছি? কী হয়েছে এখানে?' তারপরই দু'হাতে মুখ ঢাকলেন, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে আমার। হে ঈশ্বর ক্ষমা করো আমাকে।'

আস্তে আস্তে আমরা কবরের কাছে গেলাম। যেখানে থাকার কথা নতুন মার মৃতদেহ, সেখানে পড়ে আছে একটা মাদি সাদা নেকড়ে।

'এই সেই সাদা নেকড়ে যার পিছু নিয়েছিলাম আমি। এতদিন বুঝলাম হার্জ পর্বতমালার প্রেতাত্মাদের সাথে কি ভয়ংকর খেলাতেই না আমি মেতেছিলাম।'

কিছুক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলেন বাবা। তারপর মার্সেলার মৃতদেহ আবার কবরে নামিয়ে ওপরে পাথর চাপা দিলেন। হঠাৎ করেই পাগলের মতো নেকড়েটার মাথা বুট দিয়ে থেঁতলে দিতে লাগলেন।

BanglaBook.org

সকালে ঘুম ভাঙল উইলফ্রেডের চিৎকারে।

'আমার মেয়ে কই ক্রাঞ্জ? কই আমার মেয়ে?'

'তার যেখানে থাকার কথা সেখানে। নরকে। তুমি ভাগো নইলে কপালে খারাবি আছে।' গলা চড়ালেন বাবা।

'হাঃ হাঃ হাঃ। মানুষ হয়ে হার্জ পর্বতমালার প্রেতাত্মার ক্ষতি করতে চাস? সাহস তো কম নয়।'

'ভাগ শালা রাক্ষস। নইলে তোকে সুদ্ধ তোর ক্ষমতার বারোটা বাজিয়ে দেব।'

'এখনও সাহস আছে দেখছি। শপথের কথা মনে নেই? আমি কোনো দিন তার কোনো ক্ষতি করব না?'

'খারাপ প্রেতাত্মার সাথে কোনো চুক্তি আমার নেই।'

'চুক্তি করেছিস তুই। বলেছিলি, শপথ ভাঙলে তুই হবি প্রেতাত্মাদের প্রতিহিংসার শিকার। তোর সন্তানদের টেনে ছিঁড়ে খাবে নেকড়ে শকুন।'

'ভাগ, ভাগ হারামজাদা।'

'বনের মধ্যে পড়ে থাকবে তাদের হাড়। হাঃ হাঃ হাঃ।'

বাবা তাঁর কুঠারটা দিয়ে আঘাত করলেন উইলফ্রেডকে। কুঠার তার দেহ ভাগ করে দিয়ে চলে গেল, যেন বাতাস কেটে গেল। কিছুই হলো না তার। ভারসাম্য হারিয়ে বাবা পড়ে গেলেন হুড়মুড় করে।

'মরণশীল তুচ্ছ মানুষ! আমরা তোদের ওপর তখনই প্রভুত্ব করার সুযোগ পাই, যখন তোরা হত্যা করিস। তুই দু'জনের হত্যাকারী। তোর দুটো বাচ্চা মরেছে। তুই শপথ ভেঙেছিস, এটাও মরবে। তোকে মারলাম না কারণ তাহলে কষ্ট থেকে রেহাই পাবি। বেঁচে থেকে কষ্টভোগ কর।'

চোখের সামনে উবে গেল প্রেতাত্মাটি।

বাবা এই ঘটনার পরপরই কুটির ত্যাগ করে হল্যান্ডে চলে যান। কিছুদিন পর তাঁর ব্রেন ফিভার হয়। পাগল হয়ে মারা যান বাবা। তারপর থেকে তুমি তো জানোই ফিলিপ, সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। আমার কেন জানি মনে হয়, আজ হোক কাল হোক, আমাকেও কোনো না কোনোদিন ওই প্রেতাত্মার প্রতিহিংসার বলি হতেই হবে।

চুপ করল ক্রাঞ্জ।

দুই.

বাইশ দিনের মাথায় সুমাত্রার উচ্চ ভূমি অঞ্চলগুলো দেখা যেতে লাগল। আর কোনো হাজাজের দেখা না পেয়ে, ওরা প্রণালী ধরেই এগোবে ঠিক করল। সারাদিন রোদের নিচে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। ঘুমায় রাতের শিশিরের নিচে। শরীরের কোনো ক্ষতি অবশ্য হলো না। বড় বড় দাড়ি এবং মুসলমানদের পোশাকে ওদের চেহারা হলো সুমাত্রার স্থানীয় লোকদের মতোই।

নিজের পরিবারের গল্প ফিলিপের কাছে বলার পর থেকে একেবারেই চুপচাপ হয়ে গেছে ক্রাঞ্জ। বিষণ্ন মনে সবসময় কি যেন ভাবে। জিজ্ঞেস করেও কোনো সদুত্তর পায় না ফিলিপ।

BanglaBook.org

একদিন ফিলিপ জিজ্ঞেস করল, গোয়াতে পৌঁছে তারা কী করবে?

'কেন যেন মনে হচ্ছে শহর দেখা কপালে নেই আমার।' বলল ক্রাঞ্জ।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?'

'না। আমি সুস্থ। শরীর-মন দুদিক থেকেই। কে যেন আমার ভেতরে বারবার আওড়াচ্ছে কথাটা। আমার একটা কথা রাখো ফিলিপ। আমার বেশকিছু সোনা আছে। তুমি সেগুলো নাও।'

'কি বাজে বকছ?'

'বাজে আমি বকছি না ফিলিপ। বিপদের সময় কী তোমার ইন্দ্রিয় তোমাকে সাবধান করে দেয় না?'

'তা দেয়।'

'তাহলে কেন সেটা আমাকে সাবধান করে দিতে পারবে না? তুমি খুব ভালো করেই জানো, মৃত্যুভয় নেই আমার। বিশ্বাস করো, সে যেন আমার ভেতরে অহরহ বলছে আমি আর বেশি দিন নেই।'

'তোমার মাথায় গড়বড় হয়েছে। তোমার মতো একজন যুবক, যার এখনও অনেক কিছু ভোগ করার বাকি আছে, কেন অযথা মরতে যাবে? দেখো, আগামীকালই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'হয়তো। তবু আমার অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। সোনাগুলো নাও। যদি আমরা নিরাপদে পৌঁছি, আবার না হয় ফেরত দিয়ে দিয়ো।'

এতদিন ওরা এগোচ্ছিল এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়-পর্বতের মধ্য দিয়ে। এবার দৃশ্যপট বদলাতে লাগল। পাহাড়-পর্বতের পরিবর্তে এবার ধীরে ধীরে দেখা গেল জঙ্গল। এগোতে হবে জঙ্গলের মধ্য দিয়েই। এক জায়গায় ভালো পানি পেয়ে জাহাজ ভিড়াল ওরা। জাহাজের পানির পাত্রগুলো ভরতে হবে।

ফিলিপ বলল, 'দেখেছ তো কি রকম ভিত্তিহীন তোমার সন্দেহ? এরপরও বিশ্বাস কর তোমার কোনো ক্ষতি...।'

কথা শেষ করতে পারল না ফিলিপ। তীব্র একটা গর্জন ভেসে এলো। একটা বাঘ বিদ্যুতের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্রাঞ্জকে মুখে নিয়ে আবার তীরের মতো জঙ্গলে ঢুকে গেল। বিস্ফারিত হয়ে গেল ফিলিপের চোখ। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না সে।

'হায় হায় ক্রাঞ্জ, বন্ধু, কোথায় চলে গেলে তুমি?' হু হু করে কেঁদে ফেলল ফিলিপ। তার হাতে ক্রাঞ্জের সোনাগুলো।

ঠিকই বলেছিল ক্রাঞ্জ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল ফিলিপ। মিথ্যা সংবাদ দেয়নি ওর মন। এই হয়তো ছিল তার নিয়তি। তার বাবার শপথ, ভঙ্গ করলে আমার সন্তান-সন্ততির হাড় পড়ে থাকবে জঙ্গলের মধ্যে... ফলে গেল।

এতদিন হয়তো সেই শিকারীরূপী অশুভ প্রেতাত্মা আর তার নেকড়ে কন্যার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হলো।

BanglaBook.org

ঘুম প্রাসাদ

অ্যানা কাভান

হাসপাতালের বাগানে প্রবল বেগে বইছে ঝড়ো হাওয়া। উন্মত্তের মতো, যেন জানে এটা একটা মানসিক হাসপাতাল। তাই পাগলামি আরো বেড়ে গেছে বাতাসের। শুরুতে এক বা দু'দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল। এখন চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছে। নার্সদের কোয়ার্টারের পেছনের একটা কোণ থেকে পাগলা বাতাস হুংকার ছেড়ে ছুটে আসে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিল্ডিং-এর সম্মুখ ভাগে দানবীয় শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে। এক সিস্টার দ্রুত এগোলো এন্টাঞ্চের দিকে। বাতাসের ঝাটকায় নিমিষে তার মাথার ক্যাপ হাওয়া। হাওয়ার প্রবল ঝাপটা অবশ্য হলঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ওখানে দুই ডাক্তার বসে গল্প করছিলেন।

হাসপাতালের চার্জে যিনি আছেন সেই ডাক্তারের বয়স পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি, মুখটা লাল, হাসি-খুশি, মাথার চুল ধবধবে সাদা। বাতাসের হুংকার অগ্রাহ্য করে গল্প বলছিলেন তিনি তাঁর সঙ্গীকে।

পরদিন সকালে যখন মেয়েটিকে দেখতে গেলাম, সে তখন একটা বেডশিট ছিঁড়ছিল টুকরো টুকরো করে। ওকে নরম সুরে বললাম, 'কাজটা পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে না? চট করে জবাব দিলো সে, এখানে পাগলামি করব না তো কোথায় করব? বলেই দরাজ গলায় হেসে উঠলেন ডক্টর। দারুণ চালাক না?

তাঁর সঙ্গীও একজন ডাক্তার। বয়সে তরুণ, মুচকি হাসল জবাবে। উত্তর থেকে এসেছে ভিজিটর হিসেবে, হাসপাতালটি ঘুরে দেখবে। স্বল্পভাষী সে, হাসি-ঠাট্টা তেমন পছন্দ করে না। আর পাগলদের নিয়ে ইয়ারকি তো একেবারেই অপছন্দ তার। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আমার হাতে সময় খুব কম। আপনি বলেছিলেন পেয়িং-ব্লকটা দেখাবেন?'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়িং-ব্লক। ওটা অবশ্যই আপনার দেখে যাওয়া উচিত। প্রাইভেট ওয়ার্ডগুলো নিয়ে আমরা যথেষ্ট গর্ব অনুভব করি।

দরজা খুলে বেরুলেন দু'জনে। বাতাসের ঝাপটায় নিজেদের অজান্তেই নিচু হয়ে গেল মাথা। উল্লাস আর আনন্দ নিয়ে পাগলা হাওয়া হামলা চালালো তাঁদেরকে। নুড়ি বিছানো রাস্তাটা বাগানের মাঝখান দিয়ে গেছে। বাগানের ফ্লাওয়ার বেডগুলো খালি,

BanglaBook.org

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বাতাসে লম্বা ঘাস নুয়ে পড়ছে, উন্মত্তের মতো ঝাঁকাঝাঁকি করছে নগ্ন গাছগুলোর ডালপালা।

দুই ডাক্তার মাথা নুয়ে পাশাপাশি হাঁটছেন। দ্রুত পায়ে ঝড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লম্বা, হাঁটের দালানটাতে পৌঁছে গেলেন। দরজার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন সুপারিনটেনডেন্ট, সাদা চুলে হাত বোলালেন। সামান্য হাঁপিয়ে গেলেন তিনি।

ঘুম-প্রাসাদ স্বাগতম, অবশেষে বললেন তিনি হাসিমুখে। এখানে যেসব রোগী আছে তারা সবাই ঘুমিয়ে থাকে। কেউ কেউ দীর্ঘদিন, কেউবা কয়েক দিন। অচেতন রোগীদের আস্তানা এটা।

চওড়া করিডোরটা ঠাণ্ডা। দেয়াল ধবধবে সাদা। বাম দিকে অসংখ্য দরজা। বিপরীতে জানালা দেখা গেল। জানালাগুলো অনেক উঁচুতে, গরাদ দেয়া। জানালার ওপর বসানো বাতি আলো ছড়াচ্ছে, সাদা দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে, যেন বরফের তৈরি। মেঝেটা রবার দিয়ে মোড়া, হাঁটলে শব্দ হয় না। জানালার নিচে দেয়ালের সাথে একটা হ্যান্ডরেইলও দেখা গেল।

করিডোরের শেষ মাথার একটা দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো এক নার্স। তার কাঁধে হেলান দিয়ে আছে লাল ড্রেসিং গাউন পরা একটি মেয়ে। নার্স তাকে শক্ত করে ধরে আছে। হাঁটার সময় তবু সে টলে উঠল। মাথাটা এদিক-ওদিক দুলছে ঘাড়ভাঙা পুতুলের মতো, মুখখানা ম্লান ও বিবর্ণ, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রাণ, মাতালের মতো। উলেন স্লিপার পায়ে তার লম্বা নাইট ড্রেসের ঝুল বেঁধে যাচ্ছে পায়ে। শরীরের সমস্ত ওজন চাপিয়ে দিয়েছে সে নার্সের গায়ে।

'ওকে শক্ত করে ধরে রাখো টপসি।' বললেন সুপারিনটেনডেন্ট। নার্স রোগিনীকে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল। মেয়েটা হোঁচট খাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে মরিয়া দৃষ্টিতে। নার্স দৃশ্যটা দেখেও দেখছে না। কি একটা গানের সুর ভাঁজছে আপন মনে।

ওই রোগিনীর ট্রিটমেন্ট আর দু'এক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ফিজিশিয়ান ইনচার্জ বললেন তাঁর ভিজিটারকে। তবে অচেতন অবস্থায় কী করেছে না করেছে তার কোনো কিছুই অবশ্য মেয়েটির মনে থাকবে না। এখন অচেতন অবস্থাতেই আছে ও, যদিও হাঁটতে দেখছেন ওকে।

করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে নানা টেকনিক্যাল দিকগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা চালিয়ে গেলেন তরুণ ডাক্তারের সাথে। দু'একটা প্রশ্নও করলেন। যন্ত্রের মতো সেসব প্রশ্নের জবাব দিলো ডাক্তার। তবে অস্বস্তি অনুভব করছে সে। ভাবছে, একটু আগে দেখা দৃশ্যটিকে নিয়ে।

করিডোরের আরেকটি দরজা খুলে গেল। ওঁরা পাশ দিয়ে যাবার সময় বেরিয়ে এলো এক নার্স। হাতে এনামেলের ট্রে। কাপড় দিয়ে কী একটা জিনিস ঢেকে রেখেছে। প্যারলিডিহাইড (নিদ্রাকর্ষক ভেষজ)-এর বিকট গন্ধে বমি এসে গেল তরুণ ডাক্তারের। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হাসল বৃদ্ধ ফিজিশিয়ান।

BanglaBook.org

আমাদের লোকাল পারফিউমের গন্ধ তাহলে আপনার পছন্দ হয়নি, না? তবে এতো গন্ধে আমরা এতো অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, আজকাল আর ওটা নাকেই লাগে না। দু'একজন রোগী বলেছে তাদের নাকি এ গন্ধ বেশ ভালোই লাগে।

নার্স যে ঘর থেকে বেরিয়েছে ওটাতে ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধা তাঁর ভিজিটরকে নিয়ে। এ ঘরও বমি ওঠা গন্ধে বোঝাই। বৃদ্ধা দেখেন সাদা একটা বিছানায় টান টান শুয়ে আছে একটি মেয়ে, চোখ বোজা। বালিশে তার সমৃণ চুল লুটাচ্ছে, মুখখানা ভীষণ বিবর্ণ, প্রাণের চিহ্নও যেন নেই, চোখের চারপাশে কালি। সুপারিনটেনডেন্ট মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালেন। নিজের কাজে তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট একজন মানুষের মতোই লাগছে তাকে।

আগামী আট ঘণ্টা ও একটুও নড়াচড়া করবে না, বললেন তিনি। তারপর ওকে গোসল করানো হবে, খাওয়ানো হবে। তারপর আরো আট ঘণ্টার জন্য ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব আমরা।

তরুণ ডাক্তার মেয়েটির বিছানার ধারে চলে এলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ঘুম-প্রাসাদের রোগীদের অচেতন অবস্থায় রেখে চিকিৎসা চালানোর ব্যাপারটি ঠিক তার পছন্দ হয়নি। তার কেমন কষ্ট হচ্ছে। সে বলল, 'সাইকো নিউরোটিকদের এ ধরনের ট্রিটমেন্টকে কিভাবে সমর্থন করব ঠিক বুঝতে পারছি না।...' হঠাৎ থেমে গেল সে। বন্ধ চোখের পাতার নিচে কেঁপে উঠেছে মেয়েটির চোখের মণি। আতঙ্কিত হয়ে সে লক্ষ্য করল খুলে গেছে পাতা জোড়া, অনেক কষ্টে, যেন অনেক ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে, সরাসরি তার দিকে তাকাল মেয়েটি। সে কী ভুল দেখছে? মনে মনে ভাবল ডাক্তার। মেয়েটির চোখে পরিষ্কার আতঙ্ক আর ভয় দেখতে পাচ্ছে সে। মোটেই পাগলের চাউনির মতো লাগছে না। যেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেয়েটিকে অচেতন অবস্থায় রাখা হয়েছে, বন্দি হয়ে আছে সে, মুক্তি চাইছে যন্ত্রণাকর এই পরিবেশ থেকে।

'ও কিন্তু সচেতন নয়', অশুভ শোনালো ফিজিশিয়ানের কণ্ঠ। তাকিয়ে আছে স্রেফ রিফ্লেক্সের কারণে। মেয়েটি আমাদের দেখছে না বা আমাদের কথা শুনতেও পাচ্ছে না।

ধর্মযাজকের মতো পবিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন তিনি। পা বাড়ালেন খোলা দরজার দিকে। তরুণ ডাক্তার আরো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বিকট গন্ধ ভরা ঘরে। ইতস্তত ভঙ্গিতে আবার তাকাল মেয়েটির দিকে। এখনো আগের মতোই তাকিয়ে আছে সে ডাক্তারের দিকে। তারপর আপনা-আপনি বুজে এলো চোখ। দারুণ অস্বস্তি নিয়ে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ডাক্তার, ভাবল ঘুম প্রাসাদে না এলেই ভালো হতো তার জন্যে।

BanglaBook.org

প্যালেস অব স্লিপ **অনুবাদ : অপু রায়হান**

রাজকীয় কুকুর

আয়ান ফোলেজ গর্ডন

পিকিনিজ নামের ঝাঁকড়া চুলের লোমশ কুকুরগুলো বহু বছর ধরে চীনের 'রাজকীয় কুকুর' হিসেবে পরিচিত। চীনের সম্রাট বা রাজবংশ ছাড়া আর কারো এ ধরনের কুকুর পোষার অধিকার নেই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তখনকার চীনের সম্রাট ভ্রাতৃত্ব আর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে দুটো পিকিনিজ কুকুর ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের উপহারস্বরূপ পাঠাতে মনস্থ করলেন।

সম্রাট-এর উপহার যেনতেনভাবে তো আর পাঠানো যায় না। দুটো ভালো জাতের পিকিনিজ কুকুরকে আইভরির খাচায় বন্দি করে রাজকীয় বহরে চাপিয়ে দেয়া হলো। পিকিনিজ কুকুরগুলোর আদর-যত্ন যেন ভালোভাবে নেওয়া হয়– সেটা তদারকি করার জন্য অপরূপা সুন্দরী এক রাজকুমারীকেও সাথে পাঠানো হল।

চায়না আর এশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, পথঘাট পেরিয়ে অবশেষে রাজকীয় বহরটি কৃষ্ণ সাগরের তীরে এসে থামল। পথিমধ্যে পাঁচটি কুকুর ছানার জন্ম হলো। কৃষ্ণসাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য বন্দরে একটি ব্যয়বহুল এবং চমৎকার নৌবহর অপেক্ষা করছিল। কুকুর ছানাসহ রাজকুমারী আর সঙ্গীরা আরো এক দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু সমুদ্র যাত্রার কিছুদিন পরেই নৌযানটি যখন জিব্রালটারের নিকটস্থ হারকিউলিসের পিলার পার হচ্ছিল, ঠিক তখনই বিপত্তি ঘটল। ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়ে রাজকীয় নৌবহরটি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অবশেষে নিকটস্থ এক ফরাসি বন্দরে জীর্ণ জাহাজটি নোঙ্গর ফেলল। নতুন একটি ফরাসি জাহাজ ভাড়া করে কুকুরসহ রাজকুমারীকে সেখানে উঠিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু ফরাসি জাহাজটি কিছুদিন আটলান্টিক মহাসাগরে চলার পর আবার দুর্যোগের সম্মুখীন হলো। জাহাজের নাবিক আর ক্রুদের মাঝে আগে থেকেই চাইনিজ রাজকুমারী, তার সঙ্গী আর অদ্ভুত দর্শনের কুকুরগুলোর ব্যাপারে এক ধরনের কুসংস্কার জন্ম নিয়েছিল। জাহাজটি যখন আটলান্টিক বেয়ে টেমস নদীর মোহনায় বাঁক নিচ্ছিল, ভয়ঙ্কর উপকূলীয় ঝড়ে ওটার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ল। জাহাজের ক্রুদের কুসংস্কার এবার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো। কুকুর আর রাজকুমারীদের তারা তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করল। অবস্থা বেগতিক বুঝে রাজকুমারী আর তার সঙ্গীরা কুকুরসহ সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

BanglaBook.org

ঝড় অবশেষে থেমে গেল। জাহাজের ক্যাপ্টেন তাদের দোষ ঢাকতে আঁকাবাঁকা করে জাহাজের চেহারা বদলে ফেলল। ফ্রান্সের বন্দরে গিয়ে ওরা মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দিলো যে, রাজকুমারী আর জাহাজের অন্যান্য যাত্রীসহ জাহাজটি ভয়াবহ ঝড়ের কবলে পড়ে আটলান্টিকের গহীন জলে তলিয়ে গেছে।

কিছুদিন পর ইংলিশ উপকূলে চীনা মানুষ ও রাজকুমারীসহ কুকুরগুলোর মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল। এদিকে জাহাজের এক নাবিককে ঝড়ের সময় পিকিনিজ কুকুরগুলোর একটি কামড় দেয়ায় তার মাঝে রেবিজ বা জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিলো। লোকটি অবশেষে উন্মত্ত অবস্থায় মারা গেল। সমগ্র ঘটনাটি অন্যান্য নাবিকের মাঝে এমন আতঙ্কের ছাপ ফেলল, তারা রাজকুমারী, তার সঙ্গী আর কুকুরগুলোর সলিল সমাধির কথা বেমালুম চেপে যাবার চেষ্টা করেও পারল না।

বিবেকের তাড়নায় অনেকেই ঘটনাটি ফাঁস করে দিলো। তবে এ ঘটনা পরবর্তীতে তেমন কোনো আলোড়ন তোলেনি। কেননা সে সময় ফ্রান্সে চার্চ আর রাজতন্ত্রের মাঝে ভয়ানক গোলযোগ চলছে। অন্যান্য ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় কর্তৃপক্ষের ছিল না বললেই চলে। এদিকে চায়নার সম্রাটের কানে শুধু এ খবরই পৌছাল যে তার উপহার স্বরূপ কুকুরগুলো আর রাজকুমারী ইংল্যান্ডে পৌছানোর আগেই ডুবে মারা গেছে।

ল্যান্ডমএন্ডের সমুদ্র তটে ঘুরে বেড়ানোই পিটারের কাজ। পিটার ঘুম থেকে উঠেই ছুটে যায় সমুদ্রের তীরে। রঙ বেরঙের পাথর আর ঝিনুক ভাটার সময় হলেই পিটারকে যেন ডেকে আনবে বিস্তীর্ণ তীরে। একদিন পিটার সেদিনও সমুদ্রের তীরে ভাটার টানে ভেসে আসা ঝিনুক আর পাথরগুলোর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল আইভরির বাক্সটি। বাক্সটি খুলতে সাতটি মৃত কুকুরের দেহ এলিয়ে পড়ল। কাছেই মাটি খুড়ে আরো কিছু চীনা মানুষের মৃতদেহ আবিষ্কার করল। এরপর সে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে নিকটস্থ জেলেদের ঘটনাটা জানাল। জেলেরা মৃত মানুষগুলোর দামি কাপড়-চোপড় আর পরনের গহনাগুলো খুলে রেখে ওদের খবর দিলো। মৃত মানুষের সৎকার করতে গিয়ে আইভরির বাক্সের আঘাতে একজন জেলের আঙুলের কিছু জায়গা কেটে গেল। লোকটি এই সামান্য আঘাতকে তেমন আমলই দিলো না। কিন্তু তিন মাস পর লোকটি হঠাৎ মারা গেল। নাবিকের মৃত্যু আর উদ্ধারকৃত চৈনিক নারী-পুরুষের লাশ নিয়ে আর কেউ তেমন মাথা ঘামাল না। কিন্তু মৃত লোকদের প্রতি ভেতরে ভেতরে এক ধরনের মায়া পিটারের মধ্যে ঠিকই কাজ করছিল। সে প্রতি সপ্তাহে মৃতদের সমাধিস্থানে কিছু ফুল রেখে আসত। কিন্তু একদিন পিটারও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। মৃগী রোগীর মতো সে প্রায়ই মূর্ছা যেত। এভাবে কষ্ট পেতে পেতে পিটারও একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো। এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। সমুদ্রতটে কত অজস্র ঢেউয়ের মাথা আছড়ে পড়েছে। এভাবে প্রায় তিনশো বছর কেটে গেল। ইংল্যান্ড তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন। তবে চীনা রাজকুমারীসহ অন্যান্যদের মৃত্যুর খবর তখনও স্থানীয় মানুষের মুখে রূপকথার মতো ফিরত।

BanglaBook.org

১৮৫০ সালের আগস্ট মাসের মতো সুন্দর সকালে মিস্টার কারমাইকেল সপরিবারে বনভোজন করতে এলেন ল্যান্ডমএন্ডের সমুদ্র উপকূলে। খুব আনন্দে কাটল তাদের পুরো দিন। খেলাধুলা, সমুদ্রের উষ্ণ জলে সাতরানো, প্যাডল বোট চালানো আর দুপুরের ভুরিভোজন করে বড়দের শরীরে নেমে এলো অবসন্নতা। সবাই নাক ডেকে ঘুমাতে লাগল। কিন্তু ছোটরা বসে না থেকে ঝিনুক কুড়াতে বেরিয়ে পড়ল।

ছোট্ট বাচ্চাগুলো যখন ফিরে এলো তখন বড়দের ঘুম সবে ভেঙেছে। ছোট্ট পিটার বাবার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা ধারালো সুন্দর প্রবালের টুকুরো বাবার দিকে বাড়িয়ে দিলো। এই ছোট্ট প্রবালের আঁচড়ে ওর পা কেটে গেছে। মিস্টার কারমাইকেল তৎক্ষণাৎ আদরের সন্তানের পায়ে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিলেন। প্রবাল টুকরোটা হাতে পেয়ে পিটারের দাদু শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করলেন– 'অদ্ভুত! কুকুরের দাঁত যেন।' ব্যাস ঘটনা ওখানেই শেষ।

কিন্তু তিন মাস পর পিটার মারা গেল। এবার যেন কারমাইকেল পরিবারের টনক নড়লো। মার পিড়াপিড়িতে অবশেষে কারমাইকেল সেই ছোট্ট ধারালো প্রবাল খণ্ডটি নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন।

চিকিৎসক কারমাইকেলের কাছ থেকে সবকিছু শুনলেন। এরপর প্রবাল খণ্ডটি হাতে নিয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন ওটার দিকে। ব্যাপক অনুসন্ধান আর বই ঘেটে-ঘুটে অবশেষে চিকিৎসক তার সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পিটারের জলাতঙ্ক রোগই হয়েছিল। অথচ ঐ প্রবাল খণ্ডটি হিংস্র পশু ছাড়া কিভাবে রোগটি ছড়াল এটাই চিকিৎসকের কাছে আশ্চর্য প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো।

দ্য প্রিন্সেস অ্যান্ড দ্য পিকিনিজ **অনুবাদ : আবদুল্লাহ শাহরিয়ার টুটুল**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উইলিয়াম এবং মেরি

রোলড ডাল

মৃত্যুর সময় উইলিয়াম পার্লস খুব সামান্য অংশ রেখে গেল তার স্ত্রী মেরির জন্য। উইলিয়ামের মৃত্যুর সপ্তাহ খানেক পর তার আইনজীবী মেরিকে একটি খাম দিয়ে বলল, আমাকে বলা হয়েছে এটা আপনাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য। জিনিসটা সম্ভবত ব্যক্তিগত। কাজেই বাসায় নিয়ে খাম খুললেই বোধহয় ভালো হবে।

মিসেস পার্ল খামটা নিয়ে কোনো কথা না বলে চলে এলো বাড়িতে। খামটা খোলার আগে এক মুহূর্ত চিন্তা করল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে ফর্মাল কোনো চিঠি আছে। উইলিয়ামের ব্যবহারে কখনো ইনফরমাল কিছু দেখেনি মেরি। লোকটা অভিনয় করতে জানতো না। কোনো দিন অভিনয়ও করেনি। মেরির ধারণাটা ঠিক। খাম খুলে একটা ফর্মাল চিঠিই পেল সে। তাতে লেখা : 'আমার প্রিয় মেরি, আমার বিশ্বাস আমার চির বিদায়ে তুমি খুব বেশি ভেঙে পড়বে না। বরং নিজের কাজগুলো ঠিকঠাক মতো চালিয়ে যাবে। আর টাকা-পয়সা খরচ করার ব্যাপারে সতর্ক থেকো...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

খামের ভেতর চিঠি ছাড়াও একগুচ্ছ কাগজ চোখে পড়ল তার। বেশ মোটা কাগজের তাড়াটা। কাগজের তাড়াটা কৌতূহলী করে তুলল মিসেস পার্ল ওরফে মেরিকে। সে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর মন দিলো পড়ায়। ছোট স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা ভাষা সাবলিল। উইলিয়ামের আত্মজীবনী বলা চলে। কিন্তু এ কেমন আত্মজীবনী? একটানা লেখাটা পড়েছিল মেরি। তারপর স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তারপর আবার পড়া শুরু করল। এবার ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ আর বাক্য যেন মগজে ঢুকিয়ে দিলো সে।

প্রিয় মেরি, এই লেখাটি একান্ত তোমারই জন্য। আমি চলে যাবার কয়েক দিন পর তোমার কাছে লেখাটি হস্তান্তর করা হবে। তবে লেখাটি পড়ে ভয় পেয়ো না। এটা আর কিছু নয়। ল্যান্ড আমাকে নিয়ে কী করতে চলেছে তারই একটি ব্যাখ্যা মাত্র। আর তার কাজে আমি কেন সম্মতি জানিয়েছি, তার থিওরি এবং প্রত্যাশা সবকিছুর ব্যাখ্যাই তুমি এর মধ্যে পাবে। গোটা ব্যাপারটা তোমার জানার অধিকার আছে। কারণ তুমি আমার স্ত্রী। অবশ্য এর আগে বহুবার ব্যাপারটা তোমার কাছে বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুমি শুনতেই চাওনি। পুরো ব্যাপারটা জানার পর তোমার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে হয়তো। হয়তো আমাকে নিয়ে গর্বও হবে তোমার। আমি জানি আমার সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। তাই এ কাজটা করতে আমি মোটেই দ্বিধাবোধ করিনি।

সতের বছর আমি কাটিয়েছি অক্সফোর্ডে। এখানে পড়াশোনা শেষ করে অধ্যাপনা শুরু

BanglaBook.org

করেছি। কাজেই যখন জানতে পারলাম প্রিয় এ জায়গা থেকে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে, কারণ ক্যান্সার হয়েছে আমার, স্বভাবতই মুষড়ে পড়লাম। আর ক্যান্সারটা ধরা পড়েছে এমন এক সময়ে যে, বেঁচে থাকার কোনো আশাই নেই। ধীরে ধীরে নিঃশব্দ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। তারপর সপ্তাহ ছয়েক আগে, মঙ্গলবারের এক সকালে, ল্যান্ডি এলো আমার সাথে দেখা করতে। তারপর সবকিছু কেমন যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

হাসপাতালের বেডে শুয়েছিলাম আমি। ল্যান্ডি এলো খুব সকালে তখনও তোমার আসতে অনেক দেরি। ওকে তো তুমি চেনো। যেখানে যায়, মনে হয় যেন ঝড় এসেছে। হাসি আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের তাজা বোমা যেন। হাসতে হাসতে ঢুকল ও আমার কেবিনে, দাঁড়াল বিছানার পাশে। ঝকঝকে চোখ মেলে কিছুক্ষণ দেখল আমাকে। তারপর বলল, উইলিয়াম, দোস্তো। এতদিনে যা চেয়েছি পেয়ে গেছি আমি। তোমার মতো একটি কেসই আমি চেয়েছি এতদিন।

জন ল্যান্ডির সাথে তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই তোমার। ও তেমন একটা আমাদের বাড়িতে যায়ওনি। তবে ওর সাথে আমার বন্ধুত্বের বয়স নয় বছর হলো। দর্শনের শিক্ষা হলেও মনোবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আমার প্রচুর। ল্যান্ডিরও তাই। ফলে দু'জনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগেনি।

যাহোক, ল্যান্ডি আমার বিছানার পাশের একটা চেয়ারে বসে বলল, তুমি তো আর ক'দিনের মধ্যেই মারা যাচ্ছ তাই না?

এ ধরনের সরাসরি মন্তব্য ল্যান্ডির মতো মানুষকেই মানায়। তবে বলার ভঙ্গিটা এমন, মৃত্যু পথযাত্রী মানুষও কিছু মনে করে না ওর কথায়।

তুমি মারা যাবার পর ওরা তোমাকে কবর দেবে। বলে চলল ল্যান্ডি, তুমি কি মনে কর তারপর তুমি স্বর্গে চলে যাবে?

'এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে' বললাম আমি।

'নাকি নরকে?'

নরকে যাবার মতো অপরাধতো আমি করিনি। কিন্তু এসব কথা কেন ল্যান্ডি?

কারণ, আমাকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করল ও। আমি জানি মৃত্যুর পর তুমি জানতেও পারবে না তোমার কোথায় জায়গা হলো, তোমাকে কে কি বলল যদি না...। থামল সে, মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে, আরো কাছে এগিয়ে এলো...। যদি না তোমার সমস্ত ভার আমার হাতে তুলে দিয়ে না যাও। তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, গ্রহণ করবে?

আমার দিকে এমন ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল ও যেন আমি সরেস গরুর চর্বিদার একটা রান, ঝোলানো হয়েছে আমাকে দোকানে। ও মাংসের টুকরাটা কিনে নিয়েছে, র‍্যাপিং পেপারে মুড়িয়ে দেয়ার অপেক্ষায় আছে।

কথাটা খুব সিরিয়াস, উইলিয়াম। একটা প্রস্তাব দেব। গ্রহণ করবে কিনা?

তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

সমস্ত ব্যাপার আমি তোমাকে ব্যাখ্যা করব। শুনবে আমার কথা?

বলো শুনি। কারণ কথা শুনলে তো আমার কোনো ক্ষতি নেই।

বরং লাভ। বিশেষ করে মৃত্যুর পরে লাভবান হবে, যদি আমার প্রস্তাব মেনে নাও।

শুনে লাফিয়ে উঠলাম আমি। ল্যান্ডি বলতে শুরু করল একটা জিনিস নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে আমি গবেষণা করে চলেছি, উইলিয়াম। এখানকার দু'একটি হাসপাতাল আমাকে গবেষণার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করছে। ল্যাবরেটরির প্রাণীদের ওপর সফল এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছি

BanglaBook.org

আমরা। এখন শুধু মানুষের ওপর এক্সপেরিমেন্ট বাকি। আমার ধারণা, আমি সে এক্সপেরিমেন্টেও সফল হবো।

বিরতি দিলো ল্যান্ডি। ঝুঁকে এলো আমার দিকে। ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়, তীব্র আলো যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখের মণি থেকে। যেন আমাকে বলতে চাইছে, একমাত্র আমিই তোমাকে রক্ষা করতে পারি।

আবার শুরু করল ল্যান্ডি।

বেশ অনেক দিন আগে একটি রাশান শর্ট মেডিকেল ফিল্ম দেখেছিলাম। ছবিটি ভয়ংকর তবে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষকও। ছবিটিতে দেখিয়েছে– একটি কুকুরের ধড় থেকে মুণ্ডু সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে কিন্তু মাথার বা ব্রেনের ভেতর কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের আর্টারি এবং ভেইন থেকে স্বাভাবিক রক্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। অবাক ব্যাপার হলো, একটা ট্রের মধ্যে বসানো কুকুরটার মাথা ছিল জ্যান্ত। ওটার ব্রেন কাজ করছিল। নানা টেস্টের মাধ্যমে ওরা ব্যাপারটা প্রমাণ করেছে। যেমন যখন খাবার দেয়া হতো, খাবার কুকুরটার মুখের সামনে ধরলে ওটার জিভ বেরিয়ে আসতো থাবার চেটেতে। ঘরের ভেতর কেউ ঢুকলে তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করত কুকুরটা।

এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যায়– মাথা এবং মস্তিষ্ক দুটোর কোনোটারই জ্যান্ত থাকার জন্য শরীরের বাকি অংশের অবলম্বনের প্রয়োজন পড়েনি। শুধু অক্সিজেন মেশানো রক্তের সরবরাহই কাটা মুণ্ডুটাকে বাঁচিয়ে রাখছিল।

ওই ছবিটি দেখার পর আমার মাথায় একটি বৈপ্লবিক চিন্তা চলে আসে। আমি ভাবতে থাকি মৃত্যুর পর কোনো মানুষের খুলি থেকে ব্রেন খুলে নিয়ে তাকে যদি কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় কেমন হয়? এরপর আমি এ বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিই। আর মানুষ নিয়ে গবেষণার জন্য তোমাকে আমি বেছে নিয়েছি, বন্ধু। কারণ তুমি তো আর ক'টা দিন পর মরেই যাবে।

ঠাট্টাছলে আমি জানতে চাইলাম, কাজটা সে কিভাবে করবে। এর দীর্ঘ এবং জটিল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাকে দিয়েছে ল্যান্ডি। কিন্তু সে বর্ণনায় গিয়ে আমি তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না, মেরি। শুনো এটুকু বলি, ল্যান্ডি এমন একটি আজব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার মধ্যে রয়েছে একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড। এটি অক্সিজেন মেশানো রক্ত উৎপাদন করবে সঠিক তাপমাত্রাসহ, যে রক্ত পাম্প দিয়ে আমার ব্রেনে সরবরাহ করা হবে আমার মৃত্যুর পর। আর এই পদ্ধতিতে নাকি বছরের পর বছর আমার ব্রেন বেঁচে থাকবে, মানে আমি বেঁচে থাকব। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের কখনো ক্ষয় হবে না, রক্ত সরবরাহ থাকবে নিয়মিত, তাতে কোনো দিন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকা থাকবে না। এবং আমার ব্রেন নাকি দুই থেকে তিন শতাব্দী এভাবে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

পরিকল্পনাটা রোমাঞ্চকর এবং উত্তেজক তো বটেই। শুরুতে অবশ্য আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। রাজি হইনি। পরে ভাবলাম মরে তো যাচ্ছিই। তবু বিজ্ঞানের জন্য নিজকে উৎসর্গ করলে দোষ কি? তাছাড়া ল্যান্ডির উদ্ভট গবেষণা যদি সফল হয়, তাহলে আবার আমি বেঁচে উঠব। বেঁচে থাকতে পারব টানা তিনশ'টি বছর। ইতিহাস সৃষ্টি করব আমি। আবার বেঁচে ওঠার প্রবল উন্মাদনা পেয়ে বসল আমাকে। ল্যান্ডিকে বললাম, অপারেশনের জন্য আমি প্রস্তুত। অবশ্য অপারেশনটা হবে আমার মৃত্যুর সাথে সাথে কারণ হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার চার থেকে ছয় মিনিটের মধ্যে অক্সিজেন এবং তাজা রক্তের সরবরাহের অভাবে অকেজো হয়ে যায় মস্তিষ্ক

BanglaBook.org

বা ব্রেন। কাজেই এর আগেই অপারেশনটা করতে হবে। তবে ল্যান্ডি জানিয়েছে, তার আশ্চর্য মেশিনের কারণে আমার ব্রেন কোনোভাবেই ড্যামেজ হবে না। অপারেশনে আমার মাথাটা কেটে আলাদা করে রাখা হবে একটা বেসিনে। মূলত ওটাই হবে এরপর থেকে আমার ঘরবাড়ি।

ল্যান্ডি বলেছে, অপারেশনের পরে সবকিছুই আমি দেখতে পাব। এমনকি খবরের কাগজ বা বইও পড়তে পারব। তবে শুরুতে একটি নির্দিষ্ট সীমানায় এটির আওতা সীমাবদ্ধ থাকবে। পরে ধীরে ধীরে এর পরিধি বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য আমি মানুষের কথা শুনতে পাব না। শ্রবণ করার ক্ষমতা দাবি করেছিলাম ল্যান্ডির কাছে। কিন্তু ল্যান্ডি বলেছে, ওটার ব্যবহার করা এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর কথাও বলতে পারব না। কারণ আমার তো জ্ঞানই থাকবে না। শুধু চোখে দেখতে পাবার জন্য আমার ব্রেনের সাথে একটি কৃত্রিম মণি লাগিয়ে দেয়া হবে। আমি যে সচেতন অবস্থায় আছি, সবকিছু দেখতে পাচ্ছি, এটা জানা যাবে ইলেকট্রো এনসেউলগ্রাফের সাহায্যে। ইলেকট্রোডগুলো সরাসরি আমার মস্তিষ্কের সামনের অংশের সাথে জোড়া লাগানো থাকবে।

শেষে ল্যান্ডি বলল, তুমি অসাধারণ এক ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছ উইলিয়াম। তোমাকে কেউ বা কোনো কিছু ডিস্টার্ব করবে না। তুমি কোনো যন্ত্রণাও অনুভব করবে না। কারণ যন্ত্রণা অনুভব করার মতো কোনো নার্ভ তোমার থাকছে না। ভয়, দুঃখ, তৃষ্ণা, খিদে কোনো কিছুই তোমাকে স্পর্শ করবে না। এমনকি কোনো রকম জৈবিক কামনাও জাগ্রত হবে না। শুধু তোমার ব্রেনের মধ্যে থাকবে তোমার স্মৃতিশক্তি, তোমার চিন্তা-চেতনা-বুদ্ধি। কে জানে একসময় হয়তো সাধারণ কোনো সূত্র বা ব্যাপার তুমি আবিষ্কার করে বসবে।

আমি অসাধারণ কোনো কিছু আবিষ্কার করে ফেলব কিনা জানি না। তবে এটা যে অসাধারণ একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সাথে অনেকবার কথা বলতে চেয়েছি, মেরি। কিন্তু তুমি আমার কোনো কথাই শুনতে চাওনি। তারপর আমি ব্যাপারটি লিখে যাবার সিদ্ধান্ত নেই। অবশ্য দীর্ঘ সময় লেগেছে লিখতে। তবে তোমাকে 'বিদায়' জানাব না। কারণ ছোট্ট একটা চান্স আছে, ল্যান্ডি যদি তার কাজে সফল হয়, আবার হয়তো তোমার সাথে দেখা হয়ে যাবে আমার।

আমি আমার উকিলকে বলে যাব এ লেখাটি যেন আমার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর তোমার কাছে হস্তান্তর করা হয়। এখন, যখন তুমি লেখাটি পড়ছ, ল্যান্ডির অপারেশনের পর সাতদিন চলে গেছে। এখন গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তুমি অবহিত হলে। জানি না এখন কি করবে, তবে আমার অনুরোধ– ল্যান্ডির সাথে দেখা কর। আমি তাকে বলেছি তুমি সাত দিনের দিন তার সাথে দেখা করতে পার।

তোমার বিশ্বস্ত স্বামী
উইলিয়াম

বি. দ্র. আমি চলে যাবার পর থেকে সবসময় ভদ্রভাবে চলাফেরার চেষ্টা করবে, মনে রাখবে বৈধব্য খুব কঠিন জিনিস। মদ পান করবে না। অহেতুক টাকা ওড়াবে না। সিগারেট খাবে না। তুমি জানো আমি নিজে সিগারেট খাইনি কোনো দিন। পছন্দও করি না কেউ খেলে। দোকানের পেস্ট্রি খাবে না। লিপস্টিক দেবে না। টেলিভিশন অ্যাপারেটাস কিনবে না। গরমের সময় আমার ফুল গাছে নিয়মিত পানি দেবে। আর আমার ফোন ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই বলে আশা করছি। তুমি লাইন কেটে দেবে।

BanglaBook.org

মিসেস পার্ল পাণ্ডুলিপির শেষ পাতাটি আস্তে রেখে দিল সোফার ওপর। তার ছোট্ট মুখখানা কঠিন আকার ধারণ করেছে, ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে বীভৎস লাগছে। লেখাটার কথা মনে পড়তে শিউরে উঠল গা।

ব্যাগ খুলে আরেকটা সিগারেট বের করে সে ধরাল। ঘন ঘন টানে ধোঁয়ায় ভরে ফেলল ঘর। ধোঁয়ার মেঘের ভেতর থেকেও সে স্থির তাকিয়ে রইল নতুন কেনা নতুন মডেলের বিশাল আকারের টেলিভিশনের দিকে। টিভিটা ইউলিয়ামের টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছে সে। উইলিয়াম যদি দৃশ্যটা দেখত কী বলত, ভাবল মিসেস পার্ল।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল বারে খানিক আগের ঘটনা। রান্নাঘরের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সে মাত্র একটা সিগারেট ধরিয়েছে, উইলিয়াম তখনো ফেরেনি, রেডিওতে উচ্চস্বরে ডান্স মিউজিক বাজছিল। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ওখানে তার স্বামী এসে হাজির। মেরিকে সিগারেট খেতে আর গান শুনতে দেখে কি ভয়ানক রাগটাই না করেছিল উইলিয়াম। তারপর থেকে সে স্ত্রীকে হাত খরচা বন্ধ করে দেয়। মেরির সিগারেট খাওয়া দু'চোখে দেখতে পারত না উলিয়াম। তার এক কথা তার যে জিনিস অপছন্দ তার স্ত্রী তা খাবে কেনা?

অনেক কিছুই অপছন্দ ছিল উইলিয়ামের। এমনকি বাচ্চা কাচ্চাও পছন্দ করত না বলে মেরি মা হতে পারেনি।

এখন কোথায় গেল তোমার পছন্দ-অপছন্দ! মনে মনে হাসল মিসেস পার্ল।

সিগারেট শেষ করল সে। তারপর আরেকটা ধরিয়ে পা বাড়াল টেলিফোনের দিকে। টিভি সেটের পাশেই ওটা রাখা। উইলিয়ামের মৃত্যুর খবর শোনার পরও সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেনি। এদিকে উইলিয়াম বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেছে মেরি যেন অবশ্যই ল্যান্ডির সাথে যোগাযোগ করে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, তারপর ইনডেক্স খুঁজে ড. ল্যান্ডির নাম্বার বের করল।

আমি ড. ল্যান্ডির সাথে কথা বলতে চাই প্লিজ।

'কে বলছেন?'

'মিসেস পার্ল। মিসেস উইলিয়াম পার্ল।'

'এক মিনিট প্লিজ।'

'একটু পরেই ল্যান্ডির কণ্ঠ ভেসে এলো।'

'মিসেস পার্ল?'

'জি, বলছি।'

এক মুহূর্ত নীরব থাকল ওপাশ।

অবশেষে ফোনে কথা শুরু করলেন মিসেস পার্ল। আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছি। একবার আসবেন হাসপাতালে? তাহলে কথা বলা যেত। আপনি বোধহয় কী করে ঘটনাটা ঘটল জানার জন্য আগ্রহী হয়ে আছেন না?'

মিসেস পার্ল নিশ্চুপ রইল।

BanglaBook.org

সবকিছুই চমৎকারভাবে শেষ হয়েছে। ওটা শুধু জীবিত নয়, মিসেস পার্ল, ওটা সচেতন। দ্বিতীয় দিনেই ওটার জ্ঞান ফিরেছে। খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার নয় কি?

মিসেস পার্ল ল্যান্ডিকে বলে যাবার সুযোগ দিলো। আর ওটা দেখতে পাচ্ছে। প্রতিদিন ওটাকে খবরের কাগজও পড়তে দিচ্ছে।

কী কাগজ? তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল মিসেস পার্ল। ডেইলি মিরর। পত্রিকাটার হেডলাইনগুলো বড় বড়। পড়তে সুবিধা।

ও মিরর পত্রিকা পড়ে না। ওকে টাইমস দেবেন।

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর ডাক্তার বলল, 'ঠিক আছে, মিসেস পার্ল। আমরা ওটাকে সবই দেব। ওটাকে খুশি আর সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টাই করে যাচ্ছি।

ওটা ওটা করছেন কেন, ঝাঁঝিয়ে উঠল মিসেস পার্ল। বলুন ওকে।

জি, ওকে, বলল ডাক্তার। দুঃখিত মাফ করবেন। যা হোক, ওকে খুশি রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তাই আপনাকে আসতে বলছি। ও আপনাকে দেখলে খুশিই হবে। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইল মিসেস পার্ল। তারপর বলল, 'আচ্ছা। আসছি আমি।'

এলে বেশ হবে। জানতাম আপনি আসবেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করব আমি। সোজা দোতলায় চলে আসবেন।

আধঘণ্টা পর হাসপাতালে পৌঁছে গেল মিসেস পার্ল। 'ওকে দেখে আশা করি অবাক হবেন না।' ডক্টর ল্যান্ডি ওর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল।

হবো না।

'প্রথম দর্শনে শকড হতে পারেন। আসলে ওর বর্তমান চেহারাটা খুব একটা দর্শনযোগ্য নয়।

'আমি চেহারা দেখে ওকে বিয়ে করিনি, ডক্টর।'

ঘুরল ল্যান্ডি, সরাসরি তাকাল মিসেস পার্লের দিকে।

কী অদ্ভুত এক মহিলা, ভাবল সে। এক সময় দেখতে সুন্দরী ছিল। এখন ক্লান্ত, জীবন যুদ্ধে পরাজিত, বিপর্যস্ত লাগছে। খানিক চুপচাপ হাঁটল ওরা।

ভেতরে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠবেন না। বলল ল্যান্ডি। সরাসরি ওর মুখের দিকে না তাকানো পর্যন্ত ও বুঝতেই পারবে না যে আপনি এসেছেন। ওর চোখ সবসময় খোলা থাকে। তবে চোখ নড়ানোর ক্ষমতা নেই। কাজেই ওর দেখার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। বর্তমানে আমরা ওকে ছাদের দিকে তাকানো অবস্থায় রেখেছি। আর হ্যাঁ, ও কিছুই শুনতে পায় না। কাজেই যে কোনো কথা বলতে পারবেন মন খুলে। ওই যে এসে পড়েছে।

ল্যান্ডি একটা দরজা খুলল, মিসেস পার্লকে ছোট্ট চৌকোণা ঘরটাতে ঢুকতে ইঙ্গিত করল।

আমি ওর খুব বেশি কাছে যেতে চাই না। মিসেস পার্লের বাহুতে হাত রেখে বলল সে। এখানে একটু দাঁড়িয়ে ধাতস্থ হয়ে নিন।

BanglaBook.org

ঘরের মাঝখানে, উঁচু সাদা একটা টেবিলের ওপর বড় আকারের সাদা এনামেল কাঠির মতো একটা ওয়াশবেসিন দাঁড় করানো। বেসিন থেকে আধা ডজন প্লাস্টিক টিউব বেরিয়ে এসেছে। টিউবগুলো কতগুলো কাঁচের পাইপের সাথে সংযুক্ত, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটা মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত গড়িয়ে নামছে পাইপ থেকে। ল্যান্ডি জানাল ওটার নাম হার্টমেশিন। ওটাই রক্ত সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রেখেছে উইলিয়ামকে। হার্ট মেশিন থেকে মৃদু দণ্ডায়িত শব্দ আসছে। ও ওটার মধ্যে আছে, বেসিনের দিকে ইঙ্গিত করল ডাক্তার। এতদূর থেকে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। একটু কাছে যান। তবে খুব বেশি কাছে নয়।

ল্যান্ডি মিসেস পার্লকে নিয়ে দুই কদম সামনে বাড়ালো। ঘাড় লম্বা করে মিসেস পার্ল দেখল বেসিনের ভেতরটা তরল একটা পদার্থে বোঝাই। তরল জিনিস পরিষ্কার এবং স্থির, তার ওপর ভাসছে গোলাকার একটা ক্যাপসুল, আকারে কবুতরের ডিমের সমান।

ওটা ওর চোখ, বলল ল্যান্ডি। দেখতে পাচ্ছেন?

'হ্যাঁ।'

'চোখটা খুব ভালো অবস্থায় আছে। ওটা ওর ডান চোখ। ওই চোখে সে আগের মতোই দেখতে পায়।'

ছাদ দেখার মধ্যে মজার কিছু নেই, মন্তব্য করল মিসেস পার্ল।

'শুধু ছাদ দেখতে হবে না ওকে। সে ব্যবস্থাও আমরা করব। তবে এতো দ্রুত তা সম্ভব নয়।'

'ওকে ভালো কোনো বই পড়তে দিন।'

'অবশ্যই দেব। আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো, মিসেস পার্ল?'

'না।'

'তাহলে আরেকটু সামনে এগোই চলুন। তাহলে গোটা জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পাবেন।'

টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ল্যান্ডি মিসেস পার্লকে নিয়ে।

ওই দেখুন, বলল ল্যান্ডি। ওই যে আমাদের উইলিয়াম।

যা ভেবেছিল তার চেয়ে, প্রকাণ্ড লাগল উইলিয়ামকে, আর রংটাও অনেক বেশি গাঢ়। সারফেসের ওপর নানা ভাঁজ আর বলিরেখা নিয়ে উইলিয়াম বড় আকারের শুঁটকি করা একটা আখরোটের আকার পেয়েছে। চারটে বড় ধমনী আর দুটো শিরা বেরিয়ে আছে ওর ব্রেনের সম্মুখভাগ থেকে, ঢুকেছে প্লাস্টিক ডিউটের মধ্যে। হার্ট মেশিনের প্রতিটি স্পন্দনের সাথে, রক্ত যখন ঢুকছে, একসাথে সবগুলো টিউব মৃদু ঝাঁকি খাচ্ছে।

'ঝুঁকে সরাসরি চোখের দিকে তাকান। পরামর্শ দিলো ল্যান্ডি।'

'তাহলে ও আপনাকে দেখতে পাবে। আপনি ওর দিকে তাকিয়ে হাসুন, চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করুন। সম্ভব হলে ভালো ভালো কিছু কথা বলুন। শুনতে না পেলেও কী বলছেন বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই।'

BanglaBook.org

'চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করাটা পছন্দ না, বলল মিসেস পার্ল। আমি আমার পদ্ধতিতে কাজটা করছি। কিছু মনে করবেন না।' সে টেবিলের কোণায় গিয়ে দাঁড়ালো, শুঁকলো বেসিনের ওপর, সরাসরি তাকাল উইলিয়ামের চোখের দিকে।

হ্যালো ডিয়ার, ফিসফিস করল সে। এই যে আমি– মেরি।

উজ্জ্বল চোখটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে কটমট করে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

কেমন আছ, প্রিয়, জিজ্ঞেস করল সে। ঠিক আছ তো?

স্বচ্ছ প্লাস্টিক ক্যাপসুলের মধ্যে চোখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চোখের বরফ নীল মনির চার দিকের সাদা জমিনের ওপর লালছে শিরাগুলোও স্পষ্ট। মনে হলো মিসেস পার্লের কথা শুনে কেঁপে উঠল মনিটা।

তোমার চিঠি পেয়েছি ডিয়ার। সাথে সাথে ছুটে এসেছিল দেখতে। ও, ল্যান্ডি বললেন তুমি নাকি ভালোই আছে।

আস্তে আস্তে বললে তুমি হয়তো আমার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারবে কি বলছি।

সন্দেহ নেই চোখটা দেখছে ওকে।

ওরা তোমার যত্নআত্তির কোনো ত্রুটি করছে না ডিয়ার। চমৎকার হার্ট মেশিনটা নিয়মিত পাম্প করে চলছে। আমাদের দুর্বল হার্টের চেয়ে ওটা অনেক বেশি শক্তিশালী। আমাদের হার্ট যে কোনো সময় অকেজো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তোমারটার সে সম্ভাবনা নেই।

কাছ থেকে চোখটাকে দেখছে মিসেস পার্ল, বোঝার চেষ্টা করছে ওটার ভাষা।

তুমি বেশ আছো, ডিয়ার। সত্যি ভালো করছ।

চোখটার মধ্যে কোথায় যেন কোমলতা আর দয়ার ছায়া লক্ষ্য করল মিসেস পার্ল, যা আগে কখনো দেখেনি।

আপনি কি নিশ্চিত ও সচেতন, ডাক্তারের দিকে তাকাল সে।

অবশ্যই জবাব দিলো ডাক্তার।

আমাকে দেখতে পাচ্ছেন?

একশোবার।

তারপরটা দারুণ না? ও নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছে সবকিছু দেখে।

ওর অবাক হবার কিছু নেই। সে খুব ভালোভাবেই জানে সে কোথায় এবং কেন। যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকতো তাহলে আপনার সাথে আলাপও চালিয়ে যেত।

কথা বলতে পারে না বলেই আমার ওপর আর বিধি নিষেধের বেড়াজাল আরোপ করতে পারবে না। ভাবল মিসেস পার্ল। তুমি অনেক ভুগিয়েছ আমাকে। এবার আমার পালা। 'ভালো কথা, ডক্টর' বলল সে। ওকে আমি কখন বাড়ি নিয়ে যেতে পারব?

মানে?

বললাম কখন ওকে বাড়ি নিয়ে যাবার অনুমতি পাব।

আপনি ঠাট্টা করেছেন, বলল ল্যান্ডি।

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল মেরি, ঠাণ্ডা চোখে তাকাল ল্যান্ডির দিকে।

আমি কেন আপনার সাথে ঠাট্টা করতে যাবো।

ওকে নড়ানো সম্ভব না।

কেন সম্ভব না বুঝতে পারছি না।

এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট মিসেস পার্ল।

ও আমার স্বামী ড. ল্যান্ডি।

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল ল্যান্ডি। ইয়ে মানে...

ও আমার স্বামী, কণ্ঠে রাগ নেই, খুব শান্ত গলায় কথাটা পুনরাবৃত্তি করল মেরি। যেন ডাক্তারকে মনে করিয়ে দিলো সাধারণ ব্যাপারটা।

সবাই জানে আপনি এখন বিধবা মিসেস পার্ল। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ল্যান্ডি। কাজেই আপনার দাবি ত্যাগ করা উচিত।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো মিসেস পার্ল, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। যা বলার বলে দিয়েছি, ব্যাগ খুলে সিগারেট বের করল। আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাব।

দুই ঠোঁটের ফাঁকে ওকে সিগারেট গুঁজতে দেখল ল্যান্ডি, জ্বালিয়েছে। ও মহিলা সত্যি অদ্ভুত, আবার ভাবল সে। বেসিনে স্বামীকে অমন অবস্থায় দেখে মনে হয় মজাই পেয়েছে।

এখানে তার স্ত্রীর ব্রেন যদি ওভাবে পড়ে থাকত আর তার স্ত্রী ক্যাপসুলের মাঝ থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকত, তাহলে কেমন হতো?

মোটেই ভালো লাগত না ল্যান্ডির।

আমার রুমে যাবেন এখন? জিজ্ঞেস করল সে।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস পার্ল, শান্ত, আবেগহীন চেহারা নিয়ে সিগারেট ফুঁকে চলেছে।

জি, জবাব দিলো সে।

টেবিলের ধার দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে পড়ল মিসেস পার্ল, আবার ঝুঁকল বেসিনের ওপর। মেরি চলে যাচ্ছে, সুইটহার্ট, বলল সে। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। ওখানে ঠিকমতো যত্ন-আত্তি করতে পারব তোমার। আর কোনো ডিয়ার...। থামল সে, ঠোঁটে আবার সিগারেট গুঁজল, ভঙ্গি করল টান দেয়ার। চোখটা জ্বলে উঠল ভীষণভাবে।

চোখের দিকে সরাসরি তাকাল মিসেস পার্ল, মনির ঠিক মাঝখানে আলো দেখতে পেল। যেন আগুন জ্বলছে। প্রচণ্ড রাগ নিয়ে তাকিয়ে আছে চোখটা তার দিকে।

নড়ল না মিসেস পার্ল। বেসিনের ওপর ধোঁয়াটা ধরে রাখল তিন/চার সেকেন্ড; তারপর হুশ শব্দে নাকের দুই ফুটো দিয়ে ধোঁয়ার পাতলা দুটো স্রোত বেরিয়ে এলো, সরাসরি আঘাত করল বেসিনের পানিতে, সারফেসে ঘন নীল মেঘের ঢেউ সৃষ্টি করল, বুজিয়ে দিলো চোখটা।

ল্যান্ডি দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, ডাক দিলো, আসুন মিসেস পার্ল।

BanglaBook.org

ওভাবে কটমট করে তাকাবে না উইলিয়াম, নরম গলায় বললো মিসেস পার্ল। কটমট করে তাকালে দেখতে ভালো লাগে না।

ল্যান্ডি ঘুরল, ঘাড় লম্বা করল, মহিলা কী করছে দেখতে চায়।

অনেক হয়েছে, ফিসফিস করল মিসেস পার্ল। এখন থেকে মেরির আদেশেই তোমাকে চলতে হবে। বোঝা গেছে?

মিসেস পার্ল, বলল ল্যান্ডি, এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

কাজেই আর দুষ্টুমি করা চলবে না, আবার সিগারেটে টান দিল সে। দুষ্টুমি করলে অনেক শাস্তি আছে তোমার কপালে।

ল্যান্ডি চলে এসেছে ওর পাশে, হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

বিদায় প্রিয়, গলা ছেড়ে বলল মিসেস পার্ল। আমি শীঘ্র আসছি।

অনেক হয়েছে মিসেস পার্ল।

ও খুব সুইট না? ল্যান্ডির দিকে বড় বড় চোখ রেখে বলল সে। তাই না ডার্লিং? ওকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য আর তর সইছে না আমার।

উইলিয়াম অ্যান্ড মেরি **অনুবাদ : অনীশ দাস অপু**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাপ

ক্রিস্টিনা ব্রান্ড

অন্ধকার রাত। এক বনের মধ্যদিয়ে জোরে বাতাস বইছে। বাতাসের ঝাপটায় দুলে উঠছে ডালপালা। ঘোড়ার উপর বসে থাকা লোকটার যে শীত লাগছিল তা নয়, তবু কেমন যেন এক অস্বস্তিতে আলখেল্লাটা শরীরের সঙ্গে ভালো করে জড়িয়ে নিলো সে। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে এগোতে লাগল সামনের ছোট কুটিরের দিকে। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে ক্ষীণ আলোর রেখা। আগন্তুকের দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সম্ভবত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে ভেতর থেকে কেউ একজন দরজায় এসে দাঁড়াল। 'কে ওখানে?' অস্পষ্ট মহিলা কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আগন্তুক। কাঁপতে লাগল। আলখেল্লাটা বুকের সঙ্গে আরো ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়ে বিনা ভূমীকায় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আমি পাপখাদককে নিতে এসেছি।

'তাহলে আপনি ফিরে যান', মহিলা জবাব দিল। 'ও যেতে পারবে না।'

পারবে না? লোকটা ঘোড়ার লাগাম কাঁধের উপর দিয়ে হাতে ধরে খানিকটা এগিয়ে গেল। ওকে যেতেই হবে। তিনি দিন ধরে খুঁজছি। আর কাউকে পেলাম না। ট্রেগারনের পাপখাদক নিজেই অসুস্থ। সিলিসুমের পাপখাদক মারা গেছে গতকাল...'

'তা জানি না', হতাশার সুরে বলল মহিলা।

'বসবাসের জন্য জায়গাটা খুব নির্জন।' আগন্তুক বলল।

'সব পাপ খাদকই নির্জনে বাস করে,' মহিলা তিক্ত কণ্ঠে বাধা দিল তাকে। 'আমাদের স্বামী ও পুত্ররা আপনাদের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেয়, আর বিনিময়ে আপনারা তাদেরকে দূর করে দেন সমাজ থেকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'এসব হতভাগার সঙ্গে কে থাকতে চায়? আমরা তো এদেরকে ভালো টাকা দিই এ কাজে, আর সেই সঙ্গে ভালো খাওয়া-দাওয়া।'

তা অবশ্য ঠিক। ভালো খাওয়া-দাওয়া। যত বড় পাপী তত ভালো খাওয়া। ওরা মৃত মানুষটার শরীরের ওপর খাবারগুলো ছড়িয়ে দেয়। আর পাপখাদকদের সেখান থেকে তুলে তুলে খেতে হয়। মনে করা হয় এই খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত মানুষটার

BanglaBook.org

পাপগুলোকেও খেয়ে নিচ্ছে পাপখাদক। এর ফলে পাপমুক্ত হয়ে মৃত মানুষটা যেতে পারছে স্বর্গে। পাপখাদকের হাতে কিছু টাকা দিয়ে তাকে সমাজ থেকে বাইরে রাখা হয়। আবার ডাকা হয় যখন প্রয়োজন পড়ে। সে যাই হোক, মহিলা বলল। আমার স্বামী অসুস্থ। সে যেতে পারবে না।

কিন্তু একজন পাপখাদককে না নিয়ে ফিরে যেতে সাহস করলো না লোকটা। আর কাউকে পাচ্ছি না।' সে বলল। সকালেই আমার প্রভুর অন্ত্যোষ্টির কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তাঁর স্ত্রী খুব চিন্তায় আছেন পাছে স্বামীকে পাপের বোঝা নিয়ে কবরে যেতে হয়। আপনার স্বামী কী খুবই অসুস্থ? আর কেউ নেই?

জমাট অন্ধকারে কোথা থেকে একটা প্যাঁচার ডাক ভেসে এলো। কেঁপে উঠল লোকটা। 'কেউ নেই' মুখ ফিরিয়ে বলল মহিলা।

এখন আমি কাকে খুঁজব? কালকেই তো কবর দিতে হবে, আপন মনে লোকটা বলল।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল মহিলা। শেষে বলল, 'কোত্থেকে আসছেন?'

'কির্টক্যান্ডা থেকে। বেশি দূরে নয়।'

'কোনটা কত দূর আপনি কি করে জানলেন?' ঘোড়াটার দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখল মহিলা।' ও যদি যায় তো ঘোড়ায় চড়ে যাবে।'

হেসে উঠল লোকটা। কি বলছেন আপনি? আমি হেঁটে যাব, আর আমার ঘোড়ায় চড়ে যাবে পাপখাদক?' কি যেন ভাবল সে। মনে হয় পাপখাদক সত্যিই অসুস্থ। ঠিক আছে তাই হবে। ও ঘেড়ায় চড়েই যাবে।'

'শুধু যাওয়া নয়, আসাও। আপনি ওকে পৌঁছে দিয়ে যাবেন।'

'ঠিক আছে তাই হবে। তাড়াতাড়ি আসতে বলুন ওকে। সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

'আমি ওকে বলছি। কিন্তু মনে রাখবেন, যাওয়া-আসা দুটোই।'

বলছি তো, যাওয়া-আসা- অধৈর্য স্বরে বলে উঠল আগন্তুক। তারপর ভাবল লোকটা রাস্তাতেই মরে যাবে না তো? তাই প্রশ্ন করল, ওর কি অসুখ হয়েছে?'

ও ক্ষুধার্ত, মহিলা জবাব দিয়ে ভোরে চলে গেল।

মহিলা ভেতরে যেতেই সতের আঠার বছরের এক ছেলে মহিলার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘাড় পর্যন্ত ঢেউ খেলানো চুল মাথায় কিন্তু মুখটা ফ্যাকাসে। বলল, 'এক টুকরো খাবারও ঘরে নেই মা। বাবা অসুখে গোঙাচ্ছে, আর আমি মরে যাচ্ছি খিদেতে।'

মহিলা তার ছেলের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো। বললো, 'তুমি খাবার পাবে।'

কোত্থেকে? এ বাড়িতে কত দিন ধরে খাবার নেই।

মা বাইরের দিকে ইশারা করে বলল, 'ঐ লোকটা একজন পাপখাদককে নিতে এসেছে।'

'কিন্তু বাবা তো...'

BanglaBook.org

তার কথা শেষ হলো না। মহিলা কঠোর মুখে তাকালেন ছেলের দিকে। আয়ানটো, তোমাকে ঐ লোকটার সঙ্গে যেতে হবে।'

'আমাকে?' ভয়ে কুঁকড়ে গেল ছেলেটা। মার হাত থেকে নিজের হাতটা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'পারব না। আমি পারব না। মরা মানুষের পাপ খেতে আমি কিছুতেই পারব না। কিছুতেই না।'

'চুপ কর', হাল ছাড়ল না মহিলা। 'তুমি ক্ষুধার্ত।'

'মরা মানুষের গা থেকে খাবার তুলে তুলে খাওয়া– সে খাওয়া আমার গলায় আটকে যাবে...'

'আয়ানটো, ওরা তোমাকে টাকাও দেবে। অনেক টাকা...' মাথা নাড়ল আয়ানটো। 'না খেয়ে থাকবো তবু...'

এমন বলো না আয়ানটো। তোমার নিজের জন্যে না হলেও আমাদের সবার জন্য, অন্তত তোমার বাবার জন্য।'

সরল চোখে মায়ের দিকে তাকালো আয়ানটো। 'খাবার না পেলে বাবা মরে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা আমাকে টাকাও দেবে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এই একবারের জন্য' বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল আয়ানটো। দেহটা কাঁপতে লাগল তার। একটা মরা মানুষের দেহের ওপর থেকে খাবার তুলে তুলে খেয়ে তার পাপগুলো নিজের কাঁধে নিতে হবে। ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

ছেলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল মহিলা। 'শোনো আয়ানটো', ছেলের হাতটা ধরলো সে। তারপর চাপা স্বরে বলল, 'মরা মানুষের পাপগুলো তখনই তোমার কাঁধে আসবে যখন তার বুকের ওপর থেকে তুমি খাবারগুলো তুলে তুলে খাবে। কিন্তু তুমি যদি সেখানে না খাও, যদি খাবারগুলো নিয়ে আসতে পারো।'

'খাব না?'

'ওখানে কিছুই খাবে না আয়ানটো। খাবারের একটা কণাও না। শুধু মন্ত্রগুলো জোরে উচ্চারণ করবে। তার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করবে। তারপর যখন তোমাকে খাবারগুলো খেতে হবে– তার আগে ওখানের সবাইকে তোমার সামনে থেকে সরে যেতে বলবে। লোকজন সরে গেলে তোমার কাপড়ের মধ্যে খাবারগুলো লুকিয়ে ফেল।'

'তাহলে তো আমাকে মরা মানুষের পাপগুলো খেতে হবে না।'

তবু মনের মধ্যে একটা ভয় বিঁধে রইল আয়ানটোর। ভিতরে যেতে পারবে তো সে? একটা মরা মানুষের পাশে বসে তাকে দেখা, জোরে জোরে মন্ত্রপড়া, লোকজনের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে খাবারগুলো লুকিয়ে নিয়ে আসা...। সে মিনতির সুরে বলল, মা, আমাকে কি যেতেই হবে? প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করল মহিলা। হ্যাঁ, তোমাকে যেতেই হবে। আর খাবারগুলোও নিয়ে আসতে হবে? বাড়িতেই নিয়ে আসতে হবে? এবং টাকাগুলোও...'

BanglaBook.org

আমি টাকা চাই না, আয়ানটো বলল। কিন্তু খাবারগুলো– নিজের সরু পেটটা খামচে ধরল সে।

'আমার জন্য আনতে বলছি না।' মা বলে উঠল। 'ঐ খাবারের এক কণাও আমি ছুঁয়ে দেখব না। করুণ দৃষ্টিতে তাকালো সে পাশের ঘরটার দিকে। স্বামীর গোঙানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। মায়ের মনের কথা বুঝতে পারল আয়ানটো। বলল, 'বাবার জন্য আনতে বলছ তাই না?'

'তোমরা দুজনেই সবটুকু খাবে।' মা জবাব দিলো। একটা অপরাধবোধ আচ্ছন্ন করল তাকে। ছেলের সরলতা আর আনন্দটাকে ভেঙে দিতে চাইল না সে।

লোকটার সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল আয়ানটো। মা তার গায়ে ও মাথায় জড়িয়ে দিলো একটা পশমের চাদর। লোকটা খেয়াল করল না তাকে। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছানোর পর বিধবা মনিবপত্নী পাপখাদকের চেহারা দেখার জন্য লুণ্ঠনটা মুখের কাছে তুলে ধরেই চেঁচিয়ে উঠল। এ কাকে নিয়ে এসেছ? এতো পাপখাদক নয়। এ যে একটা বাচ্চা ছেলে।'

'তাতে কি হয়েছে?' মুখে বললেও মনে মনে রেগে গেল লোকটা। মহিলা তো দারুন ঠকানো ঠকিয়েছে। স্বামীর বদলে ছেলেকে গছিয়ে দিয়েছে। আসবার সময় ভালো করে দেখে নিলে এমনটি হতো না। খাওয়ার কাজ এ ভালোই পারবে'– উপায় না দেখে তাই বলল সে। ছেলেটা যুবক, শক্তিশালী। বুড়োদের পাপের বোঝা সহজেই কাঁধে নিতে পারবে।'

'শক্তিশালী বলছ কাকে? বিধবা বলে উঠল। এই রোগা, খেতে না পাওয়া বাচ্চা ছেলেটা একজন বয়স্ক মানুষের সারা জীবনের সমস্ত পাপের বোঝা বইতে পারবে?

এই ছেলেটা খুবই দুর্বল, বিধবা মহিলা করুণার চোখে তাকাল আয়ানটোর দিকে।

'আমি ক্ষুধার্ত।' আয়ানটো বলে উঠল।

মৃত দেহটা শোয়ানো রয়েছে ছোট বৈঠকখানায়। একপাশে টেবিলের ওপর অনেকগুলো মোমবাতি জ্বলছে। মৃতদেহটার বুকের ওপর চিনে মাটির বিরাট একটা গামলা রাখা। গামলার মধ্যে বিচ্ছিন্ন ধরনের খাবার। চাক চাক করে কাটা শুয়োরের মাংস, সেদ্ধ ডিম, রুটির স্তূপ, ঘরে তৈরি বিশাল কেক, অনেকগুলো পনির। দেখত দেখতে ছেলেটার জিভে পানি চলে এলো। ঢোঁক গিলল সে। চোয়াল দুটো ব্যথা করে উঠল।

মৃতদেহকে ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আত্মীয়-স্বজনরা। আয়ানটোর বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। সবাই অপেক্ষা করছে তার কথা শোনার জন্য। কিন্তু কথা বলতে পারছিল না সে। খাবারগুলো দেখেই তার মুখটা বারবার ভরে উঠছিল পানিতে। একজন বৃদ্ধ অবশেষে বলে উঠল, এবার শুরু করা যাক।

আত্মীয়-স্বজন যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য আয়ানটোর মুখ ও শরীর পশমের চাদরটা দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিয়েছে মৃতের স্ত্রী। আয়ানটোকে একটু অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে পাপখাদকদের মন্ত্রটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব নিচু স্বরে বলে দিতে

BanglaBook.org

লাগল। তার ভয় হচ্ছিল ছেলেটা যদি মন্ত্র ঠিকমতো বলতে না পারে তাহলে আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না মহিলা।

আয়ানটো বহুবার তার বাবাকে এই ভয়ঙ্কর মন্ত্রের মহড়া দিতে শুনেছে। সাপের ফোঁস-ফোঁসানির মতো স্বরে উচ্চারণ করা, তারপর একটু থেমে এক খাবলা খাবার মুখে পুরে খাওয়া, তারপর আবার মন্ত্র পড়া, আবার খাবার মুখে পুরে খাওয়া, আবার চিৎকার করা, উপস্থিত সবার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। এইভাবে মৃত মানুষের পাপ নিজের কাঁধে নেয়া। অদ্ভুত সব চিৎকার দিতে হয় এ সময়। উপস্থিত সবার রক্ত হিম হয়ে যায় এ চিৎকার শুনে। চিৎকারের ভেতর টাকাগুলো তুলে নিতে হয়। শেয়ালের ডাক দিতে হয়। দিতে হয় প্যাঁচার ডাক। শুরু করল আয়ানটো। এতোগুলো লোকের সামনে কেমন যেন তার একটু অস্বস্তি লাগে। বিধবাটা আড়াল থেকে সাহায্য করতে থাকে তাকে। তারপর সেই খাবারের সময়। এখন তাকে খাবার খেতে হবে।

মোমবাতির আলোয় মাখনটা যেন কাঁচা সোনার মতো লাগছে। লোভনীয় রুটিগুলো থেকে ভেসে আসছে সুঘ্রাণ। পেটের ভেতরটা ক্ষুধায় মুচড়ে ওঠে আয়ানটোর। মুখের ভেতরে আবার পানি জমতে থাকে। কাঁপা কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে খাবার তুলতে যায় সে। ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের চাপা গলার স্বর তার কানে এসে ধাক্কা মারে, একটুও না। এক কণাও না। সঙ্গে সঙ্গে হাত গুটিয়ে নেয় আয়ানটো।

মা তাকে সবকিছু ভালো মতো শিখিয়ে দিয়েছিল। তারপর বলে দিয়েছিল কখন কিভাবে কোন কাজটা করতে হবে। বাধ্য ছেলের মতো সে তাই করল। উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে সহজভাবে বলল, আপনারা সবাই এখান থেকে যান। অপেক্ষা করুন অন্য ঘরে। এখন আমি একা একা বসে খাবারগুলো খাবো।

বয়স্করা অবাক হলো খুব আয়ানটোর কথা শুনে। প্রতিবাদ করে বলল, পাপখাদকরা সবাইকে সাক্ষী রেখে তাদের সামনেই খায়। কিন্তু আয়ানটো একই কথা সহজভাবে বারবার বলে গেল। আমি একা বসে খাবারগুলো খাবো।

ইতস্তত করতে লাগল বয়স্করা। তারা দেখতে চায়, কিভাবে পাপগুলো এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করে।

আপনারা সেসব শুনতে পাবেন, শপথ করে বলল আয়ানটো। 'যখন পাপগুলো আমার কাঁধে আসবে।'

'আমরা যদি পাশের ঘরে অপেক্ষা করি তাহলে তা শুনতে পাবো।' ছেলেটার কথা মেনে নিয়ে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বিধবা বলল। আমরা শুনতে পাব যখন পাপ স্থানান্তরিত হতে থাকবে।

আসলে মহিলা বুঝতে পেরেছে এই পাপখাদক ছেলেটা অন্য পাপখাদকদের মতো নয়। তার যোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ হচ্ছিল প্রথম থেকে। কিন্তু অবস্থার কথা বিবেচনা করে কোনো তর্ক করতে চাইল না সে। সবাইকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। কান পেতে থাকল দরজার গায়ে।

BanglaBook.org

সবাই চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক খাবার তুলে নিয়ে ভেতরের পকেটগুলো ভরতে লাগল আয়ানটো। তার রোগা শরীরের গায়ে খাবারগুলো লেপ্টে যেতে থাকল। রুটিতে মাখন শরীরের তাপে গলে গিয়ে মাখামাখি হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর কর্কশ স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে যেতে লাগল সে। জোরে জোরে প্রার্থনা করতে লাগল যেন এখনই এই মৃত লোকটার পাপ তার দেহে স্থানান্তরিত হয়।

মন্ত্র পড়া থামল। মৃতদেহটার পাশে শেষ একটা চিৎকারের জন্য তৈরি হচ্ছিল আয়ানটো। কিন্তু ক্ষুধার্ত শরীরে শক্তি পাচ্ছিল না কোনো। খাবারগুলো সে খায়নি, সুতরাং পাপগুলো তার দেহে ঢুকবে না। এই ভেবে দুর্বল শরীরটাকে একটা চাঙ্গা হবার অবকাশ দিলো। মুখ হাঁ করে বড় করে শ্বাস টানল আয়ানটো। দেহটা কাঁপছে তার। বুঝতে পারছে না চিৎকারটা কত জোরে দেবে। হঠাৎ লক্ষ্য করল চিনে মাটির গামলাটা কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে মৃতের বুকের ওপর থেকে। তাড়াতাড়ি গামলাটা ধরে ফেলল ও। কিন্তু পারল না ধরে রাখতে। শূয়োরের মাংসের চর্বি ও মাখনে মাখামাখি হয়ে পিচ্ছিল হয়েছিল ওটা। মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে ঠাস ঠাস শব্দে ভেঙ্গে গেল। আয়ানটো ভয় পেয়ে প্রাণপণে জোরে চিৎকার করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। লোকজন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আর হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো আয়ানটো চিৎকার করতে করতে সবাইকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ঘরের বাইরে গেল, অন্ধকারের মধ্যদিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে চলল অনেক দূরে তাদের ভাঙা বাড়িটার দিকে।

ক্ষুধার্ত দুর্বল শরীরটাকে যেন টানতে পারছিল না আয়ানটো। তবু ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাত্রির মধ্যদিয়ে সে ছুটতে লাগল। যে লোকটি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কিংবা যারা তাকে টাকা-পয়সা কিংবা খাবার দিয়েছে– নিশ্চয়ই সবাই এতক্ষণে খুঁজতে শুরু করেছে আয়ানটোকে। একথা মনে করতেই সে দৌড়ের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। হোঁচট খেতে খেতে বন-বাদাড় পেরিয়ে, নদী পার হয়ে কান্নায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে অবশেষে পৌছল তাদের বিধ্বস্ত বাড়িটার বারান্দায়, সেখানে দাঁড়ানো তার মায়ের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। মা তাকে ধরে তুলল না কিংবা সান্ত্বনাও দিলো না কোনো। শুধু গলা চড়িয়ে বলে উঠল, খাবারগুলো সব এনেছ?

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে আয়ানটোর শরীর। তবু নিজেকে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করালো। ধীরে ধীরে খুলে ফেলল গায়ের চাদরটা। তারপর ভেতরের পকেটগুলো থেকে খাবারগুলো বের করতে লাগল। লোভনীয় খাবারগুলো সব দলা পাকিয়ে গেছে। সেদ্ধ ডিমগুলো চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। লেপ্টে গেছে শুয়োরের মাংসের টুকরোগুলো। গলে মাখামাখি হয়ে গেছে রুটির সব মাখন। কোনো কথা না বলে আয়ানটোর মা খাবারগুলো তুলে নিতে লাগল। আয়ানটোর শরীর থেকে চেঁছে নিলো লেগে থাকা খাবারের অংশগুলো। সবকুটু নেয়া হয়ে গেলে শুষ্ককণ্ঠে বলে উঠল, ব্যাস, হয়ে গেল? এটুকু খাবার! আর কিছু নেই?'

BanglaBook.org

'সবটুকু এনেছি।' আয়ানটো বলল মাকে। একটুও মুখে দিইনি।

বেশ হাল্কা লাগছে এখন তার বুকের ভেতরটা। কাজটা ঠিকভাবেই করতে পেরেছে সে। ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও লোভ সামলাতে পেরেছে। এখন খাবে সে পেট পুরে। এখন খেলে তার শরীরে লোকটার পাপ ঢুকতে পারবে না। কিন্তু তার সব আশা নিভে গেল, যখন দেখল তার মা খাবারগুলো নিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে যাচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ওগুলো?' বলল আয়ানটো। এসব খাবার আমার। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে। মায়ের পিছু পিছু আসতে লাগল সে। 'খাবারগুলো তুমি নিজে সব খেয়ে ফেলবে না তো? নাকি বাবাকেই সবটুকু খাইয়ে দেবে।'

মা ফিরে তাকাল ছেলের দিকে। পাবে, সবটুকু খাবারই তুমি পাবে।

কম। কিংবা দুধের মধ্যে এক দু'ফোটা পানি। কিন্তু যে মানুষটা পাপখাদক হয় তার পাপের বোঝা সীমাহীন। পাপীদের সমস্ত পাপ তার শরীরে সঞ্চারিত হয়। দিনের পর দিন পাপীদের পাপের বোঝা ঠাঁই করে নেয় তার কাঁধে। ক্ষমাহীন ভয়ংকর পাপ সব। সামান্য খাবার এবং টাকার লোভে পাপীদের সব পাপ নিজের মধ্যে টেনে নেয় পাপখাদক। কিন্তু স্বয়ং পাপখাদকের পাপের বোঝা কে তার ঘাড়ে নেবে? কে পাপ খাদককে মুক্ত করবে সীমাহীন পাপ থেকে? আয়ানটোর মা জানে, তার স্বামী প্রায় মৃত্যুর দ্বারে এসে পৌঁছেছে। অন্যের পাপ কাঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঠাঁই নেবে বেচারি।

আয়ানটোকে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল তার মা। কিছুক্ষণ পর ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলের একটা হাত ধরে তাকে ভেতরের দিকে টেনে নিলো। ভেতরে ঢুকে আয়ানটো দেখল, তার বাবা চিৎ হয়ে স্থিরভাবে শুয়ে আছে, আর খাবারগুলো সব ছড়িয়ে পড়ে আছে বাবার শরীরের ওপর। মা সেদিকে ইশারা করে আয়ানটোকে বলল, 'যাও। তোমার জন্যই সব খাবার রাখা আছে, তোমার মৃত বাবার বুকের ওপর। যাও, সবটুকু তুলে তুলে খেয়ে নাও।'

দ্য সিন অব দ্য ফাদারস **অনুবাদ : মিজানুর রহমান কল্লোল**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অসুখ

হেনরি স্লেসার

ড. ক্রাভাটের চেম্বারে বেঁটে, বিষণ্ন চোখের যে লোকটা ঢুকল, তার চেহারায় লক্ষ্য করার মতো কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে, ম্লান একটা ভাব ফুটে আছে মুখে। হাত জোড়া মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। গতরে ব্যথা, নিদ্রাহীনতা, বাম কানে শোঁ শোঁ শব্দ, ডান চোখে খিঁচুনি এবং কোমরে সদ্য গজিয়ে ওঠা নীলচে র‍্যাশ নিয়ে অভিযোগ করল সে। লোকটির নাম হারম্যান কাঙ্কল, বাস বা দুধের ট্রাক চালায়।

'হুম।' পেশাদারী ভঙ্গিতে বললেন ড. ক্রাভাট। 'র‍্যাটা কবে থেকে দেখছেন বললেন?

'তিন চার সপ্তাহ হবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাঙ্কল। 'তবে চুলকায় না বা ব্যথা করে না। অবশ্য রাতের বেলা পায়ে সুড়সুড়ি লাগে।'

'সুড়সুড়ি?'

'জি। মাঝ রাতের দিকে ব্যাপারটা ঘটে। তখন সুড়সুড়িতে হিহি করে হেসে উঠি আমি ঘুম ভেঙে।'

'পুরো চেকআপ করা দরকার।' গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন ডাক্তার।

'ক্রাভাটের চেম্বারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধুনিক উপকরণের অভাব যথেষ্ট। তিনি ডাউনটাউনে বিশ বছর ধরে প্রাকটিস করছেন। জায়গাটা দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। নগর অধিপতিরা নতুনভাবে কনস্ট্রাকশনের কথা ভাবছেন। তবে তাঁদের নীল নকশায় মেডিকেল আর্টস সেন্টারে ড. ক্রাভাট সম্ভবত থাকছেন না। তরুণ ডাক্তারদের সাথে প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য নেই বলেই হয়তো। একদা যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী ছিলেন ক্রাভাট। নাম এবং যশের প্রতি প্রবল মোহ ছিল। এখন হারম্যান কাঙ্কলের শরীরে অদ্ভুত র‍্যাটি দেখার পর তাঁর ভেতর আগেকার সেই উত্তেজনা ফিরে এলো আবার।

'মিস্টার কাঙ্কল।' হাতের তালুতে রিফ্লেক্স হ্যামার ঠুকতে ঠুকতে বললেন তিনি। আপনার শরীরের রোগটি আমার ধারণা সাধারণ কিছু নয়। তবে নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আমার কিছু এক্সরে রিপোর্ট দরকার।

পেনিসিলিন বা এ জাতীয় কোনো ওষুধ খেলে এটা যাবে না। ডায়াগনোসিস শেষ হবার আগে সে কথা বলা মুশকিল। হতে পারে বলার সময় দম বন্ধ হয়ে এলো তাঁর। এটা হয়তো একদম নতুন কোনো রোগ মি. কাঙ্কল।

BanglaBook.org

এক্সরে ল্যাবরেটরির ঠিকানা নিয়ে অসন্তুষ্ট মনে বিদায় হলো হারম্যান কাঙ্কল। ড. ক্রাভাট ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সমস্যাটি নিয়ে। বিষয়টি নিয়ে তিনি যতো চিন্তা করলেন, ততই নিশ্চিত হলেন, বহু আগে নতুন কি জাতের শংকর বেড়ালের মধ্যে কাঙ্কলের রোগের লক্ষণগুলো তিনি দেখেছিলেন। ড. ক্রাভাটকে প্যাথলজির এনসাইক্লোপেডিয়া বলা হয়। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কারণে ক্লাসে সবসময় ফার্স্ট হতেন তিনি। তবে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি কাজে লাগিয়েও ডাক্তার হিসেবে সফল হতে পারেননি ক্রাভাট। তাঁর ভেতর রহস্যজনক কিছু একটা ঘাটতি আছে। হয়তো ব্যক্তিত্বের অভাব। তার দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তারপর বিরক্ত বোধ করেন। শেষে বাধ্য হয়ে পাঁচ ডলার ফি-তে রোগী দেখা শুরু করেন। কম পয়সার ডাক্তার বলে কাঙ্কল এসেছিল তাঁর কাছে। কিন্তু কাঙ্কলের সমস্যাটা কি? তিনি আবার শুরু করে দিলেন গবেষণা।

সে রাতে টানা চারটা ঘণ্টা ক্রাভাট ব্যয় করলেন মেডিকেল বই ঘেঁটে, ভুলে যেতে পারেন এমন কোনো লেখার পেছনে। তবে যতই ঘাঁটাঘাটি করলেন ততই উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল তাঁর। মোটা মোটা বইগুলো স্তূপ হয়ে জমতে শুরু করল পাশে মনে মনে আশা করে আছেন কাঙ্কলের অসুখের কোনো বর্ণনা তিনি কোনো বইতে পাবেন না। তিনি চাইলেনও না তা থাকুক। চাইছেন কাঙ্কলের অসুখটা নতুন কিছু হোক– একদম তাঁর নিজস্ব।

ঘুমাতে যাবার আগে ডক্টর মনে মনে তাঁর নতুন প্রবন্ধের শুরুটা ভেবে নিলেন– ক্রাভাট ডিজিজের লক্ষণগুলো হলো...

দিন দুই পরে কাঙ্কল এল এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে। ক্রাভাট টেকনিশিয়ানের রিপোর্ট পড়লেন, তারপর সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখলেন নেগেটিভ। কোনো সন্দেহ নেই এক্সরে বিশ্লেষণ ব্যর্থ হয়েছে অসুখটার ধরন নির্ধারণে।

'কি দেখলেন, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল কাঙ্কল।

অস্বাভাবিক কিছু নয়। সন্দেহ নেই আপনি দুর্লভ কোনো রোগের জন্ম দিয়েছেন শরীরে। আপনার রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমাকে। তারপর বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী। কাঙ্কল জামার আস্তিন, গোটাতে শুরু করল।' শুনলে খুশি হবেন আপনার রোগ নিয়ে আমি মেডিকেল জার্নালে লিখতে যাচ্ছি। খিকখিক হাসলেন ক্রাভাট। 'আপনি বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছেন মি. কাঙ্কল, আপনিই হবেন প্রথম ক্রাভাট ডিজিজ আক্রান্ত লোক।

'কি বললেন?' চোখ পিটপিট করল কাঙ্কল।

'ক্রাভাট ডিজজ', জবাব দিলেন ডাক্তার। ওটার এমন নামকরণ করেছি আমি। বাঁ হাতটা একটু বাড়ান তো দেখি।

'আপনি না বললেন, আপনি জানেনা না অসুখটার ধরন কি?

'না তাই তো ওটার একটা নাম দিয়েছি।' হাসিমুখে বললেন ক্রাভাট, রক্তের স্যাম্পল নিলেন। মুখ গম্ভীর রেখে দৃশ্যটা দেখল কাঙ্কল।

'বুঝলাম না' বলল সে, 'আপনি ওটা ক্রাভাট ডিজিজ বললেন কেন?'

'ওটাই আমার নাম ক্রাভাট।'

BanglaBook.org

'কিন্তু অসুখটা আপনার হয়নি ডাক্তার, হয়েছে আমার,' হেসে উঠলেন ডাক্তার, 'টেস্টটিউবে ঝাঁকি দিলেন স্যাম্পেল। আমি জানি মি. কাঙ্কল, কিন্তু এসব ব্যাপারে ও ধরনের পদ্ধতিই সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে। নতুন রোগের নামকরণ করা হয় সবসময় তার আবিষ্কর্তার নামে। আর এ রোগের আবিষ্কর্তা হলাম আমি।'

'আপনি? চোয়াল শক্ত হয়ে গেল কাঙ্কলের। কী বলছেন আপনি? আনি এই রোগের আবিষ্কর্তা। অসুখটা আমার হয়েছে। আপনার উচিত ওটার নাম কাঙ্কল ডিজিজ দেয়া।'

'কিন্তু ওভাবে নামকরণ হয়নি কখনো। ব্রাইট ডিজিজের নাম শোনেননি? হজকিন ডিজিজ? বা পারবিনসন ডিজিজ। ওইসব রোগের নামকরণ করা হয়েছে যেসব ডাক্তার প্রথম ওগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁদের নামে।'

'তাতে আমার কিস্যু আসে যায় না, কঞ্চির মতো হাত শূন্যে ছুঁড়ে বলল কাঙ্কল। কাঙ্কল ডিজিজ ছাড়া ওটার অন্য কোনো নামকরণ করা যাবে না। আমার অসুখটা হয়েছে। কাজেই আমিই ক্রেডিট নেব।'

'সত্যি মি কাঙ্কল...।'

'সত্যি মিথ্যা জানি নে।' খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল কাঙ্কল।' আপনি ওটাকে ক্রাভাট ডিজিজ বলতে পারবেন না। আপনার কোনো অধিকার নেই।'

'কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয়ার...।'

'সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আমি।' শার্ট গায়ে চড়াতে শুরু করল কাঙ্কল।

'আরে, করছেন কী?'

'চলে যাচ্ছি,' গনগনে মুখ নিয়ে বললো কাঙ্কল, 'আমি আরেক ডাক্তার দেখাব।'

'তা কেন করবেন। আমি আপনাকে নিয়ে।'

'আরেক ডাক্তার দেখাব কী দেখাব না সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছে। আপনি বাধা দেয়ার কে? আমি এমন কারো কাছে যাব যে অসুখের নাম আমার নামে রাখবে।' প্যাঁকাটি মার্কা ঘাড়ে টাই পরছে কাঙ্কল। কাঙ্কল ডিজিজ। খোঁতখোঁত করে উঠল। টাই বাঁধছে, হাত কাঁপছে থর থর করে। 'হানম্যান কাঙ্কল ডিজিজ। আমার সাথে আর চিট করার সুযোগ আপনাকে দেব না মিস্টার।'

প্যান্টের নিচে শার্ট না গুঁজেই দরজার দিকে পা বাড়াল কাঙ্কল। এতো জোরে দরজা বন্ধ করল, প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠলেন ডাক্তার, হাত থেকে পড়ে গেল পার্কলা জারটা। মেঝেতে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ, শূন্য দৃষ্টিতে সাদা টাইলে ছিটানো রক্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন।'

সারাটা দিন নিজেকে নির্জীব, বলশূন্য লাগল ড. ক্রাভাটের। পত্রিকায় পাঠানোর জন্য লেখা প্রবন্ধটির প্রথম পৃষ্ঠাটি বারবার পড়লেন তিনি। ওটার একটা টাইটেলও দিয়েছেন তিনি। 'এ রিপোর্ট অন্য' দা ডিসকভারি অব ক্রাভাটস ডিজিজ। হেডিংটা এখন তাঁকে যেন খোঁচা মারতে লাগল।

রাগের চোটে কাগজটা ছিঁড়ে টুকরা করলেন তিনি, ফেলে দিলেন ময়লার ঝুড়িতে। তাঁর শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে, ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ছে। এক রোগী ফোন করেছিল তাঁকে, তিনি

BanglaBook.org

সাক্ষ্য দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলেন। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। হারম্যান কাঙ্কলের ওই নীলচে র‍্যাশ দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন অজানা এই রোগটি তাঁর জীবনে কী বিশাল ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে। স্কুল জীবনের স্বপ্ন তাঁর প্রায় পূরণ হতে যাচ্ছিল... হারম্যান কাঙ্কল শুধু রোগী নয়, তাঁকে অমরত্বের সন্ধান দিতে চলেছিল সে।

সেই রাতে মনে মনে একটা ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন ড. ক্রাভাট। ফোন করলেন কাঙ্কলকে।

তাঁর গলা শুনে কাঙ্কল বলে উঠল, 'আপনার সাথে আমার কোনো কথা নেই ডাক্তার। আমি আগামীকাল মেডিকেল আর্টস সেন্টারে যাচ্ছি।

মুখ কুঁচকে গেল ডাক্তারের।

'মি. কাঙ্কল, আপনি ভুল করেছেন। আমি আপনার চিকিৎসার সুব্যবস্থা ইতোমধ্যে করে ফেলেছি। আপনার উচিত আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা।'

'কিন্তু আমি কোনো ক্রাভাট ডিজিজ নিয়ে কথা বলতে চাই না'– 'আমি ও নিয়ে কোনো কথাও বলছি না। আমি কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলবও না।'

'সত্যি বলছেন তো?' সন্দেহ কাঙ্কলের গলায়।

'সত্যি বলছি। তবে পত্রিকায় আমি ঠিকই লিখব, কারণ আমি মনে করি একজন ডাক্তার হিসেবে এটা আমার কর্তব্য। তবে আপনি যদি অসুখটার নামকরণ করতে চান কাঙ্কল ডিজিজ, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'আমি কিভাবে বুঝব?'

'কি?'

'আপনি যে আমার কথা রক্ষা করবেন তা কিভাবে বুঝব?'

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন ক্রাভাট। 'আমি লিখিত প্রতিশ্রুতি দেব। লেখাটি আপনি নিজের হাতে পোস্ট করবেন। আপনি যা বললেন তাই করব। কাল একবার আসবেন আমার অফিসে?'

ওধারে নীরবতা।

'ঠিক আছে, ডাক্তার। আপনি কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন বলেছেন।'

পরদিন সকালে কাঙ্কল এলো ক্রাভাটের চেম্বারে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ড. ক্রাভাট কাঙ্কলের শরীরে সুঁই ফুটিয়ে শুরু করলেন তাঁর ট্রিটমেন্ট।'

অতএব ভদ্র মহোদয়গণ ড. ক্রাভাট ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন অডিটরিয়ামের দিকে। আমরা শরীরে নতুন যন্ত্রণা সৃষ্টির চেয়ে ওটার উপশমের দিকেই বেশি নজর দেব, চিকিৎসা বিজ্ঞান অন্তত তাই বলে আর ক্রাভাট ডিজিজ এখন থেকে শারীরিক যন্ত্রণার একটা অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের অভিধানে ওটা এখন থেকে স্থান পাবে। তবে দুর্ভাগ্যবশত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই যন্ত্রণা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। অন্তত কথাটা শেষ করলেন তিনি গম্ভীর মুখে। বিশেষ এই কেসটিতে তাই দেখা গেছে।

হস্টিস ডিজিজ **অনুবাদ : অনীশ দাস অপু**

BanglaBook.org

আতংকের রাত

এফ. ম্যারিয়ন ক্রফোর্ড

কেউ একজন চুরুট চাইল। দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিলাম আমরা, ইতোমধ্যে ক্লান্ত হতে শুরু করেছি। ঘরে তামাকের ধোঁয়ার পুরু পর্দা। আমাদের অবসন্ন মেজাজকে সতেজ করতে যদি না কেউ কিছু করে, স্বাভাবিকভাবেই তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে আলোচনা এবং আমরা অতিথিরা, ঘুমানোর জন্য দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা দেব। এতক্ষণ কেউ অদ্ভুত কিছু বলেনি, এমনকি কারো কথা শুনতেও তেমন অদ্ভুত লাগেনি। জোনস আমাদেরকে তার ইয়র্কশায়ারের সর্বশেষ শিকার অভিযানের গল্প শোনাল। বোস্টনের মি. টমপকিন্স দীর্ঘ সময় প্যাঁচাল পাড়ল এটকিসন টোপেকা আর সান্তা-ফে'র রেলরোড নিয়ে। আবার আলোচনায় বসতে কারো ইচ্ছে নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেবিলে বসে থাকতে থাকতে আমাদের সবারই একঘেয়েমি লাগছে। আমরা সবাই ক্লান্ত, কারো মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের কোনো লক্ষণ নেই।

কেউ একজন চুরুট চাইল। আমরা সহজাত প্রবৃত্তিতে তাকালাম বক্তার দিকে। লোকটা ব্রিসবেন, বয়স পঁয়ত্রিশ। তার কণ্ঠ আমাদের মনোযোগ কেড়ে নিল। শক্ত সমর্থ লোক সে। চেহারায় অসাধারণ কিছু নেই কেবল দৈহিক উচ্চতা ছাড়া। ছ'ফুটের উপরে লম্বা সে, কাঁধটা মোটামুটি বিশাল। সে মোটা নয়, আবার চিকনও নয়। শক্ত ঘাড়ের ওপরে ছোট আকারের মাথা, মোটা পেশীবহুল হাত দুটো দিয়ে অদ্ভুত দক্ষতায় আখরোট ভাঙছে সে। তাকে দেখে বোঝা যায়, বাইরে তাকে যতটা শক্তিশালী দেখায়, আসলে ভেতরে সে আরো বেশি শক্তিশালী। ছোট্ট মাথা, পাতলা চুল, নীল দুটো চোখ, লম্বা নাক, সরু গোঁফ আর চৌকো চোয়াল। সবাই ব্রিসবেনকে চেনে, আর তাই সে যখন সিগার চাইল, সবাই তাকাল তার দিকে।

'এটা খুবই আশ্চর্যের জিনিস,' বলল ব্রিসবেন, 'সবার কথা থেমে গেল। ব্রিসবেনের কণ্ঠ জোরাল ছিল না, কিন্তু কথা বলার বিশেষ ভঙ্গিটা ছুরির মতো ধারাল। প্রত্যেকে শুনতে পেল। ব্রিসবেন বুঝতে পারল, সবার মনোযোগ এখন তার দিকে। ধীরে-সুস্থে চুরুটে আগুন ধরাল সে।

'এটা খুবই আশ্চর্যের কথা,' ঘেই ধরে বলল সে, 'মানে ভূতের বিষয়টা। লোকজন সবসময় জিজ্ঞেস করে কেউ ভূত দেখেছে কিনা। আমি দেখেছি।'

BanglaBook.org

'ভুয়া। কি তুমি নিশ্চয়ই মুখে যা বলছ আসলে তা বোঝাতে চাইছ না, ব্রিসবেন? তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ?'

ব্রিসবেনের অদ্ভুত কথায় সবাই একসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করল। প্রত্যেকেই চুরুট চাইল, বাটলার হঠাৎ উপস্থিত হলো সেখানে এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে। পরিস্থিতি শান্ত হলে ব্রিসবেন বলতে শুরু করল তার কাহিনী...।

'আমি একজন পুরাতন নাবিক', বলল ব্রিসবেন। প্রায়ই আটলান্টিক পাড়ি দিতে হয় আমাকে। ঐ ডাকপাণ্ডটা অতিক্রমের সময় নির্দিষ্ট জাহাজগুলোর জন্য অপেক্ষা করা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটা আমার পূর্বসংস্কার হতে পারে, কিন্তু প্যাসেজটাতে জীবনেও এমন প্রতারিত হইনি, যেমন একবার হয়েছিলাম। ভালো করেই মনে আছে সেটা। তখন জুন মাস, আমার প্রিয় জাহাজগুলোর একটা 'ক্যামট শটকা'তে চড়েছিলাম আমি। কিন্তু ওটাতে আবার চড়ার কথা চিন্তাও করতে পারি না। হ্যাঁ, আমি জানি আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন। জাহাজটা খুবই পরিচ্ছন্ন, যা সচরাচর অন্য জাহাজের বেলায় দেখা যায় না, প্রচুর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে ওখানে। কিন্তু আর কখনোই আমি ওটাতে উঠব না। যাক সে কথা। জাহাজের ডেকে উঠে এক স্টুয়ার্ডকে ডাক দিলাম, নাকটা লাল ওর, গোঁফ জোড়া আরো লাল।

'একশ' পাঁচ, নিচের বার্থ,' নিয়মিত যাত্রীসুলভ গলায় বললাম আমি।

স্টুয়ার্ডটা আমার চামড়ার ব্যাগ, গ্রেটকোট আর কম্বল তুলে নিল। ওর মুখের অভিব্যক্তি কোনো দিন ভুলব না। মুখটা শুধু যে সাদা হয়ে গেল তা নয়। তার অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো এক্ষুনি সে হাঁচি দেবে কিংবা আমার ব্যাগটা ফেলে দেবে।

ব্যাগের ভেতরে আমার একটা বন্ধুর উপহার দেয়া চমৎকার দু'বোতল পুরনো শেরি রয়েছে। খুব নার্ভাস বোধ করলাম। কিন্তু স্টুয়ার্ড এরকম কিছু করল না।

'ঠিক আছে, আমার দুর্ভাগ্য।' নিচু গলায় বলল সে। তারপর হাঁটতে লাগল।

আমাকে নিচের রিজনে নিয়ে যাবার সময় স্টুয়ার্ডটাকে আমার কাছে সামান্য মাতাল বলে মনে হলো। কিন্তু কিছুই বললাম না আমি, কেবল তাকে অনুসরণ করলাম। একশ' পাঁচ নম্বর কেবিনটা জাহাজের পেছন দিকে, বাঁ পাশে। ওটার অসাধারণত্ব কিছু নেই। ক্যামট শটকার নিচের বার্থগুলোর অধিকাংশই ডাবল। প্রচুর জায়গা। ওখানে সাধারণ ওয়াশিং অ্যাপারেটাস রয়েছে। সেখানটায় রয়েছে পিঙ্গল কাঠের অকার্যকর ডাক যেটাতে সাধারণ টুথব্রাশ রাখার চেয়ে একটা বড় ছাতা ঝুলিয়ে রাখা আরো সহজ। অতিরিক্ত তোশকের ওপর যত্ন সহকারে একটার পর একটা ভাজ করে কম্বল রাখা। কোনো তোয়ালে দেখা গেল না। মদের গ্লাসগুলোতে ভরা রয়েছে বাদামি রঙের এক ধরনের তরল, ওটার ক্ষীণ গন্ধ সুখকর বলে মনে হলো না, কিছুটা অয়েলি মেশিনারির গন্ধের মতো। 'ওহ! কী বিশ্রী রুম।'

মালপত্র নামিয়ে স্টুয়ার্ড আমার দিকে তাকাল, চলে যেতে চাইছে সে– সম্ভবত অন্য যাত্রীদের খোঁজে। বেশি যাত্রী– বেশি পারিশ্রমিক। এসব কর্মচারীর সঙ্গে খাতির রাখা ভালো, তখনই তার হাতে কয়েকটা কয়েন গুঁজে দিলাম।

BanglaBook.org

'আপনার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় আমি সেটা আমার সাধ্যমত দেখব, বলল সে, কয়েনগুলো পকেটে ভরল। ওর কণ্ঠে সন্দেহজনক এমন কিছু ছিল যা অবাক করল আমাকে। সম্ভবত বকশিশের অংকটা কম হয়ে গেছে, খুশি হয়নি সে। অবশ্য আমার এও মনে হলো লোকটা মদে আসক্ত। আমি ভুল করেছিলাম, তখন বুঝিনি অবিচার করছি ওর প্রতি।

দুই.

সেদিন উল্লেখ করার মতো বিশেষ কিছু ঘটল না। যথাসময়ে আমরা জেটি ছাড়লাম। আবহাওয়া ছিল উষ্ণ ও চমৎকার। সাগরে ঢেউ তুলে জাহাজ চলতে শুরু করল।

জাহাজের প্রথম দিনটা কিভাবে কাটে তা সবাই জানেন। লোকজন ডেকের ওপর ঘুরে ফিরে একে অপরকে লক্ষ্য করে, মাঝে মাঝে পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। খাবারের ভালোমন্দ নিয়ে মনে সন্দেহ থাকে। প্রথম দু'বেলা খাবার পর সন্দেহ কেটে যায়। আবহাওয়া কেমন থাকবে তা নিয়েও চিন্তা জাগে। টেবিলে প্রথমে লোকজনের ভিড় হয়, পরে ধীরে ধীরে পাতলা হতে থাকে। ফ্যাকাসে মুখের লোকেরা সিট থেকে লাফিয়ে দরজার সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে থাকে। পুরাতন নাবিকরা সহজভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে।

আটলান্টিক পাড়ি দেয়া সত্যিই চমৎকার। তিমি আর আইসবার্গ সবসময় নজর কেড়ে নেয়। তবে মাঝে মাঝে একটা দুটো আইসবার্গের দেখা পেলাম আর একটা তিমি দেখতে ঠিক অন্যটির মতো। দিনের অধিকাংশ সময় আমরা বেশিরভাগ যাত্রী ডেকে হাঁটাচলা করলাম। তারপর শেষবারের মতো পায়চারি করতে করতে শেষ সিগারেটটা টানতে লাগলাম। ক্লান্তি লাগছিল খুব, তাই একটু তাড়াতাড়ি আমার একশ' পাঁচ নম্বর কেবিনে ফিরলাম। ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেছি, আমার একজন সঙ্গী রয়েছে। আমার মতোই একটা ব্যাগ আরেক কোণায় রাখা। উপরের বার্থে একটা ভাজ করা কম্বল পরিপাটি করে রাখা। ওখান থেকে একটা ছড়ি আর ছাতা ঝুলছে। একা থাকার ইচ্ছে ছিল, তাই হতাশ হলাম। কিন্তু আমার সঙ্গীটির কে তা জানতে ইচ্ছে হলো, ঠিক করলাম ও যখন ঘরে ঢুকবে তখন ওকে একবার দেখব।

বিছানায় যাবার একটু পরেই সে ঢুকল। যতটা দেখতে পেলাম সে ছিল খুব লম্বা, পাতলা আর ফ্যাকাসে এক লোক। ধুলোময় চুল-দাড়ি আর রঙহীন ধূসর দু'চোখ। এ ধরনের লোক ওয়াল স্ট্রিটে দেখতে পাবেন, কোনো কারণ ছাড়াই ঘুরঘুর করে। প্রত্যেক সামুদ্রিক জাহাজেই এ ধরনের তিন-চার জন মক্কেল দেখা যায়। ওর সঙ্গে পরিচিত হবার কোনো ইচ্ছে জাগল না। ঘুমিয়ে পড়ার আগে ঠিক করলাম ওকে আমি এড়িয়েই চলব। সে যদি সকাল সকাল ওঠে আমি উঠব দেরিতে আর সে যদি দেরি করে শুতে যায়, আমি যাব তাড়াতাড়ি। তাকে জানার আগ্রহ আমার নেই। এ ধরনের লোকদের যদি একবার লাই দেন, দিব্যি মাথায় চড়ে বসবে। বেচারা। ওর সম্পর্কে এতো কিছু সিদ্ধান্ত নেবার দরকার ছিল না। কারণ ঐ প্রথম রাতের পর একশ' পাঁচে তাকে আর কখনো দেখিনি।

BanglaBook.org

গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। শব্দ শুনে মনে হলো আমার রুমমেট উপরের বাথ থেকে লাফ দিয়ে মেঝেতে পড়েছে। দরজা খোলার চেষ্টা করছে শুনতে পেলাম। দ্রুত খুলে ফেলল ওটা, তারপর প্যাসেজে শোনা গেল ওর ছুটন্ত পায়ের শব্দ, পেছনে খুলে রইল দরজাটা। জাহাজটা অল্প অল্প দুলছিল। আশা করছিলাম ওর হোঁচট খাবার কিংবা পতনের শব্দ শুনতে পাব, কিন্তু পাইনি। উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। তারপর বিছানায় ফিরে এসে দিলাম এক ঘুম। কিন্তু কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না।

যখন ঘুম ভাঙল, তখনো পুরোপুরি অন্ধকার। বিরক্তিকর ঠাণ্ডা অনুভব করলাম। বাতাসটা স্যাঁতস্যাঁতে মনে হলো। আপনারা জানেন সমুদ্রের পানিতে ভিজে গেলে কেবিনে অদ্ভুত ধরনের গন্ধ হয়। কম্বল দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম আবার। সকালে লোকটার ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে হবে। একসময় উপরের বার্থে আমার সঙ্গীর অস্তিত্ব টের পেলাম। সম্ভবত আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম তখন সে ফিরে এসেছে। একবার তার আর্তনাদ শুনতে পেলাম বলে মনে হলো, বুঝলাম সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে সে। নিচে কেউ থাকলে তার কাছে ব্যাপারটা প্রীতিকর নয়। যা হোক, ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলে দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত ঘুমোলাম।

ভীষণভাবে দুলতে লাগল জাহাজটা, গত সন্ধ্যার চেয়ে বেশি পরিমাণে। পোর্টহোল দিয়ে ঢুকে পড়া ধূসর আলো, জাহাজের পার্শ্বদেশ যখনই সাগরের কিংবা আকাশের দিকে ঘুরছে তখনই তা বারবার দুলে যাচ্ছে। জুন মাসের তুলনায় ঠাণ্ডাটা খুব বেশি। ঘাড় কাত করে পোর্টহোলের দিকে তাকালাম। অবাক হয়ে দেখলাম ওটা পুরোপুরি খোলা এবং ঢাকনাটা পেছন দিকে আটকানো। উঠে গিয়ে ওটা লাফিয়ে বন্ধ করে এলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ রাখলাম উপরের বার্থে। পর্দাগুলো ঘন করে টাঙানো, আমার সঙ্গীর খুব সম্ভব আমার মতোই শীত করছে। আর ঘুমোতে ইচ্ছে করল না। ঘরটা অস্বচ্ছন্দ, যদিও রাতের বিরক্তিকর স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধটা টের পেলাম না। আমার রুমমেট তখনও ঘুমাচ্ছে– তাকে এড়ানোর জন্য একটা চমৎকার সুযোগ। কাজেই তখনই কাপড় পরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দিনটা গরম ও মেঘাচ্ছন্ন, সেই সঙ্গে পানিতে তৈলাক্ত গন্ধ। তখন সাতটা বাজে। এতো সকালে আর কেউ উঠবে ভাবিনি। ডাক্তারকে দেখতে পেলাম, সকালের বায়ুসেবন করছিলেন তিনি। ভদ্রলোক আইরিশ এবং দেখতে তরুণ। কালো চুল, নীল চোখ, হাসিখুশি— সবকিছু মিলিয়ে বেশ আকর্ষণীয়।

'চমৎকার সকাল', নিজেকে উপস্থাপনের জন্য মন্তব্যচ্ছলে বললাম।

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। এটা চমৎকার আবার চমৎকার নয়। আমার মনে হয় না সকালটা চমৎকার।

'তা ঠিক, খুব, একটা সুন্দর নয়', আমি বললাম।

'গুমোট আবহাওয়া,' ডাক্তার প্রত্যুত্তরে বললেন।

'রাতে খুব ঠাণ্ডা লাগছিল।' বললাম আমি। 'পরে তাকিয়ে দেখি পোর্টহোলটা খোলা রয়েছে। ঘুমোতে যাবার আগে আমি খেয়াল করিনি, আর রুমটাও ছিল স্যাঁতস্যাঁতে।'

BanglaBook.org

'স্যাঁতস্যাঁতে।' বললেন তিনি। 'কোনটাতে ছিলেন?'

'একশ পাঁচ'– চমকে উঠলেন ডাক্তার। তারপর হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না কিছু না।' উত্তর দিলেন তিনি। 'গত তিন ট্রিপে সবাই ঐ রুমটার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে।'

'আমিও অভিযোগ করব।' বললাম আমি। 'ঘরটাতে ঠিকমতো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই। লজ্জার কথা।'

'মনে হয় না অভিযোগ করে কোনো লাভ হবে।' উত্তর দিলেন ডাক্তার। 'আমার বিশ্বাস ওখানে কিছু একটা রয়েছে। যাকগে, যাত্রীদের ভয় দেখানো আমার কাজ নয়।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না।' জবাব দিলাম আমি। 'যে কোনো স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় আমি থাকতে পারি। যদি বিশ্রী ঠাণ্ডা লাগে তখন আপনার কাছে আসব।'

ডাক্তারকে চুরুট সাধলাম আমি। চুরুটটা হাতে নিয়ে গভীরভাবে তিনি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

'স্যাঁতস্যাঁতে এমন কিছু নয়।' বললেন তিনি। 'ওটা ভালোভাবেই কাটিয়ে উঠবেন। 'রুমে কি আপনার সঙ্গে কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ। বিরক্তিকর এক লোক। মাঝ রাতে খিল খুলে দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে যায়।'

আবার আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালেন ডাক্তার। চুরুটটা ধরালেন। এবার তাকে গম্ভীর দেখাল।

'সে কি করে এসেছে?' দেরি না করেই জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, আমি ঘুমোচ্ছিলাম, তবে নড়াচড়ার শব্দ শুনে জেগে উঠি। তখন শীত লাগে। আবার ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে পোর্টহোলটা খোলা দেখতে পাই।'

'শুনুন।' ধীরে ধীরে বললেন ডাক্তার। 'জাহাজের ভালো-মন্দ নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। আমার ঘরটা সুন্দর। যদিও আপনাকে আমি চিনি না তবু আপনার সাথে ওটা আমি শেয়ার করব।'

তাঁর এই প্রস্তাবে খুব অবাক হলাম আমি। বুঝতে পারলাম না আমার মঙ্গল কামনায় তার হঠাৎ এই আগ্রহ কেন। জাহাজ সম্পর্কে তাঁর কথাবার্তাও কেমন অদ্ভুত।

'ধন্যবাদ ডাক্তার।' বললাম আমি। 'আমার মনে হয় কেবিনটা পরিষ্কার করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমাদের পেশায় কুসংস্কার বলতে কিছু নেই জনাব।' জবাব দিলেন ডাক্তার। 'কিন্তু সমুদ্র মানুষের মনে এসব ধারণার জন্ম দেয়। আমি আপনাকে এসব বিশ্বাস করাতে চাচ্ছি না। আমি চাই না আপনি ভয় পান। কিন্তু আমার পরামর্শটা নিন, আপনি আমার কেবিনে চলে আসুন। খুব শিগগির আপনাকে আমি জাহাজ থেকে পানিতে পড়তে দেখব, আপনি কিংবা অন্য যে-ই একশ' পাঁচ নাম্বারে ঘুমাক না কেন একই পরিণতি হবে।'

BanglaBook.org

'গুড গ্রেসিয়াস। কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কারণ গত তিন ট্রিপে যারাই ওখানে ঘুমিয়েছে, তারা সবাই সোজা সাগরে গিয়ে পড়েছে। গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন তিনি।

ডাক্তারের দিকে তাকালাম, বোঝার চেষ্টা করলাম উনি ঠাণ্ডা করছেন কিনা। কিন্তু তাকে অত্যন্ত সিরিয়াস দেখাল। তাঁর প্রস্তাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম তাকে। বললাম, 'ঐ বিশেষ ঘরটায় ঘুমিয়ে আমি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাব। অন্য সবার মতো সাগরে পাওয়া যাবে না আমাকে।' আর কিছু বললেন না ডাক্তার কিন্তু আমার দিকে আগের মতো গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন, আমি তাঁর প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখব। একটু পরে নাস্তা করতে গেলাম আমরা। অল্প ক'জন যাত্রীকে দেখলাম ওখানে। দু'একজন অফিসার আমাদের সাথে নাস্তা করল, গম্ভীর দেখাল ওদের। নাস্তার পর ঘরে গেলাম একটা বই আনার জন্য। উপরের বার্থের পর্দাগুলোকে আগের মতোই ঘন করে টাঙানো দেখলাম। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আমার সহযাত্রী সম্ভবত এখনো ঘুমোচ্ছে।

বেরিয়ে আসতে স্টুয়ার্ডের সাথে দেখা হলো। যার কাজ ছিল আমার দিকে খেয়াল রাখা। ফিসফিস করে বলল, 'ক্যাপ্টেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।' এটা বলেই আমাকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই সে দৌড়ে পালাল। ক্যাপ্টেনের কেবিনের দিকে গেলাম। দেখলাম, আমার জন্য অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেন।

'স্যার।' বলল সে। 'আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ রাখতে চাই।'

উত্তরে বলল যে, তাকে যে কোনো সাহায্য আমি করব।

'আপনার রুমমেট নিখোঁজ হয়েছেন।' বলল সে। 'আমরা জানি গত রাতে তাড়াতাড়িই তিনি ঘুমোতে গিয়েছিলেন। তার আচরণে আপনার কাছে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েছে কী?'

আধঘণ্টা আগে ডাক্তারের সঙ্গে কথোপকথনের পর আবার ঐ একই প্রসঙ্গ নিয়ে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন আমাকে বিস্মিত করল।

'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে সে সাগরে পড়ে গেছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার আশংকা তাই ঘটেছে।' উত্তর দিলো ক্যাপ্টেন।

'এটা খুব আশ্চর্যের বিষয়।' বলতে শুরু করলাম আমি।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কারণ এই নিয়ে চার বার ঘটল।' বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললাম আমি। ক্যাপ্টেনের অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে জানালাম, একশ' পাঁচের গল্পটা আমি জানি, তবে ডাক্তারের নাম উল্লেখ করলাম না। আমি জানি দেখে ক্যাপ্টেন বিরক্ত হলো খুব। গত রাতে কী ঘটেছে তাকে তা বললাম।

'আপনি যা বললেন।' বলল সে। 'এর আগের তিন বারে ঐ কেবিনের দু'জন তাদের সহযাত্রীদের সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলেছিল। তারা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে প্যাসেজ ধরে দৌড় দেয়। তাদের মধ্যে দু'জনকে সাগরে পড়ে যেতে দেখা গেছে।

BanglaBook.org

জাহাজ থামিয়ে আমরা নৌকা নামিয়েছি কিন্তু তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশ্য গত রাতে যে লোকটা নিখোঁজ হয়েছে, যদি সত্যি সত্যি নিখোঁজ হয়ে থাকে, তাকে পড়ে যেতে দেখেনি কেউ।'

'স্টুয়ার্ড একটু কুসংস্কারে বিশ্বাসী। কিছু একটা আঁচ করতে পেরে সকালে তাকে দেখতে যায়। গিয়ে দেখে বার্থ খালি। তবে কাপড়-চোপড়গুলো পড়ে আছে। স্টুয়ার্ড সমস্ত জাহাজে তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। সে উধাও। এখন আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ স্যার, জাহাজের কোনো যাত্রীকে এ কথা জানাবেন না। জাহাজের একটা বদনাম নিতে পারেন, এমনকি আমারটাও। আমার কথা কী ঠিক আছে?'

'বিলকুল।' বললাম আমি। 'আপনার প্রতি আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু রুমটাতে যখন একা থাকার সুযোগটা পেলাম তখন আর ওটা ছাড়ছি না। এখন স্টুয়ার্ড যদি হতভাগ্য লোকটার জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে নেয় তাহলে আমি ওখানে সানন্দে থাকতে পারব। আমি ব্যাপারটা নিয়ে কাউকে কিছু বলব না, আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি আমার সঙ্গীকে অনুসরণ করব না।'

ক্যাপ্টেন আমার মত পরিবর্তনের অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে নড়লাম না। জানি না বোকার মতো কাজ করছি কিনা। তবে তার উপদেশ শুনলে আজ আর আপনাদের গল্পটা বলতে পারতাম না।

সন্ধ্যেবেলা আবার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলো। জানতে চাইলেন আমি মত পাল্টেছি কিনা। জানালাম পাল্টাইনি।

'তাহলে খুব তাড়াতাড়ি পাল্টাবেন।' বললেন তিনি। খুব চিন্তিত দেখালো তাকে।

তিন.

সন্ধ্যায় তাস খেললাম আমরা। বিছানায় গেলাম দেরি করে। স্বীকার করছি রুমে ঢোকার পর কেমন যেন অস্বস্তিকর অনুভূতি হলো আমার। গত রাতে দেখা লম্বা লোকটার কথা ভাবতে পারছি না। এখন মৃত সে। ডুবে গেছে দুই কি তিনশো মাইল দূরের উত্তাল সাগরে। পোশাক খোলার সময় ওর মুখটা স্পষ্ট ভেসে উঠল আমার সামনে। উপরের বার্থের পর্দা উঠানো। বুঝলাম সত্যি সত্যিই চলে গেছে আমার সঙ্গী। রুমের দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম পোর্টহোলটা খোলা এবং পেছন দিতে আটকানো। ড্রেসিং গাউনটা পরে দ্রুতবেগে রবার্ট অর্থাৎ আমার প্যাসেজের স্টুয়ার্ডের খোঁজে বেরুলাম। আমি তখন এতো রেগে গিয়েছিলাম যে এখনো মনে আছে ওকে দেখা মাত্র টেনে-হিঁচড়ে একশ' পাঁচে নিয়ে এলাম এবং ঠেলে দিলাম খোলা পোর্টহোলটার দিকে।

'বদমাশ, শয়তানি করার জায়গা পাও না! প্রত্যেক রাতে পোর্টটা খোলা রাখো? জানো না এটা আইন বিরুদ্ধ কাজ? জানো না জাহাজ কাত হলে আর পানি ঢুকতে শুরু করলে তখন দশজন মিলেও এটাকে বন্ধ করা যাবে না? তুমি একটা জঘন্য লোক। জাহাজটাকে বিপদে ফেলার জন্য আমি তোমার নামে ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করব।

BanglaBook.org

মারাত্মক রেগে গিয়েছিলাম আমি। লোকটা কেঁপে উঠে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর গোলাকার কাচের প্লেটটা পিতলের ভারি স্ক্রু দিয়ে লাগাতে আরম্ভ করল।

'আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?' কর্কশ গলায় বললাম।

'আপনি যা মনে করেন স্যার।' রবার্টের গলাটা কেঁপে উঠল। জাহাজের কারো সাধ্য নেই রাতেরবেলা এই পোর্ট বন্ধ রাখে। আপনি নিজে চেষ্টা করে দেখতে পারেন স্যার। আমি এই জাহাজে আর বেশিদিন থাকছি না। আমি যদি আপনি হতাম স্যার, সোজা রুম ছেড়ে বেরিয়ে যেতাম। সার্জন বা অন্য কারো সঙ্গে ঘুমাতাম। দেখুন তো স্যার, ঠিকমতো আটকেছে কিনা? টেনে দেখুন নড়ে কিনা।'

পোর্টটা টেনে দেখলাম ভালোভাবেই আটকানো হয়েছে।

'ভালোভাবেই আটকানো হয়েছে।' বিজয়ীর কণ্ঠে বলল রবার্ট। 'এ-ওয়ান স্টুয়ার্ড হিসেবে আমার খ্যাতি আছে। বাজি রেখে বলতে পারি আধ ঘণ্টার মধ্যে এটা আবার খুলে যাবে। পেছন দিকেও আটকানো থাকবে। ভৌতিক ব্যাপার স্যার, পেছন দিকে আটকানো।'

ভারি স্ক্রুটা পরীক্ষা করলাম আমি।

'যদি রাতে এটাকে খোলা পাই রবার্ট, তোমাকে আমি এক স্বর্ণমুদ্রা দেব। এটা সম্ভব নয়। তুমি যেতে পার।'

'স্বর্ণমুদ্রা, সত্যি বলছেন স্যার। খুব ভালো কথা স্যার। শুভ রাত্রি স্যার। সুখ নিদ্রা হোক আপনার।'

রবার্ট খুশি মনে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ভাবলাম একটা উদ্ভট গল্প শুনিয়ে সে তার অমনোযোগিতা ঢাকার চেষ্টা করছে। ভয় পাওয়াতে চাচ্ছে আমাকে। তাকে অবিশ্বাস করলাম আমি।

বিছানায় গেলাম। রবার্ট দরজার কাছে গ্রাউন্ড-গ্লাস পেনের পেছনের বাতিটা নিভিয়ে দেবার পাঁচ মিনিট পর কম্বল দিয়ে শরীরটা জড়িয়ে নিলাম। অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে থেকে ঘুমোবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ঘুম আসে না। স্টুয়ার্ডের কথাগুলো মনে পড়ল। আমার সঙ্গীর ডুবে মরার কথাটা চিন্তা করে মনটা তিক্ত স্বাদে ভরে উঠল। মাঝে মাঝে চোখ চলে যাচ্ছে পোর্টহোলের দিকে। অন্ধকারে ওটাকে বিবর্ণ স্যুপের প্লেট বলে মনে হচ্ছে। এক ঘণ্টার মতো কেটে গেল। সবে ঘুমটা লেগে এসেছে চোখে—এমন সময় ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় ঘুমটা ভেঙে গেল, টের পেলাম মুখের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে সাগরের পানি। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম, অন্ধকারে জাহাজের গতি সম্পর্কে সতর্ক ছিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে পড়লাম ঘরের এক কোণে। তাড়াতাড়ি হাঁতে ভর দিয়ে উঠে বসলাম। দেখলাম, পোর্টহোলটা আবারও খোলা রয়েছে এবং পেছন দিকে আটকানো।

সবই সত্যি ঘটনা। তখন সম্পূর্ণ জেগেছিলাম আমি। তাছাড়া আঘাত পেয়ে কনুই এবং হাঁটুতে এমন কালশিরা পড়ে গিয়েছিলেন, সকালে তা দেখে সন্দেহের অবকাশটুকুও রইলো না। পোর্টহোলটা খোলা দেখে যতটা না ভয় লেগেছে তার চেয়ে বেশি লেগেছে

BanglaBook.org

বিস্ময়ের ধাক্কা। তাড়াতাড়ি প্লেটটা নামিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ক্রু এঁটে দিলাম। ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেল। চিন্তা করতে লাগলাম, আমার সামনে রবার্ট পোর্টটা বন্ধ করে চলে যাবার এক ঘণ্টার মধ্যে খুলে গেছে। সিদ্ধান্ত নিলাম ওটা আবার খোলে কিনা তা নিজের চোখেই দেখব। পেতলের স্ক্রু এতো ভারি যে নড়ানো সহজ কথা নয়। ঝাঁকুনিতে স্ক্রু খুলে গেছে সেটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওখানে দাঁড়িয়ে পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে সাগরের ঢেউ দেখতে লাগলাম আমি। ঢেউগুলো জাহাজের গায়ে ফেনা তৈরি করছে। হুঁশ ফিরল প্রায় পনের মিনিট পর।

দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ আমার পেছনের বার্থে কি যেন নড়ে উঠল। দেখার জন্য সাথে সাথেই ঘুরে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে দেখা গেল না কিছুই। পরমুহূর্তে শুনতে পেলাম গোঙানোর অস্ফুট এক শব্দ। তাড়াতাড়ি রুমের মধ্যদিয়ে লাফিয়ে গিয়ে উপরের বার্থের পর্দাগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেললাম। হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগলাম ওখানে কেউ আছে কিনা। কেউ একজন ছিল ওখানে।

আমার মনে আছে, যখন হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ালাম মনে হলো স্যাঁতস্যাঁতে সেলারের বাতাসের মধ্যে হাত ঢুকিয়েছি। পর্দার পেছন থেকে বদ্ধ সামুদ্রিক পানির ভয়াবহ গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল। কিছু একটা ধরলাম আমি, মানুষের হাতের মতো মনে হলো। তবে জিনিসটা মসৃণ ভেজা এবং বরফের মতো ঠাণ্ডা। হঠাৎ করে ওটা টান দিতেই আমার গায়ে প্রচণ্ডভাবে লাফিয়ে পড়ল। আমার কাছে ওটা চটচটে, আঁঠাল এবং ভারি এক বস্তু বলে মনে হলো। যার রয়েছে আতিপ্রাকৃত শক্তি। টাল সামলাতে না পেরে আমি রুমের মধ্যে পড়ে গেলাম। সাথে সাথেই দরজাটা খুলে গেল। তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল ওটা।

ভয় পাওয়ার সময় নেই আমার। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে ধাওয়া করলাম ওটাকে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছি। দশ গজ সামনে ওটাকে দেখতে পেলাম– আমি নিশ্চিত ওটাকে দেখেছিলম– প্যাসেজের আবছা আলোতে কালো একটা ছায়ামূর্তি ছুটছে। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই ওটা মিলিয়ে গেল। পালিশ করা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। সামনে খাড়া পার্টিশন। আমার ঘাড়ের কাছের চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ঠাণ্ডা ঘাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম আমি।

নিজের বিচার বুদ্ধি সম্পর্কে সন্দেহ জাগল আমার। যা দেখেছি তা অবিশ্বাস্য। নিজেকে বোঝালাম এটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই না। রুমে ফিরে এলাম আমি। সমস্ত ঘর বদ্ধ সামুদ্রিক পানির গন্ধে ভরপুর। মনে সাহস সঞ্চয় করে হাতড়ে হাতড়ে আলো জ্বালালাম। দেখতে পেলাম আবার খুলে গেছে পোর্টহোল। ভয়ের এক শিহরণ বয়ে গেল আমার শরীর বেয়ে। আগে কখনো এমন অনুভূতি হয়নি। ভবিষ্যতেও আর অনুভব করতে চাই না। আলোটা নিয়ে উপরের বার্থটা পরীক্ষা করতে এগোলাম। ভেবেছিলাম সমুদ্রের পানিতে ভেজা থাকবে ওটা।

কিন্তু নিরাশ হলাম আমি। বিছানায় কেউ ঘুমিয়েছিল। সাগরের গন্ধটা ওখানে তীব্র।

BanglaBook.org

কিন্তু বিছানাটা পুরোপুরি শুকনো। এমন হতে পারে যে, গত রাতের দুর্ঘটনার পর রবার্ট বিছানাটাকে ঠিক করতে সাহস পায়নি। সবকিছুকে কেমন দুঃস্বপ্নের মতো লাগছিল। পর্দাগুলো যতদূর সম্ভব সরালাম আমি। জায়গাটা খুব সাবধানে পরীক্ষা করতে লাগলাম। সম্পূর্ণরূপে শুকনো ওটা। কিন্তু পোর্টহোল খোলা। ভয়ে হতবিহ্বল হয়ে ওটা বন্ধ করে দিলাম। এঁটে দিলাম স্ক্রু। ভারি একটা দণ্ড নিয়ে সর্বশক্তিতে প্যাঁচ দিলাম স্ক্রুতে। চাপের ফলে ভারি ধাতুটা বাঁকা হতে শুরু করলে তবে থামলাম। লণ্ঠনটা বিছানার মাথায় লাল ভেলভেটে ঝোলালাম। তারপর বসে পড়লাম নিজেকে শান্ত করতে। সারারাত ওখানে বসে কাটালাম। বিশ্রামের কথা ভাবতে পারলাম না। সবকিছু নিয়ে চিন্তা করতেও খুব কষ্ট হলো। তবে পোর্টহোলটা বন্ধ করা হয়েছে। দানবীয় শক্তি প্রয়োগ ছাড়া ওটা আর খোলা যাবে বলে বিশ্বাস হলো না আমার।

অবশেষে সকাল হলো। ধীরে ধীরে পোশাক পরে গত রাতের ঘটনাগুলো ভাবতে লাগলাম আমি। যখন ডেক-এ গেলাম, চারদিকে রোদের ছটা, নীল পানি থেকে ভেসে আসছে মৃদু গন্ধ যা আমার ঘরের বিদঘুটে গন্ধ থেকে পুরোপুরি আলাদা। হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তারের কেবিনের দিকে গেলাম। পাইপ মুখে দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

'গুড মর্নিং।' শান্ত ভাবে বললেন তিনি। তবে তীব্র কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

'ডাক্তার, আপনি ঠিকই বলেছিলেন।' বললাম আমি। 'জায়গাটিতে খারাপ কিছু আছে।'

'আমি জানতাম আপনি আমার মতো পাল্টাবেন।' তিনি উত্তর দিলেন। 'খুব বাজে রাত গেছে আপনার তাই না?'

গত রাতের ঘটনাগুলো খুলে বললাম আমি। শুনে মৃদু হাসলেন ডাক্তার। আপনি সত্যি কথা বলছেন তাতে সন্দেহ নেই। আপনাকে আবারো বলছি, মালপত্র নিয়ে আমার এখানে চলে আসুন। আমার কেবিনের অর্ধেকটা নিয়ে নিন।'

'এক রাতের জন্য আপনিই বরং আমার এখানে আসুন।' বললাম আমি। ব্যাপারটার সুরাহা করতে আমাকে সাহায্য করুন।'

'সে চেষ্টা করলে একেবারে তলদেশে পৌঁছে যাবেন।' উত্তর দিলেন ডাক্তার।

'কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সমুদ্রের তলদেশে। জাহাজ থেকে চলে যেতে চাচ্ছি আমি। এখানে সাহস দেখানোর কিছু নেই।'

'তার মানে কী ঘটেছে তা জানতে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না।'...

'কেবল আমি না।' তাড়াতাড়ি বললেন ডাক্তার। 'ডাক্তারি করাই আমার কাজ। ভূত-প্রেত নিয়ে গবেষণা করা নয়।'

'আপনি কী সত্যিই বিশ্বাস করেন এটা ভূত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দ্রুত আমার দিকে ফিরলেন ডাক্তার। 'আপনিই বা এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন?' পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'না, পারবেন না। কারণ এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।'

BanglaBook.org

'কিন্তু' প্রতিবাদ করলাম আমি। 'বিজ্ঞান নিশ্চয়ই এর কোনো ব্যাখ্যা দেবে।'

'তা দেবে।' উত্তর দিলেন ডাক্তার। 'কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করব না।'

নিরাশ হলাম খুব। যদিও একা ঐ রুমে থাকার সাহস পাচ্ছিলাম না। তবু মনে হলো কেউ যদি আমার সঙ্গে থাকত তাহলে রহস্যটা ভেদ করা যেত। একটু পরে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে বললাম আমার গল্প। বললাম, 'কেউ যদি আমার সঙ্গে রাতে থাকতে না চায় ঐ রুমে আমি একাই থাকব।'

'বেশ।' বলল সে। 'শুনুন আমি কী বলি। আমি থাকব আপনার সাথে। কি ঘটে তা আমরা দেখব। আমার বিশ্বাস রহস্যটা খুঁজে বের করতে পারব। আমার মনে হয় কোনো লোক ডেকে লুকিয়ে থেকে যাত্রীদের ভয় দেখাতে চায়।'

ক্যাপ্টেনের আমার সঙ্গে রাত কাটানোর প্রস্তাবে ভীষণ খুশি হলাম আমি। এক কর্মচারীকে ডেকে পাঠাল সে। নির্দেশ দিল আমার যা যা প্রয়োজন তা করে দিতে। তখনই নিচে নেমে এলাম আমরা। উপরের বার্থ থেকে সমস্ত বিছানাপত্র সরালাম। তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলাম জায়গাটা, কোথাও কোনো বোর্ড আলগা হয়েছে কিনা কিংবা প্যানেল এক পাশে সরে গেছে কিনা। তক্তাগুলোর প্রতিটা জায়গা পরীক্ষা করলাম। নিচের বার্থের স্ক্রু খুলে গিয়েছে কিনা দেখলাম। এমন এক ইঞ্চি জায়গা নেই যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করিনি আমরা। সবকিছুই ঠিক আছে। জিনিসগুলো আগের জায়গায় রাখতে লাগলাম আমরা। আমদের কাজ শেষ হতেই রবার্ট এসে উঁকি দিল।

'কিছু পেলেন স্যার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পোর্টহোল সম্পর্কে তুমি ঠিকই বলেছিলে বরার্ট।' বললাম আমি। প্রতিজ্ঞা করা স্বর্ণমুদ্রাটা ওকে দিলাম।

'আমি একজন সাধারণ মানুষ স্যার।' বলল কর্মচারীটি। 'কিন্তু আমার মনে হয় এ ঘর ছাড়লেই আপনি ভালো করবেন। কেবিনটা ভালো না। সত্যি স্যার। চারটে ট্রিপে চার জনের জীবন গেছে। রুমটা ছেড়ে দিলে ভালো করবেন স্যার, ভালো করবেন।'

'আরেকটা রাত আমি দেখতে চাই।' বললাম আমি।

'ছেড়ে দিন স্যার, রুমটা ছেড়ে দিন।' আবার বলল সে। তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

চার.

ক্যাপ্টেন ছিল সেইসব সমুদ্রচারী মানুষের এক চমৎকার নমুনা যার মধ্যে রয়েছে উৎসাহ, দুঃসাহসিকতা এবং শান্ত ভাব। রাত দশটার দিকে যখন আমি শেষ চুরুটটা টানছিলাম, আমার কাছে এলো সে। আমাকে অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে সরিয়ে ডেকের অন্ধকার জায়গাটায় নিয়ে গেল।

'বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ মি. ব্রিসবেন।' বলল সে। 'আমাদের মনটাকে ঠিক করতে হবে– আমরা নিরাশ হতে পারি আবার খুব বাজে সময় কাটাতে পারি। যাই ঘটুক না

BanglaBook.org

কেন আমি আপনাকে স্টেটমেন্টে সই করতে বলছি। যদি আজ রাতে কিছুই না ঘটে তাহলে আগামীকাল ও পরশু আমরা চেষ্টা করব। আপনি কি প্রস্তুত?'

এরপর নিচে গেলাম আমরা। ঘরটাতে ঢুকলাম। স্টুয়ার্ড রবার্টকে প্যাসেজের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। যেন আশা করছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। ক্যাপ্টেন আমাদের পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর তালা লাগাল।

'আপনার চামড়ার ব্যাগটা দরজার সামনে রাখা যাক।' পরামর্শ দিল সে। 'আমাদের একজন ওটার ওপর বসব। কিছুই বেরোতে পারবে না তখন। পোর্টে কী স্ক্রু লাগানো আছে?'

পোর্টটাকে সকালে যেমন দেখেছিলাম তেমনি দেখতে পেলাম। লিবার ব্যবহার ছাড়া ওটা খুলতে পারবে না কেউ। উপরের বার্থের পর্দাগুলো সরালাম যাতে ভেতরটা ভালো করে দেখতে পারি। ক্যাপ্টেনের কথামতো পড়ার লণ্ঠনটা জ্বালালাম। ব্যাগের উপর নিজে দেখতে চাইল ক্যাপ্টেন। তারপর অনুরোধ করল ঘরটা ভালোমতো পরীক্ষা করতে। কাজটা খুব তাড়াতাড়িই শেষ করলাম। নিচের বার্থের তলাটা ও পোর্টহোলের নিচের বিছানার তলাটাও পরীক্ষা করলাম, জায়গাগুলো সম্পূর্ণ খালি।

'কোনো মানুষের পক্ষে এখানে ঢোকা অসম্ভব।' বললাম আমি। 'কিংবা পোর্ট খোলা।'

'খুব ভালো।' শান্ত স্বরে বলল ক্যাপ্টেন। 'এরপরও আমরা যদি কিছু দেখি তাহলে তা হবে আমাদের কল্পনা কিংবা অলৌকিক ধরনের কিছু একটা।'

নিচের বার্থের কিনারায় বসলাম আমি।

'প্রথমবার ঘটনাটা ঘটে মার্চ মাসে।' বলল ক্যাপ্টেন। পায়ের ওপর পা তুলে দরজায় হেলান দিল। 'এখানে আপার বার্থে যে যাত্রীটা ঘুমিয়েছিল তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। মাঝরাতে রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। তারপর সাগরের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা জাহাজ থামিয়ে নৌকা নামাই। রাত ছিলো সম্পূর্ণ শান্ত। শুধু একটু আগে ঝড়ের মতো বাতাস বয়ে গেল। খুঁজে পেলাম না তাকে। নিশ্চিত সে উন্মাদ হয়ে যাবার ফলে আত্মহত্যা করেছিল।'

'প্রায়ই কী এরকম ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি কিছুটা অন্যমনস্কভাবে।

'সব সময় না।' বলল ক্যাপ্টেন। 'আমার সময়ে আগে ঘটেনি। তবে শুনেছি অন্য জাহাজে ঘটেছে। আমার সময়ে প্রথম ঘটে মার্চ মাসে। তার পরের ট্রিপেই। কী দেখছেন আপনি?' হঠাৎ বর্ণনা থামিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

আমার বিশ্বাস কোনো উত্তর দিয়েছিলাম না আমি। আমার চোখ দুটো পোর্টহোলের উপর স্থির ছিল। মনে হলো পিতলের স্ক্রুটা ধীরে ধীরে ঘুরছে। এতো ধীরে যে আমি নিশ্চিত হতে পারছিলাম না সত্যিই ওটা ঘুরছে কিনা। একাগ্র মনে দেখতে লাগলাম। আমার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে ক্যাপ্টেনও তাকাল সেদিকে।

'ওটা ঘুরছে।' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল সে। 'না ঘুরছে না।' এক মিনিট পর বলল।

BanglaBook.org

'যদি ওটা ঝাঁকুনির জন্য হয়।' বললাম আমি। 'দিনের বেলাতে তা হতে পারত। কিন্তু সন্ধ্যায়ও দেখেছি ভীষণ টাইট ওটা।'

উঠে দাঁড়ালাম আমি। পরীক্ষা করলাম স্ক্রুটা। একেবারে ঢিলে হয়ে আছে। কোনো শক্তি ছাড়াই আমি ওটাকে হাত দিয়ে ঘোরাতে পারলাম।

'অদ্ভুত ব্যাপার হলো।' বলল ক্যাপ্টেন। 'দ্বিতীয় লোকটা সম্ভবত এই পোর্টের মধ্যদিয়েই বেরিয়ে গেছে। তখন ছিল মাঝরাত। ঝড় হচ্ছিল খুব। এলার্ম পেলাম একটা পোর্ট খুলে গেছে এবং সেখান দিয়ে সাগরের পানি ঢুকছে। নিচে নেমে এলাম। দেখলাম বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। যখনই জাহাজটা কাত হচ্ছে তখনই পানি ঢুকছে। আমরা বন্ধ করলাম ওটা। কিন্তু পানি কিছু ক্ষতি করে দেয়। তারপর থেকে সময়ে সময়ে জায়গাটাতে সমুদ্রের পানির গন্ধ পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা যাত্রীটা পোর্টহোলের মধ্যদিয়েই বেরিয়ে গেছে। কেবল মাত্র ঈশ্বর জানেন কাজটা সে কিভাবে করছিল। স্টুয়ার্ড আমাকে বলেছিল এখানে কাউকে পায়নি। খোদার কসম, আমি এখন গন্ধ পাচ্ছি। আপনি পাচ্ছেন না?' বাতাসে নাক টানলো সে।

'হ্যাঁ, স্পষ্টভাবে।' বললাম আমি। 'এরকম গন্ধ স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতেই থাকে। অথচ সকালে দেখেছি সবকিছুই একেবারে শুকনো ছিল। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার– আরে!'

উপরের বার্থে রাখা আমার লণ্ঠনটা হঠাৎ করে নিভে গেল। দরজার কাছের নিচের কাচ দিয়ে আলো আসছে তখনও। প্রচণ্ডভাবে দুলতে লাগল জাহাজটা। উপরের বার্থের পর্দাটা একবার সামনে একবার পেছনে দোল খেতে লাগল। তাড়াতাড়ি বিছানার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন লাফিয়ে উঠে চিৎকার দিল। ঝাঁপ দিলাম তার দিকে। সে তখন প্রাণপণে পোর্টের পিতলের লুপের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। মনে হলো সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'হাতে ঘোরাচ্ছে ওটা। ভারি ওকের লাঠিটা আমার হাতেই ছিল। রিংয়ের মধ্যে লুকিয়ে গায়ের জোরে চেপে ধরলাম। কিন্তু শক্ত লাঠিটা হঠাৎ করে ভেঙে গেল। পড়ে গেলাম আমি। আবার যখন উঠে দাঁড়ালাম, দেখলাম পোর্টটা পুরোপুরি খোলা আর ক্যাপ্টেন পাংশু ঠোঁটে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'ঐ বার্থে কিছু একটা আছে।' ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার দিলো সে। চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। 'দরজাটা আটকে রাখুন, আমি দেখছি– যেই হোক না কেন পালাতে পারবে না।'

কিন্তু তার দিকে না গিয়ে নিচের বিছানায় লাফিয়ে উঠলাম আমি। উপরের বার্থে শুয়ে থাকা জিনিসটাকে জাপটে ধরলাম।

বীভৎস, ভয়ানক এক জিনিস। ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। নড়ে উঠল আমার মুঠোর মধ্যে। পানিতে ডুবে থাকা মানুষের শরীরের মতো লাগল ওটাকে। গায়ে দশজন জীবিত মানুষের শক্তি। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে পিচ্ছিল, আঁঠাল, ভয়ানক জিনিসটাকে চেপে ধরলাম। ওর মৃত সাদা চোখ দুটো ঈষৎ অন্ধকার। আমার দিকে চেয়ে রইল। ওর সমস্ত শরীরে সমুদ্রের পানির পচা-গলা গন্ধ। মৃত মুখটার ওপর দোল খাচ্ছে উৎকট গন্ধ

BanglaBook.org

মাখা ভেজা কোঁকড়ানো চুলগুলো। মৃত জিনিসটার সাথে ধস্তাধস্তি করছি আমি। ওর প্রচণ্ড ধাক্কায় মেঝেতে আছড়ে পড়লাম। আমার হাত দুটো প্রায় ভেঙে গেল। ঠাণ্ডা দুই বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল সে। একটা জীবন্মৃত পিশাচ। চিৎকার করে উঠলাম আমি। পড়ে গেলাম। আমার কাছ থেকে ছুটে গেল সে।

আমার শরীরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। শেষ যখন তাকে দেখলাম, ঠোঁট দুটো সাদা আর পরস্পরের সাথে সেঁটে ছিল। আমার কাছে মনে হলো প্রচণ্ড গতিতে মৃত জিনিসটাকে আঘাত করছে ক্যাপ্টেন, তারপর ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য থামল জিনিসটা। তারপর বিধ্বস্ত শরীরটার ওপর দিয়ে বাতাসে ঘুরতে লাগল। আবার ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল বস্তুটা আধো অনুভূতির মধ্যে। সম্ভবত, গর্তটা খুবই ছোট। মেঝেত ক্যাপ্টেনের পাশে অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম। যখন জ্ঞান ফিরল নড়ে উঠতেই টের পেলাম আমার বাঁ হাতের কব্জির কাছের হাড় ভেঙে গেছে।

অবশেষে উঠে দাঁড়ালাম আমি। অন্য হাতটা দিয়ে ক্যাপ্টেনকে তোলার চেষ্টা করলাম। আর্তনাদ করে উঠল সে, নড়ল। বুঝলাম মরেনি, তবে আহত হয়েছে দারুণভাবে।

এই হলো কাহিনী। আরো শুনতে চান? আর বেশি কিছু বলার নেই। এটাই আমার গল্পের শেষ। ছুতার হাফ ডজন চার ইঞ্চি স্ক্রু দিয়ে একশ' পাঁচের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। যদি কখনো ক্যামট শটকার প্যাসেজে যান দেখতে পাবেন তা। আপনি রুমটার বার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আপনাকে বলা হবে যে রুমটাতে লোক আছে। হ্যাঁ, আছে তবে ঐ মৃত পিশাচটা।

শেষ কটা দিন ডাক্তারের কেবিনেই কাটিয়েছি। আমার ভাঙা হাতের চিকিৎসা তিনিই করেছিলেন। আর আমাকে নিষেধ করেছিলেন ভবিষ্যতে ভূত বা এ ধরনের কিছুর সাথে না জড়াতে। এ ঘটনার পর থেকে ক্যাপ্টেন একেবারে চুপ হয়ে যায়। ঐ জাহাজে আর কখনো ওঠেনি সে। যদিও জাহাজটা এখনো চলছে। আর আমিও কখনো ওটাতে চড়বো না। খুব বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। ভয়ও পেয়েছিলাম খুব। ওটা এমনই এক জিনিস যা আমি পছন্দ করি না। যা হোক ভূত দেখেছি আমি, যদি ওটাকে ভূত বলে। মৃত ছিল সে যাই হোক।

দ্য আপার বার্থ **অনুবাদ : মিজানুর রহমান কল্লোল**

BanglaBook.org

ঘুমোতে হবে। নির্জন ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল ১৮ নম্বর থেকে ভেসে আসা পাগল মহিলার খনখনে হাসি। ডাক্তার আর নার্স দুজনেই বলে গেল সে নাকি বেয়াদবি করছে। বেয়াদবির শাস্তি ভয়ঙ্কর। না, নোরা আর কোনো শাস্তি পেতে চায় না। তাকে এখন ঘুমাতে হবে... সে এখন ঘুমিয়ে পড়বে... আহ ঘুম...।

ড. প্যাটারসনকে অস্থির লাগছে। নোরার কথায় কান দেয়ার কোনো মানে হয় না। বুঝতে পারছেন তিনি। কিন্তু তারপরও মনটা কেন জানি খচখচ করছে। কাল নোরার ডিসচার্জ ডে। এ কারণেই হয়তো মেয়েটা বেশি উত্তেজিত হয়ে আছে। কিন্তু ওর আতঙ্কিত চেহারাটা বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। অসুস্থতা নয়, মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে মেয়েটা...।

ড. প্যাটারসন ভাবলেন মরিসের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে একবার কথা বলবেন কিনা। পর মুহূর্তে নাকচ করে দিলেন চিন্তাটা। লোকটাকে খামোখা বিরক্ত করা হবে। মানসিক রোগীরা এরকম উল্টোপাল্টা কত কথাই তো বলে। সবার কথা সিরিয়াসভাবে নিলে অনেক আগে তাঁকেও ওদের দলে সামিল হতে হতো। কিন্তু তারপরও... নোরার আর্তনাদ আর ব্যাকুলতার মাঝে কিছু একটা ছিল। নাহ্‌থাক, মরিসকে কিছু বলার দরকার নেই। সে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নোরা নামের এক মেয়ে তাকে নিয়ে ভয় পাচ্ছে বললে মরিস নিশ্চয়ই বিব্রতবোধ করবে। ও ওর কাজ নিয়ে থাক। ড. প্যাটারসনেরও কাজ আছে। একবার ১৮ নম্বর কেবিনে যেতে হবে। ও ঘরের রোগিনীর পাগলামি বেড়েছে। ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেই চলবে।

হিউ মরিস তার ডেস্কের ঘণ্টা চেপে ধরল। তারপর আবার ঝুঁকে লিখতে শুরু করল। দরজায় কড়া নাড়ল কে যেন।

'ভেতরে এসো।' গম্ভীর গলায় বলল মরিস।

ভেতরে ঢুকল সহকারী টড।

'টড।' বলল মরিস। 'তোমাকে ডেকেছি আজ আর তোমার থাকার প্রয়োজন নেই বলতে। তুমি শুতে যেতে পারো। আমার প্রচুর কাজ জমে আছে। চাই না কেউ বিরক্ত করুক।'

'ঠিক আছে স্যার। আপনার কিছু লাগবে স্যার।'

'না টড। গুডনাইট।'

'গুডনাইট স্যার।'

চলে গেল টড। কান পেতে তার ক্রমশ অপসৃয়মান জুতোর শব্দ শুনল মরিস। না, আজ রাতে সে সত্যি চায় না কেউ তাকে বিরক্ত করুক। টড সাক্ষী দেবে সারারাত সে তার স্টাডিতে বসে লেখাপড়া করেছে। ডিনার জ্যাকেটটা গায়ে চাপাল মরিস। তার ওপর পরে নিলো ডাক্তারি সাদা লিনেন কোট। তারপর হাতে ঢোকাল নরম রাবারের গ্লাভস, ম্যান্টলপিসের ওপর রাখা আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল সন্তুষ্টি এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

BanglaBook.org

মধ্য চল্লিশ চলছে মরিসের। লম্বা-চওড়া শক্ত পোক্ত গড়ন। কপালের ঠিক উপরে ঘন-কোঁকড়ানো চুল ঢেউ খেলে অদৃশ্য হয়েছে ঘাড়ের পেছনে। দৃঢ় চিবুক, পাথুরে একটা মুখ, ঠোঁটজোড়া নিগ্রোদের মতো মোটা। সুদর্শনই বলা যায় মরিসকে– তবে দশ জনের ভিড়ে চোখে পড়ার মতো চেহারা নয়। শুধু চোখ জোড়া ছাড়া। তার চোখের রঙ গাঢ় নীল, আন্ডা সাইজ। সেখানে ফুটে আছে নিখাঁদ খুনি দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায় এ লোক ভয়ঙ্কর ফ্যানাটিক। নিন্দুকদের মতে, মরিসের চোখের দিকে তাকালেই নাকি মনে হয় উন্মাদ বা পাগলের দিকে চেয়ে আছি। তবে মেয়ে মহলে মরিসের ওই চোখের বন্ধু বা নিন্দুক, কে কি বলল, তার থোড়াই কেয়ার করে মরিস। সে শুধু একটা জিনিস নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে– তার পেশাদারি কাজ। তার প্রিয় কাজ হলো মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করা। আর আজ রাতে... আজ রাতে, উল্লাসের হাসি ফুটল মরিসের ঠোঁটে, সে নিজের থিওরি পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছে সম্মোহিত থাকা অবস্থায় সাবজেক্ট কতটুকু শারীরিক যন্ত্রণা বা ব্যথা সহ্য করতে পারে। ঘড়ির দিকে তাকাল মরিস। আরো এক ঘণ্টা পর অভিযানে বেরুবে সে।

চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে নোরার ছোট্ট রুম। অনেকক্ষণ জেগেছিল সে। ভয়ে আড়ষ্ট নোরা কম্বলের নিচে গুটিগুটি মেরে শুয়ে কান পেতে থেকেছে কখন শোনা যাবে করিডোরে সেই চেনা ভারি পায়ের আওয়াজ। সে পালিয়ে যেতে পারত করিডোর ধরে, কিন্তু দরজাটা শুধু বাইরে থেকে খোলা যায়। আর তাকে যদি একাকি করিডোরে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাহলে বিপদে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন করিডোরে চেনা পায়ের শব্দ শোনা গেল না, পেশীতে ঢিল পড়ল নোরার। খানিক পরে ঘুমিয়ে গেল সে।

মেনিহাম মেন্টাল হোমের গেটের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজার ঘোষণা করল। প্রকাণ্ড দালানটা অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু নাইট ডিউটিতে ব্যস্ত এক নার্সের ঘর থেকে ম্লান কমলা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। সে বই পড়ছে অথবা সেলাই করছে। তবে মাঝে মাঝে রোগী ডাকাডাকি করলে বিরক্ত হয়ে উঠে যেতে হচ্ছে তাকে।

নিজের ঘরের দরজা সাবধানে খুলল মরিস। জনশূন্য প্যাসেজ। প্রয়োজনে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে চলাফেরার অভ্যাস আছে ড. মরিসের। করিডোরে এসে ১৮ নম্বর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মহিলা নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। সে এবার নোরার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হাত দিয়ে কোটের পকেটে রাখা ছোট্ট ধাতবটাতে চাপ দিল। ঠাণ্ডা, অতীব ঠাণ্ডা। স্পর্শটা তাকে শিহরিত করে তুলল, মুখে ফুটে উঠল ভয়াল হাসি।

চোখ মেলে তাকাল নোরা। সকাল হয়ে গেছে? জানালার দিকে পাশ ফিরল সে। কটা বাজে বোঝা মুশকিল। তবে সকাল হতে বোধ হয় বেশি দেরি নেই। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মা চলে আসবে। উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এই নরক কুণ্ড থেকে। আহ,

BanglaBook.org

কতদিন পর আবার নিজের বাড়িতে, চির চেনা পারিপার্শ্বিকতার মাঝে ফিরে যাবে নোরা। ভাবতেই পুলক জাগছে শরীরে।

হঠাৎ দরজার বাইরে খুট করে একটা শব্দ বিস্মিত করে তুলল ওকে। আলোর ক্ষীণ একটা রেখা ঢুকল ঘরে। ক্রমে চওড়া হয়ে এলো। অবাক নোরা নজর ফেরাতে পারছে না ওদিক থেকে। ড. মরিস। বুঝে গেল নোরা। এবার আর রক্ষা নেই ওর। ইস কেন সে নার্সকে ধরে বসল না, জেদ ধরল না। ড. প্যাটারসনকে তার সব কথা শুনতে হবে। ড. মরিস সকালবেলা বলে গিয়েছিল– 'এটা শুধু তোমার আর আমার ব্যাপার মাই ডিয়ার। বুঝতে পেরেছ আমি কি বলতে চাইছি? কাউকে যদি বলে দাও আমি রাতে আসব, তাহলে খুন করে ফেলব তোমাকে।'

শিউরে উঠল নোরা মরিসের নীল চোখের অগ্নিদৃষ্টির কথা মনে পড়তে। ওই সময় স্রেফ অসার হয়ে গিয়েছিল নোরা। কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল। আর এখন লোকটা সত্যি সত্যি চলে এসেছে...।

হিউ মরিসের চওড়া কাঁধ আলোকিত জায়গাটুকু ঢেকে ফেলল।

ড. মরিস, ফিসফিস করল, 'নোরা চুপ করো, বোকা মেয়ে।'

ভেতরে ঢুকল সে। হেলান দিলো দরজায়। মৃদু শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কিন্তু নীরব রুমে বিস্ফোরণের মতো শোনালো আওয়াজ। দুই লম্বা কদম ফেলে নোরার সামনে চলে এলো সে। ডিম্বাকৃতির ম্লান মুখটা তুলল নোরা। ভয়ার্ত কণ্ঠে আবার বলল, ড. মরিস।

হিউ মরিস বসল নোরার পাশে। ভারি শরীরের চাপে ক্যাঁচক্যাঁচ করে আপত্তি জানালো বিছানা, হাত চেপে ধরল সে নোরার।

'নোরা– আমার দিকে তাকাও।' নোরার মুখের কাছে নিয়ে এসেছে মরিস নিজের মুখ, তার চওড়া চারকোনা বড় বড় দাঁত পরিষ্কার দেখতে পেল মেয়েটা। 'নোরা... মনে আছে তো আজ সকালে তোমাকে যা বলেছি। কাউকে নিশ্চয়ই বলোনি আজ তোমার কাছে আসব। নাকি বলেছ?'

'না, বলিনি ডক্টর।'

'আমার চোখের দিকে তাকাও।' নোরার চেপে ধরা হাতে মরিসের বজ্রমুষ্ঠি আরো কঠিন হলো। 'আমি তোমাকে যা করতে বলব, তুমি তাই করবে, বুঝেছ?' মরিসের গলার স্বরে কোনো উত্থান-পতন নেই। তুমি কোনো ব্যথা অনুভব করবে না– ব্যথা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে। আমি যা বলি আমার সাথে তাই বলবে। ভীত হবার কিছু নেই। বলো... ভয় পাবার কিছু নেই। ব্যথা বলে কিছু নেই।'

'ব্যথা বলে কিছু নেই।'

'ব্যথার অস্তিত্ব রয়েছে শুধু কল্পনায়।'

'ব্যথার অস্তিত্ব রয়েছে শুধু কল্পনায়।'

BanglaBook.org

নোরা টের পেল ধীরে ধীরে সে তার চেতনা হারিয়ে ফেলছে। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে... ওহ, কী যে ক্লান্ত সে। আর জেগে থাকতে পারছে না নোরা...। কিন্তু ওর মনের একটা অংশ ওকে সাবধান করে দিলো, এভাবে ঘুমিয়ে পড়া মোটেই উচিত হবে না, খুবই বিপজ্জনক হবে, তা খুবই বিপজ্জনক।

কিন্তু কোনো সাবধান বাণীই ওরা গ্রাহ্য করছে না। সে শুধু চাইছে ড. মরিস যেন আর তার দিকে তাকিয়ে না থাকে। ওই ভয়ঙ্কর চাহনি ওর মস্তিষ্কের ভেতর গেঁথে যাচ্ছে... চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চাইল নোরা– ঠিক তখন দুনিয়া আঁধার হয়ে এলো।

মরিস লক্ষ্য করল নোরার চেহারা ভাবলেশশূন্য হয়ে পড়েছে। খুশিতে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল সে, ছেড়ে দিলো নোরার হাত। অবিচল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে পকেট থেকে ধারাল ঝকঝকে স্কালপেলটা বের করল ডাক্তার। ঠাণ্ডা ইস্পাত ছোঁয়াল মেয়েটার হাতে, কিন্তু নোরা টের পেয়েছে বলে মনে হলো না।

'নোরা– আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

সাড়া নেই। সাবধানে ছোট্ট যন্ত্রটা তুলল মরিস। চাঁদের ঠাণ্ডা আলো গায়ে লেগে ঝিকিয়ে উঠল ব্লেড। নোরার হাতের পেছনে আস্তে একটা পোঁচ দিলো সে। সাথে সাথে সরু লাল একটা রেখা ফুটে উঠল ফর্সা মাংসে। ব্যথার অস্তিত্ব রয়েছে শুধু কল্পনায়– উল্লাসে শুঙিয়ে উঠল ডাক্তার মরিস। তার এক্সপেরিমেন্টের শুরু ভালোই হয়েছে।

হাত নাড়ল নোরা। আস্তে উদ্দেশ্য বিহীন। হাসছে সে– অর্থহীন, বোকা হাসি। মরিস দেখছে নোরা কী করছে। নোরার হাতটা কিলবিল করে এগিয়ে গেল তার দিকে। খামচে ধরল স্ক্যালপেল। ঝট করে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। বেশ তো, ভাবল সে, দেখা যাক মেয়েটা এবার কী করে?

'নোরা, তোমার বাম আঙুলে ছোট্ট একটা পোঁচ দাও– শুনতে পাচ্ছ কী বলছি? ব্যথা বলে কিছু নেই।'

ইতস্তত করছে নোরা। উত্তেজনায় অধীর হয়ে আছে। সাবজেক্ট যদি ব্যথা না পেয়ে নিজেই নিজের ওপর আঘাত হানে...।

জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নোরা। চাঁদের আলোয় ওর মুখখানা আলোকিত। শান্ত ভঙ্গিতে ডান হাতে ধরা ছুরিটা তুলল সে। এক মুহূর্ত স্থির থাকল নোরা। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে গলার কাছে উঠে এলো হাত। ধারাল অস্ত্রটা দিয়ে টান মারল গলায়।

'থামো।' উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল মরিস।

আতঙ্কিত মরিসের মনে হলো মেয়েটার দুটো মুখ হয়ে গেছে– দুটো লাল টকটকে হাসি মুখ, একটা মুখ তার গলার কাছে, ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে শরীর মুচড়ে বসে পড়ল নোরা মেঝের ওপর। পাতলা নাইট গাউন ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

BanglaBook.org

'নোরা।' হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মরিস। তার মনে হচ্ছে চারপাশে সে শুধু রক্ত দেখতে পাচ্ছে– মেঝেতে, বিছানায়, তার হাতে। পালাতে হবে। সম্বিৎ ফিরে প্রথমে এ ভাবনাটাই এলো ডাক্তারের মাথায়। কেউ তাকে তার ঘর ছেড়ে বেরুতে দেখেনি। স্ক্যালপেলটা নিয়ে নিজের স্টাডিতে ঢুকে পড়তে পারলেই হলো। পরে যখন এই করুণ দৃশ্যটা আবিষ্কৃত হবে তার আগেই সে মৃত নোরার হাতে সাধারণ একটা টেবিল নাইফ গুঁজে দিতে পারবে– ব্যাখ্যাটা হবে সাধারণ, নোরার কাছে ছুরিটা লুকানো ছিল, সে ওটা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

দরজার দিকে পা বাড়াল মরিস এবং সেই মুহূর্তের পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে জমে গেল। এ ঘরের দরজা বাইরে থেকে খোলা। সে নিজে দরজা বন্ধ করেছে, সকাল না হওয়া পর্যন্ত নিজের ফাঁদে নিজেকেই আটকে থাকতে তবে মরিসের। মেঝের ওপর পড়ে থাকা রক্তাক্ত লাশটার দিকে তাকাল সে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নিজেকে প্রবোধ দিলো ডাক্তার। জানালার দিকে এক কদম এগোলো সে। পা পিছলে গেল রক্তে। রক্ত... চারদিকে রক্ত। জানালার দিকে ঝুঁকল মরিস, মোটা মোটা লোহার শিক ওর দিকে তাকিয়ে যেন ভেঙাচ্ছে। প্রাণপণ চেষ্টা করল মরিস শিকগুলো বাঁকিয়ে ফেলতে। কিন্তু শক্তির অপচয় হলো খালি খালি। পরিশ্রান্ত মরিস টলতে টলতে ফিরে এলো বিছানায়। ধপ করে বসে পড়ল। মাথা গরম করলে চলবে না...। বারবার কথাটা শোনাচ্ছে ও নিজেকে। গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে তার নিজের ওপর। এমন কিছু করে বসা উচিত হবে না... কিন্তু কিইবা করার আছে তার। মাথার পেছনে হাত বেঁধে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল মরিস।

বাইরের ঘড়িতে তিনটে বাজার শব্দ হলো। তিনটা বাজে। তাড়াতাড়ি করতে হবে ওকে। নাইট নার্স আর আধা ঘণ্টা পর রাউন্ড দিতে বেরুবে।

এমন সময় মেঝের ওপর নিথর শরীরটা নড়ে উঠল...। শপথ করে বলতে পারে মরিস, সত্যি লাশটাকে নড়তে দেখেছে সে।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো... মাথা ঠাণ্ডা রাখো। মেয়েটা কষ্ট পায়নি– না, সে কষ্ট পেতে পারে না। কারণ ব্যথা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই।' বিড় বিড় করল মরিস।

একটু পর খেয়াল হলো নিজের সাথে কথা বলছে সে। নিজের গলা শুনে নিজেই ভয় পাচ্ছে? এ স্রেফ তোমার কল্পনা। ব্যথা বলে কিছু নেই। ব্যথা বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই– ওহ, আমাকে বেরুতে দাও। ঈশ্বর বাঁচাও, আমাকে এখান থেকে বের হবার পথ দেখাও! রীতিমতো চিৎকার শুরু করে দিলো মরিস। ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিল্লাচ্ছে ব্যথা বলে কিছু নেই, আমি বলছি, ব্যথার অস্তিত্ব শুধু আছে কল্পনায়। আমি প্রমাণ করেছি। ওটা প্রমাণ করেছি। আমাকে বেরুতে দাও।

দৌড়ে গিয়ে দরজার গায়ে আছড়ে পড়ল মরিস। দমাদম ঘুষি মারতে লাগল কপাটে, হাত ফেটে দরদর ধারায় বেরিয়ে এলো রক্ত। হঠাৎ করিডোরে মানুষের গলা

BanglaBook.org

শুনতে পেল সে। ফিসফিস করছে কারা যেন। তারপর এক লোক চেঁচিয়ে উঠল। এ নিশ্চয়ই প্যাটারসন, ভাবল মরিস। তারপর আরো কয়েকটা গলার আওয়াজ– ওয়ার্ডাররা আসছে।

আমাকে বেরুতে দাও– আমি প্রমাণ করছি। প্রমাণ করছি আমিই ঠিক— ব্যথা শুধুই ভ্রমমাত্র। তার স্বরে চেঁচাতে লাগল মরিস।

সাবধানে কেউ তালায় চাবি ঢোকাল। তারপর চট করে একদল লোক ঢুকে পড়ল ভেতরে। পেছনে ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে নার্সের দল।

'মরিস!' চারপাশে একনজর বুলিয়ে ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল প্যাটারসনের চোখ।

'আমি অবশেষে প্রমাণ করেছি প্যাটারসন– ব্যথা বলে কিছু নেই।' হিঁউ মরিস উন্মাদের মতো হাসছে। 'বুঝতে পেরেছ আমি কি বলেছি? আমি জিতে গেছি। আমি ব্যথাকে জয় করেছি।'

দ্য লাস্ট নাইট **অনুবাদ : অনীশ দাস অপু**

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রাতি ভয়াল

রবার্ট ব্লক

সূর্য ডুবে যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে। সারা আকাশে যেন রক্ত ছড়িয়ে তলিয়ে যায় সে পাহাড়ের আড়ালে। ওই দিকটাই যেন তার কবর। প্রচণ্ড বাতাসে গাছের ঝরাপাতাগুলো পশ্চিম দিকে ছুটে যায়। সূর্যের শবযাত্রায় যোগ দিতে যেন দেরি হয়ে যাচ্ছে।

'পাগলামি।' আপন মনে বলল হোন্ডারসন। মাথা থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল।

এই ভাবনার জন্য হয়তো বা আজকের দিনটাই দায়ী। ভাবল হোন্ডারসন। আজ হল 'হ্যালোইন'-এর রাত। 'অল-হ্যালোজ ইভ'। আত্মারা এই রাতে ঘুরে বেড়ায়। কবরের কঙ্কালরা চিৎকার করে।

এ রাতটা মামুলি এক ঠাণ্ডা শরতের রাত। দীর্ঘশ্বাস ফেলল হোন্ডারসন। এক সময়ে এ রাতের একটা আলাদা মানে ছিল। অন্ধকার ইউরোপ তখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। অজানার উদ্দেশে তখন তারা এই রাতকে উৎসর্গ করত অশুভ, অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথিদের মুখের সামনে দরজা বন্ধ হয়ে যেত। পবিত্র প্রার্থনা উচ্চারিত হতো লাখ লাখ কণ্ঠে। রেমাঞ্চকর জীবন ছিল তখন। মাঝরাতে না জানি কিসের সাথে মুখোমুখি হতে হবে, এই ভয়ে পথচারীরা বেরুতো রাতে। অশরীরী, প্রেত-পিশাচের যুগে বাস করত তারা। নিজের আত্মাকে বাঁচাতে সবসময় সতর্ক থাকত। আত্মার একটা দাম ছিল তখন। এখন এই বিংশ শতাব্দীতে আত্মার কোনো দাম নেই। কেউ শ্রদ্ধাও করে না আত্মাকে।

'পাগলামি।' আবার বিড় বিড় করে বলল হোন্ডারসন। এই চিন্তা থেকে মুক্তি চায় সে। অতীতের চিন্তা থেকে বর্তমানে ফিরে এলো। আজ রাতের মুখোশ-নাচের অনুষ্ঠানে যাবে সে। সেই অনুষ্ঠানের জন্য একটা পোশাক কিনবে বলে এই পড়ন্ত বেলায় রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে। 'হ্যালোইন' সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন না দেখে পোশাকের দোকানটা খুঁজে বের করা দরকার আগে। না হলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

সরু রাস্তার দু'পাশে অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণ বাড়িগুলো। তারই মাঝে তার চোখ দুটো খুঁজে বেড়াতে লাগল। টেলিফোনের বই থেকে ঠিকানা টুকে এনেছিল সে। সেটায় আর একবার চোখ বোলাল।

BanglaBook.org

আঁধার নেমে এসেছে চারদিকে। তবুও কেন আলো জ্বালাচ্ছে না এরা? এই আঁধারে বাড়ির নাম্বার পড়া যাচ্ছে না। দুস্থ-বস্তি এলাকা বটে, কিন্তু তাই বলে...।

হঠাৎ রাস্তার উল্টো দিকে একটা দোকানের দিকে চোখ পড়ল হোন্ডারসনের। রাস্তা পার হলো সে। দোকানের জানালা দিয়ে উঁকি দিলো ভেতরে। সূর্যের লালচে আলো তীর্যকভাবে জানালা ভেদ করে ভেতরের জিনিসের ওপর পড়ছে। দ্রুত শ্বাস নিলো হোন্ডারসন।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দোকানের জানালা দিয়ে। কোনো নরকের দিকে তাকায়নি তো। তবু আগুনের লকলকে শিখা এলো কোথা থেকে? জানালার ভেতরে রাখা দানবের মুখগুলোর ওপর আলো এলো কোত্থেকে? আলো লেগে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে মুখগুলো।

'সূর্যাস্ত' বিড়বিড় করে বলল হোন্ডারসন। তাই হবে হয়তো, কারণ দানবের মুখগুলো তো আসলে মুখোশ। এ ধরনের দোকানের জানালায় এসব সাজানো থাকে। যে কোনো কল্পনপ্রবণ লোকই এ দৃশ্য দেখল চমকে উঠবে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল হোন্ডারসন।

দোকানের ভেতরটা অন্ধকার কবরের মতো নিস্তব্ধ। সমাধি, গভীর জঙ্গলের কবর কিংবা খাদে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় ঠিক সেইরকম একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে দোকানের ভেতরে।

ওর হলো কি আজ? অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসল হোন্ডারসন। গন্ধটা দোকানেরই। হঠাৎ তার মনে পড়ল কলেজে অভিনয়ের কথা। ন্যাপথলিন করে যাওয়া লোমের পোশাক, মুখে মাখা রঙ, তেলের গন্ধ তার অতি চেনা। একবার হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সে। নাটকের এক দৃশ্যে দাঁত বের করা নর-করটি ছিল তার হাতে– সেটাও পোশাকের দোকান থেকেই ভাড়া করা হয়েছিল।

নর-করটির চিন্তাটার সঙ্গেই বুদ্ধিটা মাথায় এলো তার। আজ তো 'হ্যালোইন' এর রাত। মহারাজা, তুর্কি কিংবা জলদস্যুর বেশ নিতে চায় না সে। সবাই এই সাজই নেয়। তার চেয়ে বরং পিশাচ কিংবা নেকড়ে মানুষ সেজে গেলে কেমন হয়? এ ধরনের সাজে লিওস্ট্রমের রাজপ্রাসাদে গেলে তার চেহারাটা কেমন হবে এখনই যেন দেখতে পাচ্ছে হোন্ডারসন। তার অভিজাত বন্ধুদের অভিজাত ছদ্মবেশের মাঝে হোন্ডারসনের পোশাকটা চমকে দেবার মতো হবে নির্ঘাত। আচ্ছা, কোনো পিশাচের সাজ নিয়ে গেলে কেমন হয়? 'হ্যালোইন' এর সারমর্মকে যথার্থ মর্যাদা দেয়া হবে তাহলে।

গোধূলিতে দাঁড়িয়ে রইল হোন্ডারসন। কেউ আলো জ্বালিয়ে দেবে তারই অপেক্ষায় আছে। ওকে স্বাগতম জানাতে পেছনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে কেউ। ধৈর্য ধরে মিনিট খানেক অপেক্ষা করল সে তারপর কাউন্টারে সজোরে চাপড়া মারল একটা।

'শুনছেন! দোকানে কেউ আছেন।'

BanglaBook.org

নিরবতা। কোনো আওয়াজ নেই। পেছন থেকে শুধু ভেসে এলো একটা খসখস শব্দ। তারপর অন্ধকারে অস্বস্তিকর কিছু শব্দ কানে এলো। নিচ থেকে কিছু দুমদাম, খটখট শব্দের পর শোনা গেল পায়ের থপথপ। হঠাৎ আঁৎকে উঠল হোভারসন। কালো একটা ছায়া মেঝে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

আসলে ওটা হলো সেলার ঘর থেকে ওপরে আসার ট্রা-ডোর। কাউন্টারে একজন লোককে উদয় হতে দেখা গেল। লোকটার হাতে একটা ল্যাম্প। তাঁর আলোয় দেখা গেল লোকটার ঘুম কাতর চোখ দুটো পিটপিট করছে। মুখটা তার হলদেটে। সেই মুখে হাসি দেখা গেল।

'মনে কিছু নেবেন না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' অস্পষ্ট স্বরে বলল লোকটা। 'এবার বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি হ্যালোইনের জন্য একটা পোশাক খুঁজছি।'

'আচ্ছা। কী ধরনের পোশাক চাচ্ছেন?'

লোকটার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। হলদেটে ফোলা মুখে চোখ জোড়া পিটপিট করছে।

'গতানুগতিক কোনো পোশাক চাচ্ছি না আমি। আমার ইচ্ছে ছিল দানব কিংবা পিশাচের পোশাক পরে একটা নাচের আসরে যাব– কিন্তু মনে হয় আপনার কাছে সে ধরনের কোনো পোশাক নেই।'

'আপনাকে কয়েকটা মুখোশ দেখাতে পারি।'

'না আমি মুখোশ চাচ্ছি না। আমি মানে, ইয়ে মানে– নেকড়ের পোশাক কিংবা ওই ধরনের কিছু খুঁজছি। আসলে ওরকম কোনো পোশাক হলেই ভালো।'

'ও বুঝেছি– আসল জিনিস চাই?'

'হ্যাঁ।' মাথা মোটা বুড়ো দোকানদারটা 'আসল' শব্দটার ওপর এতো জোর দিচ্ছে কেন?'

'হ্যাঁ, তাও দেখাতে পারি– ঠিক সেই রকম জিনিসই আছে আমার কাছে।' চোখটা পিটপিট করছে এখনও। হাসির কারণে তার পাতলা ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেল। হ্যালোইনের জন্য মানানসই জিনিসই আছে।'

'কি জিনিস?'

'আপনি কখনো ভ্যাম্পায়ার হওয়ার কথা ভেবেছেন?'

'মানে ড্রাকুলা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ড্রাকুলা।'

'বুদ্ধি মন্দ না। আমাকে মানাবে?'

হেসে প্রশংসা করল দোকানি। 'যদ্দুর জানি ভ্যাম্পায়ার অনেক রকমের হয়। আপনাকে ভালোই মানাবে।'

BanglaBook.org

লোকটার প্রশংসার বহর দেখে হোন্ডারসন হাসল। বলল, আপত্তি কিসের। পোশাকটা কেমন?'

'কেমন আর? সান্ধ্য পোশাক আর কী, যা সব সময় পরেন। আপনাকে আমি একটা আসল আলখাল্লা দিচ্ছি।'

'শুধু একটা আলখাল্লা।'

'শুধু আলখাল্লা?' কিন্তু পোশাকটা পরতে হবে যেমন করে লাশ ঢাকে সেভাবে। লাশ ঢাকার কাপড় দিয়ে তৈরি ওটা। একটু অপেক্ষা করুন, নিয়ে আসছি।

খসখস শব্দে পা টেনে লোকটা দোকানের পেছনের ঘরে চলে গেল। পাটাতনের দরজা তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচে। এদিকে হোন্ডারসন অপেক্ষা করতে থাকল। দুমদাম শব্দ শোনা গেল আবার এবং একটু পরে একটা আলখাল্লা নিয়ে হাজির হলো লোকটা। পোশাক থেকে ধুলো ঝড়েছে সে অন্ধকারে।

'এই নিন, আপনার আসল আলখাল্লা।'

'আসল তো?'

'দাঁড়ান, ঠিক করে পরিয়ে দিই– হলফ করে বলতে পারি পোশাকটা ভোজবাজি দেখাবে।'

ঠাণ্ডা ভারি পোশাকটা হোন্ডারসনকে ঘিরে ঝুলতে লাগল। ছাতা পড়া একটা গন্ধ নাকে লাগল ওর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ঘরের আলো ম্লান, তবুও হোন্ডারসন লক্ষ্য করল আলখাল্লাটা তার চেহারা আমূল বদলে দিয়েছে। মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে। কালো আলখাল্লার জন্য মুখটা আরও বিবর্ণ লাগছে। ফলে চোখ দুটো আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। জিনিসটা লাশ ঢাকার বিশাল কালো কাপড়ের তৈরি।

'একদম আসল জিনিস।' লোকটা বিড় বিড় করে বলল। মনে হলো হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন লোকটা। কারণ আয়নায় হোন্ডারসন তার প্রতিবিম্ব দেখতে পায়নি।

'আমি নেবো এটা।' হোন্ডারসন বলল, 'দাম কত?'

'খুব মানাবে আপনাকে।'

'কত?'

'কত? পাঁচ ডলার।'

'এই নিন...।'

বুড়ো চোখ পিটপিট করতে করতে টাকা নিল। হোন্ডারসনের গা থেকে আলখাল্লাটা খুলে নিলো। আলখাল্লাটা খোলামাত্র শীত শীত ভাবটা কেটে গেল হোন্ডারসনের। পাতাল ঘরটা বোধহয় খুব শীতল– পোশাকটা বরফের মতো ঠাণ্ডা লাগছিল।

পোশাকের প্যাকেটটা হোন্ডারসনের হাতে তুলে দিলো দোকানি হাসি মুখে।

'কালই ফেরত নিয়ে আসব পোশাকটা।' হোন্ডারসন প্রতিশ্রুতি দিলো।

BanglaBook.org

তার কোনো দরকার নেই। আপনি তো কিনেই নিয়েছেন। আপনিই এখন এটার মালিক।

'কিন্তু...।'

'শুভ হোক আপনার সান্ধ্য-নাচের আসর।'

হোন্ডারসন পা বাড়াল দোকানের দরজার দিকে। একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত। আবছা অন্ধকারে ফিরে দাঁড়াল আবার বুড়োকে বিদায় জানাতে। বুড়ো তখনো চোখ পিটপিট করছে।

কাউন্টারের ওপাশ থেকে দুটো জ্বলন্ত চোখ যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সে চোখের দৃষ্টি স্থির।

'শুভরাত্রি।' হোন্ডারসন বলল। বেরিয়ে এসে ঝট করে দরজা আটকে দিলো ও। অবাক হয়ে ভাবছে, তার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো!

রাত আটটার দিকে লিওস্ট্রমকে ফোন করে হোন্ডারসন প্রায় বলেই ফেলেছিল যে সে নাচের আসরে আসতে পারবে না। আলখাল্লাটা গায়ে চাপানো মাত্র পুরো শরীর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় থর থর করে কেঁপে উঠল। আয়নার দিকে তাকিয়ে ঝাপসা চোখে নিজের শরীরকে ঠিকমতো চিনতে পারল না।

কিন্তু কয়েক গ্লাস হুইস্কি পেটে পড়তেই তার মেজাজ ভালো হয়ে গেল। এই পানীয় তার রক্তে উষ্ণতা দিলো। আলখাল্লাটা গায়ে দিয়ে পায়চারি করে অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়াস পেল সে। আলখাল্লাটাকে এপাশ-ওপাশ দুলিয়ে মুখ বিকৃত করে অনুশীলন করতে লাগল। ভ্যাম্পায়ার সে হবেই। যথাসময়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনল। তারপর নিচে নামল। ড্রাইভার ভেতরে এলো। আলখাল্লাটা ডানার মতো দু'পাশে গুটিয়ে রেখে অপেক্ষা করছিল হোন্ডারসন।

'আমি চাই, আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাও তুমি।' চাপা স্বরে ড্রাইভারকে বলল হোন্ডারসন।

'কী বললেন?'

'আমি তোমাকে আদেশ করেছি।' বিড় বিড় করে অস্ফুট স্বরে হোন্ডারসন বলল। ভেতরে ভেতরে হাসিতে ফেটে পড়ল ও। হিংস্র চোখে তাকিয়ে আখাল্লার প্রান্তটা ঝটকা মেরে সরিয়ে নিলো।

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ছুটে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার। দ্রুত পায়ে হোন্ডারসন তাকে অনুসরণ করল।

'কোথায় যাবেন স্যার?'

মুখস্থ পাঠের মতো সুর করে ঠিকানাটা বলে হেলান দিয়ে বসল হোন্ডারসন। আতঙ্কিত ড্রাইভার আর ফিরে তাকায়নি পেছন দিকে।

BanglaBook.org

এতো দ্রুত ছুটে চলল গাড়িটা যে হোন্ডারসন অন্যরকম চাপা হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল। হাসির শব্দে ড্রাইভার ভয় পেয়ে গেল। ট্রাফিক আইনের নির্দেশিত সর্বোচ্চ সীমায় তুলে দিলো গাড়ির গতি। হোন্ডারসন প্রাণ খুলে হেসে উঠল। সেই হাসির শব্দে সিটে বসে রীতিমতো কাঁপতে লাগল ড্রাইভার। গন্তব্যস্থলে পৌছাতে হোন্ডারসনকে অনেকটা পথ পার হতে হলো। কিন্তু পরের ঘটনার জন্য হোন্ডারসন একদম প্রস্তুত ছিল না। গন্তব্যস্থলে পৌছে গাড়ির দরজা খুলে নামামাত্র দরজাটা ধড়াস করে বন্ধ হয়ে গেল। ভাড়া না নিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে পালাল ড্রাইভার।

বিশাল বাড়ির লিফটে পা দিয়ে হোন্ডারসন ভাবল, 'আমাকে নিশ্চয়ই দারুণ মানিয়েছে।

লিফটের ভেতরে আরো তিন-চারজন লোক ছিল। লিওস্ট্রমের বাড়ির সবাই হোন্ডারসনকে আগেও দেখেছে। ওরা কেউই যেন চিনতে পারল না ওকে। ওরা ভাবতে লাগল আলখাল্লা পরে মুখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলায় চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি পালটে গেছে। অন্য অতিথিরা বিদঘুটে ছদ্মবেশ পরেছে। কিন্তু হোন্ডারসন তো চিনতে ভুল করছে না। মেয়েরা নিজেদের শরীর দেখানোর কাজে ব্যস্ত আর পুরুষরা নিজেদের পৌরুষ প্রমাণে অস্থির আছে যেন।

সত্যি বলতে কী লিফটের সবাইকে বিচিত্র পোশাকে দেখতে ভালোই লাগছে। মুখে অদ্ভুত রঙ মেখেছে সবাই। স্বাস্থ্যে এবং প্রাণশক্তিতে প্রত্যেকে যেন টগবগ করছে। ওদের গলা, ঘাড় বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো এক মহিলার গোলগাল হাতের দিকে নজর গেল হোন্ডারসনের। নিজের অজান্তেই তাকিয়ে রইল সেই হাতের দিকে। তারপর সে খেয়াল করল লিফটের সবাই তার থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে গেছে। লিফটের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ওরা যেন তাঁর আলখাল্লার এবং অভিব্যক্তিকে ভয় পাচ্ছে। আবার মহিলার দিকে ফিরে তাকাল। ওদের কথাবার্তাও হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। মহিলা তার দিকে তাকাল। মনে হলো মহিলা কিছু বলবে। কিন্তু তখনি লিফটের দরজা খুলে গেল। হোন্ডারসন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

হচ্ছেটা কী এসব? প্রথমে ট্যাক্সির ড্রাইভার, তারপর এই মহিলা। সে কি খুব বেশি মদ খেয়ে ফেলেছে?

তা কী করে সম্ভব? কিন্তু মার্কাস লিওস্ট্রম এতক্ষণে তার হাতে আবার মদের গ্লাস ধরিয়ে দিয়েছে।

'হোন্ডারসন, মাই বয়, খেয়ে নাও! আমি বোতল থেকে খাব। তোমার পোশাকটা আমাকে ভড়কে দিয়েছিল। ছদ্মবেশের বুদ্ধিটা পেলে কোথায়?'

'ছদ্মবেশ? কোথায় ছদ্মবেশ? আমি তো কোনো ছদ্মবেশ নেইনি।'

'ও তাই তো। আমি যে কী বোকার মতো কথা বলছি।'

মনে মনে হোন্ডারসন ভাবল, লিওস্ট্রম পাগল হয়ে গেল নাকি? সত্যিই কী ও ভয় পেয়েছিল? ওর চোখে কী কোনো আতঙ্কের ছাপ রয়েছে।

BanglaBook.org

'পরে তোমার সাথে কথা বলব। তোতলাতে তোতলাতে কথা বলল লিওস্ট্রম। তারপর ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল অন্যান্য অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে। হোন্ডারসন ওর ফর্সা খসখসে ঘাড়টা লক্ষ্য করতে লাগল। লিওস্ট্রমের পোশাকের কলার ছাপিয়ে ঘাড়টা ফুলে উঠেছে। সেই ঘাড়ে নীল শিরাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গলার শিরাটাও স্পষ্ট। লিওস্ট্রম সত্যিই আতঙ্কিত।

হোন্ডারসন একা দাঁড়িয়ে রয়েছে হলঘরে। পাশের ঘর থেকে হাসির আর বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। ও ঘরে ঢোকার আগে হোন্ডারসন দ্বিধায় ভুগল একটু। গ্লাসে চুমুক দিলো সে– কড়া, বাকার্ডি রাম। অন্যান্য পানীয়ের সাথে এই রাম মিশিয়ে খেলে যে কোনো মানুষের মাথা ঘুরে যেতে বাধ্য তবুও সে পান করল এবং অবাক হয়ে ভাবতে লাগল তার চেহারা আর পোশাকে গোলমালটা কোথায়? ওকে দেখে লোকে ভয়ইবা পাচ্ছে কেন? সে কী নিজের অজান্তে ভ্যাম্পায়ারের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে? একদিকে ওর ছদ্মবেশ নিয়ে লিওস্ট্রমের ঠাট্টা, আর অন্যদিকে–

হঠাৎ তার মাথায় ঝোঁক চাপল একটা। হলঘরের লম্বা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সামান্য টলে উঠল হোন্ডারসন, তারপর তীব্র আলোর মাঝে আয়নার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আয়নার দিকে সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে অথচ সেখানে কোনো প্রতিবিম্ব নেই।

হঠাৎ হাসতে শুরু করল হোন্ডারসন– গলার গভীর থেকে উঠে আসা চাপা শয়তানি হাসি। আয়নার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। আনন্দে তার হাসি উঁচু পর্দায় উঠে গেল।

'একেবারে মাতাল হয়ে গেছি।' ফিসফিস করে বলল সে। 'একেবারে বেহেড মাতাল। বাড়িতে আয়নায় ঝাপসা দেখেছিলাম নিজেকে, আর এখন এই আয়নায় আমাকে দেখাই যাচ্ছে না। নাহ সত্যি সত্যি মাতাল হয়ে গেছি। সেই তখন থেকে উল্টাপাল্টা কাজ করছি, লোকদের ভয় দেখাচ্ছি। দুঃস্বপ্ন দেখছি জেগে জেগে কিংবা বলা যায় কিছুই দেখছি না। সবই কল্পনা। গলার স্বর আরো নিচু করে বলল, এই সবই দেবদূতদের কাজ। আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। শুভসন্ধ্যা দেবদূত।'

'শুভসন্ধ্যা।'

চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল হোন্ডারসন। একটা মেয়ে দঁড়িয়ে আছে। একটা কালো আলখাল্লা তার পরনে। ফর্সা মুখ, মাথায় উজ্জ্বল একরাশ চুল। আকাশী নীল চোখ। ঠোঁটে যেন নরকের আগুন জ্বলছে।

'তুমি কী বাস্তব, নাকি কল্পনা?' আস্তে করে জানতে চাইল হোন্ডারসন। 'নাকি আমি অলৌকিক বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছি?'

'এই অলৌকিক ঘটনার নাম শিলা, ডার্লিং, আর আপনার আপত্তি না থাকলে এই নাকে একটু পাউডার লাগাতে চাই।'

স্টিফেন হোন্ডারসনের সৌজন্যে এই আয়নাটিই ব্যবহার করুন।' আলখাল্লা পরা হোন্ডারসন মুখে হাসি এনে বলল। এক পাশে সরে গেল সে।

BanglaBook.org

হোন্ডারসন একবার সগর্বে ঘোষণা করেছিল যে, 'লাভ এট ফার্স্ট সাইট' বলে কিছু নেই। গল্প-উপন্যাস বা নাটকেই এসব দেখা যায়। প্রেমের মূলই হলো কামনা। কিন্তু এই মুহূর্তে শিলা এসে তার ধ্যান-ধারণা পালটে দিয়েছে। মদের নেশা, আয়নায় বোকা বোকা চোখে তাকাল, বিষণ্ন চিন্তা সব তার মন থেকে উড়ে গেছে। লাল ঠোঁট, আকাশী নীল চোখের স্বপ্নে পাগল হয়ে গেছে সে।

হোন্ডারসনের ভাবনার ছোঁয়া লেগেছে শিলার চোখেও। আয়না থেকে চোখ ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'আশা করি পরীক্ষায় পাস করতে পেরেছি?'

'বললে বোধ হয় কমই বলা হবে। তবে স্বর্গীয় দেবীদের সম্পর্কে একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করে। পরীরা কী নাচ জানে?'

'বেশ চালাক ভ্যাম্পায়ার।'

'চালাক তবে ট্রানসিলভানিয়ার ভ্যাম্পায়ারদের মতো নয়। আমার সঙ্গে মিশলে মুগ্ধ হয়ে যাবে তুমি, কথা দিলাম।'

'হ্যাঁ, দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।' ঠাট্টা করে বলল শিলা। 'এক পরীর সঙ্গে এক ভ্যাম্পায়ারের অদ্ভুত যোগাযোগ।'

'আমরা একে অপরের ভুল ধরিয়ে দিতে পারব।' হোন্ডারসন বলল। 'তবে আমার ধারণা আমার মধ্যে একটা শয়তান বাস করে। তোমার শরীর থেকে পোশাকের সাথে এই কালো আলখাল্লা মিলেমিশে কালো পরী...। তুমি বোধ হয় স্বর্গে না এসে আমার দেশ থেকে এসেছ।... আমার কী এখন নাচের আসরে যাব?'

হাত ধরাধরি করে নাচের ঘরে এসে ঢুকল ওরা। হৈ-হুল্লোড় করছে সবাই। নেশার মাত্রা চরমে উঠেছে। নাচ থেমে গেছে। জোড়ায় জোড়ায় সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নারী-পুরুষ। এ ধরনের পরিবেশ হোন্ডারসনের পছন্দ নয়। তাই সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আলখাল্লার প্রান্ত ঝট করে কাঁধের ওপর নিয়ে এলো ড্রাকুলার মতো। বিবর্ণ চেহারা বিকৃত। লম্বা পা ফেলে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল চিন্তিত চেহারায়। শিলা ভাবল, হোন্ডারসন অভিনয় করছে।

'ভ্যাম্পায়ারের অভিনয় করে দেখাও ওদের।' হোন্ডারসনের হাত ধরে হাসতে হাসতে বলল শিলা। আর হোন্ডারসনও মুখ বিকৃত করে মেয়েদের ভয় দেখাতে লাগল। হল ঘরের হৈচৈ থেমে গেল হঠাৎ করেই। হোন্ডারসনের দিকে ফিরে তাকাল সবাই। লম্বা ঘরটাতে সে জীবন্ত মৃত্যু-দূত হয়ে ঘুরতে লাগল।' ফিসফিস করে কথা বলছে সবাই।

'কে লোকটা।'

'লিফটে ওর সঙ্গেই উঠেছি আমরা তখন...।'

'চোখ দুটো দেখ...।'

'ভ্যাম্পায়ার।'

'এই যে ড্রাকুলা।' মার্কাস লিওস্ট্রম ডাকল। সঙ্গে রয়েছে গোমড়া মুখো এক কালোকেশী। ক্লিওপেট্রার পোশাক পরে আছে সে। হাঁটার ধরন দেখে বোঝা যায় বেহেড

BanglaBook.org

মাতাল। হোস্ট লিওস্ট্রম কোনো রকমে দুই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। লিওস্ট্রল ক্লাবে যখন ভদ্রভাবে থাকে তখন তাকে হোন্ডারসনের ভালো লাগে কিন্তু সান্ধ্য আসরে তার ব্যবহার একদম ভালো লাগে না। যেমন এখন।

ডার্লিং, এসো, আমার অতি প্রিয় বন্ধুর সাথে তোমায় পরিচয় করে দিই। ও হ্যাঁ, সুধীমণ্ডলী আজকের এই হ্যালোইন পার্টি উপলক্ষে কাউন্ট ড্রাকুলাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তার মেয়েকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছি। কাউন্ট আমার খেলার সাথীর সাথে আলাপ করুন।'

বাঁকা চোখে হোন্ডারসনের দিকে তাকাল কালোকেশি ক্লিওপেট্রা।

'ও ড্রাকুলা, আপনার চোখ দ্‌টো বড় বড়, কি লম্বা দাঁত। ও...।'

'এসব কী হচ্ছে মার্কাস।' হোন্ডারসন ধমক দিয়ে বলল। কিন্তু হোস্ট লিওস্ট্রম ততক্ষণে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে শুরু করে দিয়েছে।

'বন্ধুগণ! আসুন, আসল জিনিসের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। একমাত্র জীবন্ত ভ্যাম্পায়ার! ড্রাকুলা হোন্ডারসন, নকল দাঁত লাগলো ভ্যাম্পায়ার।'

অন্য পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে হোন্ডারসন ঠিকই লিওস্ট্রমের চোয়াল বরাবর একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিত। কিন্তু এখন এখানে শিলা রয়েছে। অতিথিরা রয়েছে। তার চেয়ে একটা মজা করা যাক। কিছুক্ষণ ভ্যাম্পায়ার হলে ক্ষতি কী?

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে একবার হাসল হোন্ডারসন। টান টান হয়ে দাঁড়ালো। তাকাল অতিথিদের দিকে। তারপর ভয় দেখানো অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল চেহারায়। আলখাল্লাটা ছুঁলো। আশ্চর্য পোশাকটা এখন বরফের মতো ঠাণ্ডা। নিচের দিকে তাকিয়ে প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করল পোশাকটার প্রান্তটা ময়লা। ধুলো বা কাদা লেগেছে। লম্বা হাতে বুকের ওপর পোশাকের টেনে আনার সময় ঠাণ্ডা সিল্কের কাপড় আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে গেল। এই অনুভূতি হোন্ডারসনকে প্রেরণা যোগাল। চোখ দুটো তার বড় বড় হয়ে গেছে। দৃষ্টিতে আগুন। ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো। নাটকীয় একটা ক্ষমতা অনুভব করল সে। মার্কাস লিওস্ট্রমের মাংসল ঘাড়ের দিকে তাকাল। ফর্সা ঘাড়ে একটা নীল শিরা তির তির করে লাফাচ্ছে। হোন্ডারসন ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখল অতিথিরা তাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ যেন ভয়ংকর একটা তাড়না অনুভব করল সে। ঘুরে দাঁড়াল দৃষ্টি মোটা মানুষটার মাংসল ঘাড়ের দিকে।

দুটো হাত এগিয়ে গেল। কলে পড়া ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করছে লিওস্ট্রম। মোটাসোটা তাজা একটা সাদা ইঁদুর যেন। রক্তে টইটুম্বর। ভ্যাম্পায়াররা রক্ত পছন্দ করে।

'তাজা রক্ত।'

গভীর কণ্ঠে বলল হোন্ডারসন।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে লিওস্ট্রমের গলা চেপে ধরেছে হোন্ডারসনের হাত দুটো। গলার উষ্ণতা অনুভব করছে। নীল শিরাটা খুঁজে পেল। হোন্ডারসনের মুখ ঝুঁকে পড়ল

BanglaBook.org

মার্কাসের ঘাড়ের দিকে। লিওস্ট্রম তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য ধস্তাধস্তি করতেই হাতের বাঁধন যেন আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল। লিওস্ট্রমের চেহারা ক্রমে লাল হয়ে যাচ্ছে। রক্ত উঠে আসছে মাথায়। রক্ত, রক্ত! এটাই তো চাই।

হোন্ডারসন মুখ হাঁ করল। দাঁতে বাতাসের স্পর্শ অনুভব করল। মাংসল ঘাড়ের ওপর আরো ঝুঁকে পড়ল সে। তারপর...

'থামো! অনেক হয়েছে!'

বরফের মতো শীতল কণ্ঠস্বরটা শিলার। তার হাতে ওর আঙ্গুলের ছোঁয়ায় চমকে উঠল হোন্ডারসন। চোখ তুলে তাকাল। লিওস্ট্রমকে ছেড়ে দিলো। মুখ হাঁ করে থেকে ঢলে পড়ল লিওস্ট্রম।

অতিথিরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখ বিস্ময়ে ইংরেজি 'ও'-এর মতো হয়ে গেছে।

শিলা ফিসফিস করে বলল, 'সাবাস! উচিত শিক্ষা দিয়েছে। তবে বেশ ভয় পেয়েছেন ভদ্রলোক।'

নিজেকে গুছিয়ে নিলো হোন্ডারসন। তারপর হেসে ঘুরে তাকাল।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ!' হোন্ডারসন বলল। 'আমাদের হোস্ট আমার সম্পর্কে যেসব বলেছেন তার সবই সত্য। সেটা প্রমাণের এই সামান্য নিদর্শন আপনাদের সামনে রাখলাম। আমি সত্যি ভ্যাম্পায়ার। আমি যেহেতু আপনাদের সাবধান করে দিয়েছি, সেহেতু আমার বিশ্বাস আপনাদের এখন আর ভয় নেই। আপনাদের মাঝে কোনো ডাক্তার থাকলে আমি তার জন্য রক্ত দানের ব্যবস্থা করতে পারি।'

ইংরেজি 'ও' আকৃতি মুখগুলো স্বাভাবিক হয়ে এলো। সমস্বরে হেসে উঠল সবাই। হোন্ডারসন পরিস্থিতিটা ভালোই সামাল দিতে পেরেছে। তবে মার্কাস লিওস্ট্রমের চেহারায় আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট।

পরিবেশ আবার হাল্কা হয়ে এলো। ইতোমধ্যে জনৈক অতিথি নিচে গিয়ে বেশ কয়েকটি খবরের কাগজ নিয়ে এলো। কাগজগুলোর পোশাক পরে সে অতিথিদের মাঝে কাগজ বিক্রি করতে লাগল।

'টেলিগ্রাম! টেলিগ্রাম! পড় ন! হ্যালোইন দিবসে আতঙ্ক! টেলিগ্রাম।'

অতিথিরা হাসিমুখে কাগজ কিনতে লাগল। শিলার দিকে একজন মহিলা এগিয়ে গেল। আচ্ছন্নের মতো হোন্ডারসন তার চলে যাওয়া দেখল।

'পরে আবার দেখা হবে।' শিলা ডেকে বলল। ওর চাহনি হোন্ডারসনের শিরায় আগুন ধরিয়ে দিলো। কিন্তু সে এখনো ভুলতে পারছে না লিওস্ট্রমকে জাপটে ধরার মুহূর্তের অনুভূতির কথা। কেন ভুলতে পারছে না?

কাগজওয়ালার কাছ থেকে সে একটা কাগজ কিনল। 'হ্যালোইন দিবসে আতঙ্ক'– চেঁচিয়ে বলছিল লোকটা।

BanglaBook.org

ঝাপসা দৃষ্টিতে কাগজে চোখ বুলাল।

হঠাৎই সে চমকে উঠল শিরোনাম দেখে। তীব্র আশংকা নিয়ে খবরটায় চোখ বুলাল।

'পোশাকের দোকানে আগুন... রাত আটটার কিছু পরে দমকল বাহিনীর লোকরা খবর পেয়ে ছুটে যায়... নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল আগুন... ধ্বংস হয়ে যায়... ক্ষতির পরিমাণ... দোকানের মালিকের নাম জানা যায়নি... কঙ্কাল পাওয়া গেছে...।'

'না!' রুদ্ধশ্বাসে বলল হোল্ডারসন।

খবরের একটা জায়গা বারবার পড়তে লাগল সে। দোকানের পাতাল ঘরে মাটি ভর্তি একটা বাক্স পাওয়া যায়। একটা টিন। দুটো খালি কফিনও ছিল। একটা আলখাল্লায় কঙ্কালটা জড়ানো ছিল। আগুনে ওটার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি...।

ওই কলামের নিচেই ছাপা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের মন্তব্য। দোকানটিকে আশপাশের লোকজন ভয় পেত। হাঙ্গেরির এক লোক ভ্যাম্পায়ারের কথাও বলেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব লোক নাকি আসত দোকানে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে অশুভ চক্রের সভা বসত ওখানে। প্রেম উদ্দীপক পানীয় বিক্রি করা হতো দোকানে। ওইসব জিনিস সম্পর্কে সবার মনেই আতঙ্ক ছিল।

'এই নিন... আপনার আসল আলখাল্লা।'

আমার চেয়ে এটা আপনার বেশি কাজে আসবে।'

রহস্যময় অলৌকিক ছদ্মবেশ... ভ্যাম্পায়ার... আলখাল্লা...। হোল্ডারসনের মাথার ভেতরে এইসব কথাগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে। ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে। দেয়াল আয়নার দিকে চুটে গেল।

এক মুহূর্ত তাকালো মাত্র। তারপরই সে চোখের সামনে হাত তুলে দৃষ্টি আড়াল করল। আয়নায় কোনো ছায়া পড়েনি। প্রতিবিম্ব সম্পূর্ণ অদৃশ্য। আয়নায় ভ্যাম্পায়ারের ছায়া পড়ে না।

তাকে অদ্ভুত দেখবে, আশ্চর্য হবার কিছুই নেই এতে। ফর্সা মাংসল ঘাড় দেখলে তাকে আকর্ষণ করবে তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সে মনে-প্রাণে লিওস্ট্রমকে চেয়েছিল ও! খোদা!

এসবের জন্য কালো আলখাল্লাই দায়ী। আলখাল্লায় মাটির দাগ— কবরের মাটি। ঠাণ্ডা আলখাল্লা পরার পর থেকে তার শরীরে সত্যিকার ভ্যাম্পায়ারের অনুভূতি জেগে উঠেছে। অভিশপ্ত আলখাল্লা। কোনো অমর শরীর এই আলখাল্লা জড়ানো অবস্থায় শুয়ে ছিল। একটা হাতায় মরচে ধরার দাগ রয়েছে। নিশ্চয়ই রক্তের দাগ।

রক্ত! রক্ত! রক্ত! রক্ত দেখলে তার খুব ভালো লাগে। রক্তের উষ্ণতা, লাল জীবন। নাহ এ পাগলামি ছাড়া কিছু না। হোল্ডারসন মাতাল হয়ে গেছে।

'আ! আমার ফ্যাকাসে বন্ধু– ভ্যাম্পায়ার।'

BanglaBook.org

শিলা ফিরে এসেছে আবার। কিন্তু আতঙ্কে হোভারসনের হৃৎপিণ্ড দ্রিম দ্রিম বাজতে থাকে। ওর চকচকে চোখ এবং রক্তির উষ্ণ ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে হোভারসন শরীরে উত্তাপের এক উদ্যোম তরঙ্গ অনুভব করল। কালো আলখাল্লার আড়া থেকে উঁকি দেয়া গলার দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে ভিন্ন ধরনের উষ্ণতা রোধ করতে লাগল। ভালোবাসা, আকাঙ্খা এবং তৃষ্ণা।

হোভারসনের চোখে এসবের ছাপ ও নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। অথচ একটুও বিচলিত হলো না মেয়েটা। বরং ওর দৃষ্টি জ্বলতে লাগল।

শিলাও ওকে ভালোবাসে।

হঠাৎ এক ঝটকায় আলখাল্লার বাঁধন খুলে ফেলল হোভারসন। ঠাণ্ডায় হাত থেকে রেহাই মিলল। স্বাধীন স্বাধীন লাগছে এখন। কোনো কারণে আলখাল্লা খুলতে ইচ্ছা করছিল না কিন্তু খুলতে বাধ্য হলো না। অভিশপ্ত এটা আর একটু দেরি হলেই মেয়েটিকে কাছে টেনে নিতো সে। ঠোঁটে চুমু খেত, এবং...।

শিলা জিজ্ঞেস করল, 'ছদ্মবেশ নেয়ায় তুমি ক্লান্ত?' বলে নিজের আলখাল্লাটা খুলে ফেলল সে। ওর সোনালী চুলের বন্যা এবং নিখুঁত সৌন্দর্য হোভারসনের গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো।

পর মুহূর্তেই তীব্র আবেগে একে অপরকে কাছে টেনে নিলো। নিজের পোশাকসহ শিলার পোশাকটাও হাতে ধরে হোভারসন। ওদের দু'জোড়া ঠোঁটের মিলনের মাঝপথে লিওস্ট্রম এবং একদল অতিথি হৈচৈ করতে করতে ঘরে ঢুকল।

হোভাসনের ওপর চোখ পড়তেই লিওস্ট্রম পিছিয়ে গেল।

'তুমি...।' ফিসফিস করে বলল। 'তুমি...।'

হোভারসন হেসে বলল, 'চলে যাচ্ছি।' মেয়েটার হাত ধরে লিফটের দিকে এগিয়ে গেল সে। আতঙ্কগ্রস্ত লিওস্ট্রমের মুখের ওপর লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ওপরে উঠতে শুরু করল লিফট। এবার ওদের দু'জোড়া ঠোঁটের মিলন হলো। হোভারসনের বুকের কাছে আরও সরে এসে শিলা বলল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'ছাদের বাগানে।' অস্ফুট স্বরে বলল হোভারসন।

ছাদে কেউ ছিল না। আজ যে হ্যালোইনের রাত সেটা আবার মনে পড়ল হোভারসনের।

নীল আকাশে কে যেন কালো রঙ লেপে দিয়েছে। সেই কালো আকাশে কমলা রঙের চাঁদ উঠেছে, ধূসর রঙের বিশাল আকারের মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। শীত করছে ওদের।

'আমার পোশাকটা দাও', শিলা ফিসফিস করে বলল। রোবটের মতো হোভারসন পোশাকটা এগিয়ে দিলো। মেয়েটার শরীর ঢেকে গেল কালো কাপড়ে। মেয়েটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল হোভারসনের দিকে তাকাতেই। কাছে টেনে নিলো সে তাকে। 'কাঁপতে কাঁপতে চুমু খেল।

BanglaBook.org

'তোমার শরীর একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা।' মেয়েটা বলল। 'পোশাকটা পরে নাও।'

হোন্ডারসন ভেবে দেখল ঠিকই বলেছে ও। ওর গলার দিকে তাকিয়েই আলখাল্লাটি পরা উচিত। আবার ওর গলাতেই চুমু খাবে ও। ভালোবাসার আবেগে নিজের গলা এগিয়ে দেবে মেয়েটা। তৃষ্ণা মেটাবে ওর।

'কাপড় পরে নাও।' মেয়েটা ফিসফিস করে বলল আবার। ওর দৃষ্টিতে অধৈর্য, হোন্ডারসনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীব্র তৃষ্ণায় জ্বলছে। কেঁপে উঠল হোন্ডারসন।

অন্ধকারে আলখাল্লা পরব? এই আলখাল্লা কবরের মৃত্যুর, ভ্যাম্পায়ারের? অশুভ আলখাল্লা– এটার নিজস্ব শীতল প্রাণ বদলে দিয়েছে তার মন।

'এই যে দেখি।'

মেয়েটির দুই বাহু আলখাল্লা ঠিক করে কাঁধের ওপর বসিয়ে দিচ্ছে। ঘাড়ের কাছে আলখাল্লাটি বাঁধার সময় আঙুল দিয়ে হোন্ডারসনের ঘাড় ছুঁয়ে দিল সে।

হোন্ডারসন অনুভব করল ওর বরফ শীতল শরীর ক্রমে উষ্ণ হয়ে উঠছে। ভয়ঙ্কর উষ্ণ। স্ফীত হয়ে উঠেছে যেন সে, বিকৃত হয়ে উঠেছে চেহারা।

তার সামনে দাঁড়ানো মেয়েটার দৃষ্টিতে আমন্ত্রণের ঝিলিক। সে আমন্ত্রণ তাঁর ঠোঁটের প্রতি, তার দাঁতের প্রতি।

না, এ হতেই পারে না। হোন্ডারসন ওকে ভালোবাসে। এই ভয়ংকর উন্মত্ততাকে পরাজিত করবে একমাত্র ভালোবাসাই। আলখাল্লা পরে এই অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে। মানুষ হিসেবে ওকে বুকে টেনে নিতে হবে, অমানুষ হিসেবে নয়। তার এটা একমাত্র পরীক্ষা।

'একটা কথা তোমাকে না বললেই নয় শিলা।'

ওর চোখে অদ্ভুত নেশা ধরানো দৃষ্টি।

'শিলা আজ রাতের কাগজটা পড়েছো?'

'হ্যাঁ।'

'পোশাকটা আমি ওই দোকান থেকে কিনেছি। তোকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। তুমি তাই সবই দেখেছ, লিওস্ট্রমকে আমি কেমন করে ধরেছিলাম। আমি ওর শেষ দেখতে চেয়েছিলাম। আমার কথা বুঝতে পারছ? আমি... আমি ওকে... কামড়ে দিতে চেয়েছিলাম। পোশাকটা পরে নিজেকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি শিলা।'

'জানি।' চাঁদের আলোয় কিলার দুটো চকচক করছে।

'আমি একটা এর পরীক্ষা দেখতে চাই। এই আলখাল্লা পরেই তোমাকে চুমু খাব। দেখতে চাই আমার ভালোবাসা এই পোশাকের চেয়ে শক্তিমান কিনা। তুমি যদি দুর্বল হয়ে পড়, আমাকে কথা দাও আমার হাত থেকে তুমি ছুটে পালাবে। তবে আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে লড়াই করতে হবে। আমি চাই

BanglaBook.org

তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা খাঁটি এবং শক্তিশালী প্রমাণিত হোক। তোমার কি ভয় করছে!'

'না।' অপলক চোখে হোল্ডারসনের গলার দিকে তাকিয়ে আছে ও। যদিও জানতো হোল্ডারসনের মনে কী রয়েছে।

'আমাকে তুমি পাগল ভাবছ না তো? ওই পোশাকের দোকানে আমি গিয়েছিলাম। দোকানি বেটে বুড়ো মতো এক লোক, দেখলেই ভয় লাগে। ওই বুড়ো আমাকে আলখাল্লাটা দিয়েছে। সে বলেছিল, এটা সত্যিকারের এক ভ্যাম্পায়ারের পোশাক। প্রথমে ভেবেছিলাম লোকটা ঠাট্টা করছে কিন্তু আজ রাতে সত্যি সত্যি আয়নায় আমি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাইনি। লিওস্ট্রমের ঘাড়ে দাঁত বসাতে চেয়েছিলাম। এখন তোমার ঘাড়ে কামড় দিতে চাইছি। কিন্তু আমাকে যাচাই করতেই হবে।'

মেয়েটার মুখভঙ্গি তাকে যেন ঠাট্টা করল। শক্তি সঞ্চয় করল হোল্ডারসন। সামনে ঝুঁকে পড়ল। মুহূর্তের জন্য সর্বনাশা চাঁদের নিচে দাঁড়িয়ে রইল। বিকৃত হয়ে এলো তার মুখ।

এদিকে মেয়েটা তাকে লোভ দেখাতে লাগল।

ওর অদ্ভুত অস্বাভাবিক ঠোঁট চিরে গেল রূপালি কর্কশ হাসিতে। কালো আলখাল্লার আবরণ সরিয়ে দিয়ে ফর্সা দুটো হাত উঠে এলো হোল্ডারসনের গলা জড়িয়ে ধরতে। 'জানি, আমি জানি... আয়নায় তাকিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার আলখাল্লাটা আমারটার মতোই... আমি যেখান থেকে এটা কিনেছি।'

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল হোল্ডারসন। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। শিলার ঠোঁট জোড়া ওর ঠোঁটের পাশ দিয়ে চলে গেল। গলায় অনুভব করল ছোট্ট অথচ ধারালো দাঁতের অদ্ভুত মিষ্টি আমেজ ভরা দংশন। তারপর নিকষ কালো অন্ধকার যেন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল তাকে।

দ্য ক্লোক

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org